নাইমা বি. রবার্ট

ফ্রম মাই সিস্টার্স লিপস্

অনুবাদঃ

নাবিলা আফরোজ জান্নাত

এক বিকেলে, কক্সবাজারে, সমুদ্রপাড়ে, পানিতে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ক'জনকে ভিডিও কল দিয়েছিলাম।

ভিডিও কলে রং তেমন ভালো বোঝা যায় না। অথচ ছবি তুলে দিলে সূর্যাস্ত আরো বেশি সুন্দর দেখা যায়। তার চেয়ে বড় কথা, সূর্যাস্তের হাজার হাজার অপূর্ব ছবি খুঁজলেই পাওয়া যায়।

আমার উদ্দেশ্য সূর্যাস্ত দেখানো নয়, উদ্দেশ্য ছিল নিঃশব্দে জানান দেওয়া,তারা আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ।

বিকেল একটু একটু করে সন্ধ্যা হচ্ছে, রং ছড়িয়ে টুপ করে সূর্য লুকোচ্ছে, পৃথিবীর এক প্রান্তে বিষণ্নতা ছড়ায়, অন্য প্রান্তে সূর্যোদয় হয়।

সে দৃশ্য আমার কাছে ভীষণ সুন্দর এক পরিবর্তন।

আরপৃথিবীর সুন্দরতম পরিবর্তন আমি যাদের মাঝে দেখেছি, দেখতে চাই, দেখব এবং আমৃত্যু দেখতেই থাকব ইনশাআল্লাহ, এ বইটা তাদের জন্য।

ফোনের ঐ প্রান্তের ঐ ক'জনের জন্য।

—**নাবিলা**

“কিছু মানুষের কাছে ইসলাম মানে আত্মঘাতী হামলা, সম্মান রক্ষার্থে নারী হত্যা ও নারীর উপর অত্যাচার। এ ধারণা বদলানোর উপায় কী? নাইমা এর চমৎকার শুরু করেছেন। ফ্রম মাই সিস্টার্স লিপস—মুসলিম নারীদের ব্যাপারে যেসব কুসংস্কার লালন করে পশ্চিমা দুনিয়া, এই বই তার উত্তর দেয়, আর মোড় ঘুরায় পাঠকের ভাবনায়।”—*ডেইলি টেলিগ্রাফ*

“ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত নেওয়া নারীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। গতানুগতিক ভাবনা যে—এ ধর্ম নারীকে দমিয়ে রাখে, আড়াল করে চার দেয়ালের অভ্যন্তরে। কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ চিত্র নয়, একজন ব্রিটিশ নারী নাইমা বি রবার্ট তার নতুন বইয়ে এ আলোচনাই তুলেছেন।”—*ডেইলি মেইল*

“ফ্রম মাই সিস্টার্স লিপসের মূলে আছে আধ্যাত্মিক জাগরণ... রবার্ট দেখিয়েছেন ইসলাম কেমন করে নানান পরিবেশের নারীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, যার ফলাফল আকর্ষণীয়।”—*ইমেইজ*

“এই বইয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামের মূল ব্যাপারগুলো নিয়ে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ আলোচনা... পড়তে পড়তে নিজেকে এর সাথে না জড়িয়ে আপনি পারবেন না। আপনাকে আটকে রাখবেই।”—*এমেল ম্যাগাজিন*

“ফ্রম মাই সিস্টার্স লিপস দেখায় নারীরা কেন ইসলামে আসার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে... একটি চমৎকার ও তথ্যবহুল বই...”— *দ্য প্রোগ্রাম*

সূচি

❀

লেখিকার কথা

এটা একটা ব্যক্তিগত বই। সেজন্যই মুসলিমদের অভিজ্ঞতার একটা ছোট্ট অংশ এখানে উঠে এসেছে। মুসলিম নারী হিসেবে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অকপটে কথা বলেছি, অভিজ্ঞতা জানিয়েছি কারণ আমাদের কাছে আইশা (রা.) এর উদাহরণ আছে যিনি রাসূল (সা.) এর সাথে তাঁর জীবনের খুঁটিনাটিও আমাদের জানিয়েছেন যাতে আমরা তাঁর জীবন থেকে শিখতে পারি। আমাদেরটা থেকেও হয়তো কেউ কেউ শিখবে।

যেহেতু এই বই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখিত, তাই এটি সব মুসলিম নারীর প্রতিনিধিত্ব করে না, আবার নতুন মুসলিম হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতাও সবার সাথে মিলবে না। 'রিভার্ট' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন অর্থে।

যদিও আমি ইসলামের বিভিন্ন ব্যাপার যতটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি, তা-ও অমুসলিমদের জন্য কিছু ব্যাপার বোঝা কঠিন হতে পারে। মুসলিমরা তাদের বিশ্বাস ও জ্ঞানের পটভূমির জন্য এই ব্যাপারগুলো গ্রহণ করে নেয়। অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে একই ব্যাপার আশা করা যায় না।

আমাদের নবি (সা.) এর নামের পর (সা.) এবং সাহাবিদের নামের পর রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা পড়া জরুরি।

ইসলামি পরিভাষা অনুযায়ী, মাথার পর্দার জন্য ব্যবহৃত কাপড়কে আরবিতে খিমার বলা হয়। কিন্তু যেহেতু হিজাব শব্দটা বেশি প্রচলিত, তাই দুটোই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

যে বোনদের কথা লেখা হয়েছে, সবই সত্য, তবে তাদের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে।

শুরুর কথা

মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা, শুধু দুটো চোখ দেখা যাচ্ছে—পশ্চিমের কোনো দেশের রাস্তায় এই বেশে একজন মুসলিম নারী হেঁটে যাবে আর কিছু মানুষের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাবে না—এ অস্বাভাবিক। কখনো আতঙ্ক, কখনো ভয়, কখনো বা ভূত দেখে চমকে উঠার মতো পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক, বিশেষ করে প্রথমবার দেখলে। "বেচারী মেয়েটা, জানেই না যে সে এখন ইংল্যান্ডে আছে, এমন পোশাক পরা যাবে না সে জানে না?", "ওকে দেখে আমার নিজেরই অসুস্থ লাগছে", "বাজি ধরতে পারি ভেতরে ওকে একটা কুকুরের মতো দেখাচ্ছে"- এ ধরণের মন্তব্য।

কোনো সন্দেহ ছাড়াই ধারণা করে নেওয়া হয় তাকে জোর করে স্বামী বা পরিবার এমন পোশাক পরিয়েছে, সে একজন অশিক্ষিত অভিবাসী যে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে বা কোনো ইংরেজিই পারে না, পশ্চিমের স্বাধীনতার স্বাদ সে এখনো পায়নি। সে স্বাধীন হতে চায়।

এ-ই হচ্ছে চেহারাবিহীন, নামবিহীন, কণ্ঠবিহীন নারীর সম্বন্ধে ধারণা।

কেমন হয় যদি তার একটা নাম থাকে, যদি সে আওয়াজ দেয়? যদি সে তোমাকে তার ব্যাপারে বলে, তার পেছনের গল্প, পরিবার, তার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি? এসব শুনে তুমি যদি পর্দার আড়ালের ব্যাপারগুলো দেখতে পারো, যদি বুঝতে পারো কোন কোন দিক দিয়ে তোমরা একই রকম আর কোন কোন দিক দিয়ে আলাদা, তাহলে কেমন হয়?

১৯৭৭ এ আমার মা-বাবা বর্ণবৈষম্যের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লিডসে চলে আসেন। আমার জন্ম সেখানেই। এরপর আমরা যাই ইথিওপিয়ায়, সেখান থেকে জিম্বাবুয়েতে। ওখানে আমার জীবনের পরবর্তী ১২ বছর কাটে, প্রাইমারি ও হাইস্কুল শেষ করি। ওখানে জীবন ছিল গতানুগতিক সাউথ আফ্রিকান টিনএইজারের জীবন। আমি আর আমার দল খেলতাম, ঘুরতাম, পার্টি করতাম, অ্যামেরিকান মিউজিক ভিডিও, ফিল্মের তালে। বয়স সতেরোতে আমি 'ছোট শহর' হারারে ছেড়ে লন্ডনে চলে আসি। নতুন নতুন চিন্তাভাবনা এবং জীবনযাপনের সাথে পরিচিত হই, বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে ভাবি। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতই আমিও Radical এবং Politicized হয়ে উঠি, দিনে দিনে আফ্রোসেন্ট্রিক ব্ল্যাক ন্যাশনালিস্ট হয়ে যেতে থাকি। একবার মিশরে ঘুরতে গিয়ে আমি ইসলামের সাথে প্রথম পরিচিত হই, হিজাবে মুগ্ধ হই। ঐ ভ্রমণ আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। আমি নিজের বিশ্বাস, জীবনযাপন, জীবনের উদ্দেশ্যকে প্রশ্ন করতে শুরু করি। অনেক পথ পেরিয়ে আমি ইসলামে প্রবেশ করি।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমি অনেক চমৎকার মুসলিম নারীর সাথে পরিচিত হই, যারা আমার মতই, ইসলাম গ্রহণ করেছে—সৎ, যত্নবান, দৃঢ়চিত্ত নারীরা। বন্ধুত্বের

সাথে আমি তাদের ব্যক্তিত্বের নানাদিক সম্বন্ধে জানতে পারি। তারা আমাকে বিশ্বাস, ধৈর্য সম্বন্ধে শিখিয়েছে, আর তাদের ব্যাপারে, আমার ব্যাপারেও। কিন্তু একটা লম্বা সময় ধরে অন্যরাই আমাদের সংজ্ঞায়িত করেছে, আমাদের নিজেদের কথা ছিল না।

অনেক দিন ধরে আমি আমার এবং আমার সেই বোনদের অভিজ্ঞতা লিখতে চাচ্ছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, যারা আমাদের জানে এবং যারা আমাদের জানে না, যারা আমাদের জানে না এবং আমাদের ভুল বোঝে—সবার জন্য আমাদের গল্পগুলো বলা গুরুত্বপুর্ণ।

আমি আমার হৃদয়ে, আমার দ্বীনী বোনদের হৃদয়ে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যাতে আপনি জানতে পারেন আমরা আসলে কারা—গতানুগতিক ধারণা, মিডিয়া যা বলে তা না—আমরা কী বলি তা জানুন। আমরা অকপটে আমাদের জীবনের নানানদিক নিয়ে কথা বলেছি, বিশ্বাস করি কোনোরকম পূর্বধারণা ছাড়াই আপনি আমাদের কথা শুনবেন।

আমি এ-ও আশা করি, পড়তে পড়তে ইসলাম নিয়ে আপনার চিন্তাধারা এবং পূর্বধারণাগুলোকে আপনি চ্যালেঞ্জ করবেন। আমি মুসলিম নারীর জীবনে ইসলামি বিশ্বাসের সেই দিকগুলোই আপনাদের দেখাতে চেয়েছি, যেই দিকগুলো আমাদের খুব কাছের মানুষ ছাড়া কেউ জানে না।

এই বই একটা উৎসব, আমাদের নারীত্বের উদযাপন। আমাদের 'সিস্টারহুড' এর উদযাপন। সাহস, উষ্ণতা ও বন্ধুত্বের উৎসব। হাসি, ধৈর্য ও ভালোবাসার উৎসব। এই বই ইসলামের উদযাপন।

-নাইমা বি. রবার্ট
ডিসেম্বর, ২০০৪

❀

অনুবাদকের কথা

মেনে নেওয়ার দুটো ধরণ আছে—মানতে হবে তাই মানছি অথবা, যা মানছি তা-ই সেরা, তাই মানছি। আমরা যারা জন্মগত মুসলিম, তারা ছোট থেকে ইসলামের অনেক বিষয় প্রথম ধরণে মানি। আমাদের বলা হয়, এরকম করতে হবে, এরকম করা নিয়ম। আমরা তাই মানি। বড় হতে হতে তাই অনেক কিছুই ছুটে যায়। অথচ প্রয়োজনটা বড়বেলায়ই বেশি। বড়বেলার জন্যই ছোটবেলায় শেখানো হয়, বলা হয়।

আমি কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে একটা ব্যাপার বেশ লক্ষ্য করেছি, যত সময় যায়, ততই অনেকের আবরণ খসে পড়ে। যে আগে নিকাব পরতো, তার নিকাব খসে পড়ে। যে হিজাব পরতো বা মাথা ঢাকতো, তার মাথার কাপড় খসে পড়ে। যে সাধারণ সালোয়ার-কামিজ পরতো, তার পোশাক আঁটসাট হওয়া শুরু করে। তবে এ চিত্র সবার না, বরং উল্টোটাও হয় অনেক।

গেল পোশাকের কথা।

আমি এমন গল্প জানি যেখানে এই সমাজে যেই মেয়েরা বাইরে চাকরি করতে পারছে না, তারা অনেকেই 'ডিপ্রেসড'। আচ্ছা ধরলাম, কেউ কেউ 'ডিপ্রেসড' না। তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটা মন খারাপের গল্প হয়ে দাঁড়ায়। তারা মেনে নিলেও কখনো কখনো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগে। এই বইয়ে অসাধারণ একটা ব্যাপার আছে। তা হচ্ছে, আমার ঘরের কাজ বাইরের কাজের চেয়ে সেরা। আমার বাইরের অর্জনের চেয়ে ঘরের কাজের যে পুরস্কার, তা বেশি দামী। এইখানে আর নিজেকে ইনফিরিয়র ভাবার কোনো সুযোগ নেই।

কী অদ্ভূত সুন্দর ভাবনা!

পোশাকের ব্যাপারেও, নাইমা রবার্টের লেখা একেবারে ভেতরে গিয়ে প্রশ্ন করবে। আপনাকে ভীষণভাবে স্বাধীন করবে। আপনি যদি মানসিকভাবে স্বাধীন হোন, তাহলে আপনার চেয়ে সুখী কেউ নেই।

আপনি যখন ভীষণ স্বাধীন, তখন আপনার মনে বিদ্রোহ আসতেই পারে, আমি কেন আমার স্বামীর কথা মানব? আমার কাজে তার অনুমতি কেন নিতে হবে?

এই প্রশ্নের জটও তিনি খুলেছেন। বইয়ের পরতে পরতে আপনি তা খুঁজে পাবেন।

তা মেনে নেওয়ার প্রথম ধরণ থেকে আপনাকে দ্বিতীয় ধরণে উন্নীত করবে বলে আমি আশা করি।

এই আশার পেছনে আমার লম্বা সময়ের পরিশ্রম গেছে। প্রায় এক বছর ধরে ৪১৪ এরও বেশি পৃষ্ঠার এই বই অনুবাদ করতে গিয়ে আমি অনেকবার অধৈর্য হয়েছি। ছেড়ে দেই বলে কতবার সরিয়ে রেখেছি। কখনো পরীক্ষার প্রস্তুতি খারাপ হয়েছে। কখনো টাইপ করতে গিয়ে আঙুল ব্যথা হয়ে গেছে, ক্লান্তি চেপে ধরেছে।

তারপর কাউকে বইয়ের সাজেশান বা উপহার দিতে গিয়ে এ ধরনের বই খুঁজে যখন পাইনি, তখন দায়িত্ব ভেবে বইটাকে কাছে টেনেছি।

অনুবাদে ভাষান্তর করার চেয়ে সহজবোধ্য করতেই বেশি চেষ্টা করেছি, তাই কিছু ইংরেজি শব্দ রয়ে গেছে। ভুলত্রুটি খুঁজে পেলে অবশ্যই জানাবেন, শুধরানোর চেষ্টা থাকবে। সে দায় আমার।

বুকমার্ক পাবলিকেশনকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা প্রচ্ছদশিল্পীকে।

বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আপনার অনুভূতি এবং অনুবাদের ব্যাপারে আপনার গাঠনিক সমালোচনা শোনার অপেক্ষায় আছি।

পর্দার আড়ালের আপনি আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবেন, এই বই আপনাকে সাহায্য করবে, আমি সেই স্বপ্ন দেখি। সেই আলোকবর্তিকার দোহাই দিয়ে আমি করুণাময়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

সে সুযোগটা আমি পাবো তো?

-নাবিলা আফরোজ জান্নাত

❀

আমার পথচলা

উত্তর ইংল্যান্ডের লিড্‌সে আমার জন্ম। মা-বাবা সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ি কিনেছিলেন, সরু রাস্তার ধারে ওরকম বেশ কিছু বাড়ি ছিল সেখানে। তিন বছর পর আমার পরিবার ইথিওপিয়া চলে যায়, পরে সেখান থেকে জিম্বাবুয়েতে। আমার বয়স তখন ছয় বছর। ততদিনে আমার একটি ভাই আছে, আর আছে ভীষণ আদরের গোলগাল একটি বোন। হারারের একটি খোলামেলা পাড়ায় আমরা থাকতাম। আমাদের বাড়িটি ছিল খুবই সুন্দর—সামনে সুইমিং পুল, ফুলের বাগান, সবজি ক্ষেত, কলাগাছের সারি। আমার জীবনের প্রথম আঠারোটি বছর কেটেছে জিম্বাবুয়ের আর দশটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মতোই।

হারারের একটি গার্লস স্কুলে যেতাম। সিক্সে উঠার পর থেকে ব্লেজার, ক্যাপ পরে আমি ছিলাম ক্লাসের প্রতিনিধি। আমাদের শেকড় স্কটিশ আর দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু সংস্কৃতি শেখাতে মা-বাবা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন—যাতে আমরা সেগুলোর মূল্য বুঝি। আমরা কখনোই বেসরকারী ইংরেজি স্কুলগুলোয় যেতাম না। জিম্বাবুয়ের ঐতিহ্যবাহী নাচ শিখতাম, মাঝে মাঝে স্কুলে যাওয়ার সময় বর্ণবাদবিরোধী গান গাইতাম। আমরা খুব ছোটবেলা থেকেই এসব বিষয়ে সচেতন ছিলাম, কিন্তু তবুও—বড় হতে হতে সমবয়সীদের মতো চলার আর টেলিভিশনে যা দেখি সেসব অনুকরণের ইচ্ছা মা-বাবার সেসব চেষ্টাকে ছাপিয়ে যেতে শুরু করল।

স্কুলে আমি বেশ মজা করতাম। বছর শেষে পড়াশুনা, ছবি আঁকা, উপস্থিত বক্তৃতা, অভিনয়ে নিয়মিত পুরস্কার পেতাম। খুব চঞ্চল ছিলাম, সাথে আত্মবিশ্বাসীও। প্রাণবন্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতাম, সবসময়ই মাথায় নতুন কিছু না কিছু থাকত, নতুন কিছু করার চেষ্টা করতাম। স্কুলের এই নিষ্পাপ আমি'র বাইরেও আরেকটি আমি ছিল যে কিনা বন্ধুদের সাথে মহানন্দে পার্টি করত। আমরা সবাই এরকম দ্বি-ব্যক্তিত্বের জীবন যাপন করতাম। আমাদের অনেকেই স্কুলে বেশ ভালো ফলাফল করত, সাথে হারারের পার্টিগুলোর পরিচিত মুখ। কোনো সাহিত্যিক বা নারীবাদী আমাদের রোল মডেল ছিল না, অথচ আমরা ঠিকই আবেদনে ভরপুর নারীবাদী পত্রিকা কসমোপলিটনের গ্রাহক ছিলাম। জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধ চিমুরেঙ্গার বীরাঙ্গনাদেরও অনুসরণ করতাম না।

আমাদের আদর্শ ছিল আমেরিকান নায়িকা, গায়িকা, বিনোদন জগতের তারকারা—মেয়েদের দল টিএলসি, সল্ট-এন-পেপা। আর'এন'বি, রাগা মিউজিক, গ্যাংস্টা র‍্যাপ আমাদের চিন্তাচেতনা দখল করে থাকত। দখলও না ঐ অর্থে, টু লাইভ ক্রু, স্নুপ ডগি ডগ বা শ্যাবা র‍্যাংকস যারা শুনেছে, তারাই বলতে পারবে আসলে ব্যাপারটা কী! হারারে'র অধিকাংশ আধুনিক ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-আচরণ সরাসরি পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আমরা ছিলাম আমাদের মতো, কাউকেই পরোয়া করতাম না। আমি প্রায়ই ভেবে অবাক হই যে ওরকম জীবনযাপনের জন্য কতবার কতরকমের বিপদের মুখোমুখি হতে হতেও বেঁচে গিয়েছি! ড্রিংক করে টাল হয়ে থাকতাম, ওভাবেই গাড়ি চালাতাম, অপরিচিতদের গাড়িতে উঠে যেতাম, পকেটে কোনো টাকা না নিয়েই সারারাত বাড়ির বাইরে কাটিয়ে দিতাম। রাত কেটে যেত আমাদের মতোই কিছু বোকা ছেলেপেলের দয়ায়। সাথে ছিল ড্রাগ, যৌনবাহিত রোগ, এইডস, বয়সের আগেই গর্ভবতী হয়ে পড়া, গর্ভপাত, যা-ই বলুন না কেন, এইসবই হতো। অবশ্য আমি অক্ষত থেকে টিনএইজ পার করে দিতে পেরেছিলাম। সাথে ও আর এ লেভেলের ভালো ফলাফলও ছিল। আমার অন্য বন্ধুরা অবশ্য আমার মতো সৌভাগ্যবান ছিল না।

অধিকাংশ জিম্বাবুয়েন পরিবারের মতো আমার পরিবার অতটা ধার্মিক ছিল না। আমার মা ছিলেন একজন অত্যন্ত সুন্দরী জুলু নারী। তিনি বড় হয়েছেন খ্রিস্টান হয়েই। জোহানেসবার্গে একটা জমজমাট জীবন ছিল তার। পেশায় ছিলেন নার্স, সেইসাথে প্রায়ই জিততেন সুন্দরী প্রতিযোগিতার মুকুট আর বলরুমে সেরা নাচের খেতাব। ঐতিহ্য আর বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি আমার শ্বেতাঙ্গ সাউথ আফ্রিকান বাবার প্রেমে পড়ে যান। শ্বেতাঙ্গদের আবাসিক স্কুলগুলোয় বিশেষ যত্ন আর সুবিধায় বড় হওয়া আমার বাবা বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নেমে যান তৃণমূল থিয়েটারে কাজ করে। যদি একজন শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানের কথা বলতে বলা হয়, তাহলে সে হলেন আমার বাবা। তিনি ছিলেন কট্টর মার্ক্সবাদী আর অজ্ঞেয়বাদী। সুতরাং আমাদের ছোটবেলা কেটেছে এই বিশ্বাসে যে—বাইবেল একটি রূপকথার গল্পের বই। তবুও আমি অন্যান্য বাচ্চাদের মতো ধর্মীয় শ্লোক আর প্রার্থনাসঙ্গীত গাইতাম—আমার কাছে এগুলোর কোনো মূল্য না থাকলেও।

হাইস্কুলের শেষবর্ষে আমি লন্ডনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। জিম্বাবুয়ে থেকে বের হওয়ার জন্য আমি উন্মুখ ছিলাম। হারারের শহুরে জীবনটাই সব আর সেখানকার নাইটক্লাবগুলোই দুনিয়ার আধুনিকতম শুদ্ধ জায়গা—এই ধারণার বৃত্তে আমি নিজেকে আটকে ফেলতে চাইনি। আমি আবেদন করলাম আর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজে সুযোগও পেয়ে গেলাম। আমার তখন শুধু দরকার ছিল ওখানে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করা! আট মাস পর্যটনশিল্পের কিছু কাজ করে আর স্থানীয় নামকরা একটি ব্যান্ডে গান গেয়ে আমি

সেটা করেও ফেললাম। যা জমিয়েছি তা দিয়ে আমার বিমানের টিকিট আর লন্ডনে প্রথম কয়েক মাসের খরচ হয়ে যাবে। ফ্রেঞ্চ ভাষা, রাজনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা পড়ার জন্য আমি হারারে ছেড়ে উড়াল দিলাম লন্ডনে। সেখানেই আমি প্রথম কিছু কাছের বন্ধু পাই আর তারা সবাই ছিল মেয়ে। তখন থেকে আমি মেয়েদের সাথে বন্ধুত্বের সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পেতে শুরু করি। আমরা একসাথে পড়তাম, কাজ করতাম, খেতাম, পার্টিতে যেতাম। ফ্রানজ ফ্যানন, অ্যালিস ওয়াকার, দেকার্তের ভেতর ডুব দিতাম একসাথে। একসাথে মাথা ঝাঁকাতাম পাফ ড্যাডি, ম্যাক্সওয়েল, এরিকাহ ব্যাডু'র তালে। কালোদের নিয়েও কথা উঠত আমাদের মাঝে, আর এই বিষয়ে কথা উঠলেই আমরা একেকজন আক্রমনাত্মক হয়ে পড়তাম। আর কথা বলতাম বিশ্বের অবস্থা নিয়ে, পরিবার নিয়ে, আমাদের ফেলে আসা অতীত নিয়ে। আমার আশপাশে তখন বেশকিছু কালো, সুন্দরী, আত্মবিশ্বাসী মেয়ে—যারা পড়াশুনা করে, আনন্দ করে। তারা সবার মধ্যে সেরা—অন্তত আমি তা-ই ভাবতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের গ্রীষ্মের বন্ধের একটা সফর আমার জীবন বদলে দিল। আমি মিশরের একটা সঙ্গীত উৎসবে জিম্বাবুয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। সাথে আমার গায়ক বন্ধুদের একজনও ছিল, ও পেশাগতভাবেই গান গাইত, আমবিরা বাজাত। আমবিরা জিম্বাবুয়ের ঐতিহ্যবাহী একটি বাদ্যযন্ত্র। যদিও এসবে আমার কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না, তা-ও আমি গাইতে পারতাম, আফ্রিকান ড্রাম, গোমা বাজাতে পারতাম। আবার জিম্বাবুয়ের ঐতিহ্যবাহী নাচও করতে পারতাম।

মিশরে অনেক গরম, সাথে প্রচুর কোলাহল। ধূলাবালি আর প্রখর রোদে ছোটাছুটি করে সবাই। তবে আর সব পর্যটকদের মতো আমরাও অবশ্যই পিরামিড দেখেছি, জাদুঘর আর মার্কেটও। কিন্তু যেখানেই যাই সেখানেই মাথায় কাপড় দেওয়া, হিজাব পরা মেয়েদের দেখে আমি আতঙ্কিত ছিলাম, হতভম্বও। আমার নারীবাদী সত্তা ফুটতে শুরু করল। একটা মেয়ে নিজেকে এভাবে ঢেকে রাখছে, পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে মনে হলো নারীকে চেপে রাখার, পুরুষতান্ত্রিকতার একটা উদাহরণ। আর সবচেয়ে বেশি করে মনে হলো, এই বেশে ওদের ভয়ানক কুৎসিত লাগছে। আসলে আমরা যখন নতুন কিছু দেখি, তখন আমাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা আর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সেটাকে বিচার করি। অথচ নিজেদের ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে যাদের জীবন, তাদের চোখ দিয়ে ব্যাপারটা দেখার প্রবণতা আমাদের মাঝে দুর্লভ। কিছু কিছু কারণে ঐ সফরের যেসব ব্যাপার আমার কাছে দুর্বোধ্য লাগছিল, আমি সেসব নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করে দিলাম।

এক সন্ধ্যায় আমরা শহরের বাইরের এক গ্রামে অনুষ্ঠান করছিলাম। আমার মনে পড়ে, আমাদের পালার পর এক আয়োজকের স্ত্রীকে দেখি আমি, ঘিয়ে রঙের একটা হিজাব পরে আছে। চেহারার চারপাশে হিজাব, কাঁধ আর বুক ঢাকা। আমি তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে খুবই সুন্দরী। আমার মনে হলো তার চেহারা যেন জ্বলজ্বল করছে

আর হিজাবের কারণে এই সৌন্দর্য যেন আরও বেশি করে ফুটে উঠেছে। আমি এই দৃশ্যে এতটাই আনমনা হয়ে গেলাম যে কথার উত্তর দিতেই ভুলে যাচ্ছিলাম। কিছু কথাবার্তার পর আমি তাকে একটি প্রশ্ন করলাম, কায়রোতে আসার পর থেকে এই প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরঘুর করছিল, "তুমি নিজেকে ঢেকে রাখো কেন? তুমি তো খুব সুন্দরী।" সেদিনের পর থেকে তার উত্তরের পরিচ্ছন্নতা আর দৃঢ়তা এখনো আমাকে স্তম্ভিত করে—

"কারণ আমি চাই আমি যা বলি এবং যা করি, তা দিয়ে মানুষ আমাকে বিচার করুক—আমি দেখতে কেমন, তা দিয়ে নয়।"

আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাকে কেমন দেখায়, এই নিয়ে আমি বেশ সতর্ক থাকতাম। এজন্য না যে, আমি খুব সুন্দর (যদিও আমার বন্ধুবান্ধব আর পরিবারের লোকজন একথা স্বীকার করে), বরং মানুষ আমাকে দেখে কী আচরণ করছে এজন্য। কৈশোরের পুরোটা সময়ই আমি আর আমার বান্ধবীরা ব্যস্ত থাকতাম কীভাবে নিজেদের সৌন্দর্য ব্যবহার করে কাজ হাসিল করা যায়, কীভাবে ছেলেদের বশ করে ফেলা যায়, এই নিয়ে। আমাদের ঐ জগতে সব মেয়েই এই কৌশলগুলো জানে। কোনো চাকরীর সাক্ষাৎকার দিতে গেলে তোমাকে সবার আগে ভাবতে হবে, কোন বেশে তোমাকে সবচেয়ে ভালো দেখায়। আর যদি অপরপক্ষ হয় একজন পুরুষ, তাহলে পায়ের একটু অংশ বের করে রাখো, তার কথায় হেসে ঢলে পড়ো, বাইরে খেতে যাওয়ার ইঙ্গিত দাও, এইসব। প্রায় সব মেয়েই এইসব কৌশল জানতে জানতে বড় হয়, আর সচেতন বা অবচেতনভাবে কৌশলগুলো ব্যবহার করে।

তো মিশরের এক গ্রামীণ সন্ধ্যায় সেই চমৎকার নারী যখন আমাকে বলল যে সে তার বাহ্যিক রূপ দিয়ে না, বরং কথা এবং ভাবনা দিয়ে মূল্যায়িত হতে চায়—আমি নতুন করে ভাবতে বাধ্য হলাম। সে কী বোঝাল আসলে? সমীকরণ থেকে শারীরিক উপস্থিতি বাদ দিয়ে দেওয়া? আমি তার তারিফ না করে পারলাম না। ইসলামের মধ্যে এমন কী আছে যা একজন নারীকে এত শক্তি দেয় যে, ছেলেরা তার দিকে তাকাবে কী না, এই নিয়ে সে আর ভাবেই না? নিজেকে আকর্ষণীয়া দেখানোর কোনো উৎসাহই তার মধ্যে থাকে না? সারা দুনিয়া যখন নিজেকে প্রদর্শন করতে ব্যস্ত, তখন সে এসবের মধ্যেই নেই আর? এই প্রশ্নগুলো আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলল। আমি আমার নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। আমি কীভাবে বড় হতে চেয়েছি, কীভাবে উন্নতি করতে চেয়েছি, কী হয়েছি? আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। শুধুই নিজের ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সামনে এগুনোর সাহস, আত্মবিশ্বাস আর আত্মসম্মানবোধ কি আদৌ আমার আছে?

হ্যাঁ ছিল, সেজন্যই আমি ১৯৯৮ এর গ্রীষ্মে মিশরের সেই ভ্রমণ শেষে ইসলাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলাম, পরিবর্তনের চাকায় গতি আনলাম। এটা ছিল সেই সুন্দরী নারীর আত্মবিশ্বাসী উত্তরের প্রভাব—যা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। হঠাৎ

আমি আমার চারপাশের সবকিছুতে ধর্মকর্ম দেখতে পেলাম—মসজিদে, রাস্তাঘাটে, সবখানে। হঠাৎ করেই ধর্মীয় শব্দগুলো সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করলাম, যেগুলো আরবিতে বলা হয়, বিসমিল্লাহ- আল্লাহর নামে শুরু করছি, আলহামদুলিল্লাহ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, ইনশাআল্লাহ্- যদি আল্লাহ্ চান, মাশাআল্লাহ- আল্লাহ্ যেমনটি চেয়েছেন। আমি অবাক আর কৌতূহলী হয়ে আবিষ্কার করলাম, আমার নিজের মধ্যেও একটি আধ্যাত্মিক সত্তা আছে যার খোঁজ আমি আগে কখনোই পাইনি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মগুলোর একটি সম্পর্কে আমি এত কম জানি, এই বিষয়টিও আমাকে চিন্তিত করে তুলল। আমি শুধু খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধেই জেনেছি। স্কুলের ধর্মীয় সমস্ত পড়াশুনা আমার ভেতরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বাইবেল পড়া বা অন্যান্য ধর্মীয় আচার আমার মস্তিষ্কে খোদাই করা স্মৃতি হয়ে ছিল। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া শিক্ষা, সাথে আফ্রিকায় খ্রিস্টধর্মের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। জিম্বাবুয়ে হলো বর্ণবৈষম্যে ভরা দক্ষিণ আফ্রিকার একটি অঞ্চল, সেই সাথে সমস্যা-জর্জরিত মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা আর নামিবিয়া তো ছিলই। সেই জিম্বাবুয়েতে বেড়ে উঠার সময় নিজেদের ভূমির চুরি হয়ে যাওয়া আড়াল করতে খ্রিস্টধর্মকে একটা ধোঁয়াশা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, এই নিয়ে আমরা বেশ সতর্ক থাকতাম। যদিও এটা অধিকাংশ দক্ষিণ আফ্রিকানের ধর্মবিশ্বাসে কোনো প্রভাব ফেলত না, এমনকি এখনো ফেলে না। তা-ও আমি বিরক্ত ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে কালো আফ্রিকানদের সাথে চলাফেরায় আমার এই বিরক্তি শুধু বৃদ্ধিই পেল। নিজেদের উন্নতির জন্য খ্রিস্টান হয়ে থাকা? কিন্তু ইসলাম? ইসলাম ছিল আমার কাছে সম্পূর্ন নতুন, ইসলামের কোনো ইতিহাসই আমাকে উদ্বিগ্ন করেনি। আমি মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা শুরু করে দিলাম—ওরা কী বিশ্বাস করে? কী করে, কী করে না, এইসব। লন্ডনে ফেরার পথে কুরআন পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। বাইবেলও, আমার মনে হচ্ছিল আমি আরেকবার খ্রিস্টধর্মকে ঘাঁটব।

আমি একটা তীব্র অনুভূতি নিয়ে মিশর ত্যাগ করলাম। ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের এসব বিষয় আমার ভেতরটাকে প্রচন্ডভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি এসবের কোনো ভুল ধরে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারছিলাম না, উল্টো আমার নিজের ধ্যানধারণা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার প্রতিই প্রশ্ন আঙুল তুলছিল। আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে একটি চাকরি নেব, নয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত কাজ করব, টাকা উপার্জন করে জামা কিনব, ঘর সাজাব আর প্রতি বছর গিয়ে জিম্বাবুয়ে ঘুরে আসব? হয়তো ফিরে যাব, স্থানীয় একটা ছেলেকে বিয়ে করব, শহরতলিতে বাগানঘেরা একটি বাড়িতে থাকব, আয়া থাকবে, বাবুর্চি আর মালিও, আমি থাকব সাধারণ জনগণ থেকে অনেক দূরে! ত্রিশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তারপর বাচ্চা নেব, তাদেরকে সবচেয়ে ভালো বিদেশী স্কুলটিতে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব, বছর বছর বিদেশে ঘুরতে নিয়ে যাব। অল্প কথায় বলতে গেলে, আমার আশেপাশে জিম্বাবুয়ের অন্যান্য তরুণ তরুণীরা

যেমন জীবন যাপন করতে চায়, আমিও কি সেভাবেই জীবন কাটাব? কৈশোরে যেমনটা কল্পনা করেছিলাম? যেকোনোভাবেই হোক, মিশরে আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি, এসব আমার ভেতরে কিছু একটা সূচনা করল। জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এইসবের গভীরে যাওয়ার ইচ্ছা। বেঁচে থাকার এইসব কারণের বাইরে অন্যকিছু খুঁজে পাওয়ার তাড়না আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করল। আমি জীবনের মানে সম্পর্কে ভাবতে শুরু করলাম।

লন্ডনে ফিরে যাওয়ার সময় ভাবলাম, "শালীন পোশাক" একবার পরে দেখি তো! তো আমি আমার মাথা ঢেকে নিলাম, গায়ক এরিকা বাডু সে বছর এভাবে মাথা ঢাকত। ঢিলেঢালা পোশাকও পরলাম—টিউনিক টপস আর ঢিলা প্যান্ট—রংটাও চোখে পড়ে না এমন। আমি যদি চাপা প্যান্টও পরতাম, তাহলে এর উপর একটা লম্বা কোট চাপিয়ে নিতাম। "ডিসকো ডিভা" থেকে আমার এই "আফ্রিকান বোন" হওয়ার ব্যাপারটা চাপা রইল না। আমাকে নিয়ে যেসব গুজব ছড়াল তার একটি ছিল যে আমি একট জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়েছি এবং তার শর্তানুযায়ী আমাকে সারাক্ষণ এসব পরে থাকতে হয়। তবে এসব গুজব আমার মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি কারণ আমার ভেতর থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমি সঠিক কাজটাই করছি—অন্য মানুষেরা যত আজব কথাবার্তা বলুক না কেন।

মার্মাদুক পিকথল একজন ইংরেজ লেখক, বিংশ শতব্দীর শুরুর দিকে তিনি মুসলিম হয়েছিলেন। আমি তার করা কুরআনের একটি অনুবাদ কিনে নিয়ে আসলাম। আমার দুর্ভাগ্য, আমি এর বিশালতা অনুভব করতে পারিনি। স্কুলে শেখা ধর্মীয় শিক্ষাগুলো আমার কাছে কখনোই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। আমি বাইবেলের ঐতিহ্য ধারণ করে বড় হইনি, নবিদের কাহিনী আর আগেকার মানুষদের কাহিনীও আমি মেলাতে পারছিলাম না। আর যেহেতু আমি সেই সময়ে আরবি পড়তে পারতাম না, আমাকে এর ইংরেজি অনুবাদই পড়তে হচ্ছিল। যদি আপনি জেনে থাকেন এটা কত দুর্বল একটা বিকল্প! এর উৎস সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত আমাকে কেউ কিছু বলেনি। আমি জানতাম না আমি যা পড়ছি, তা এতদিন পর্যন্ত কীভাবে এখানে এসেছে। এটা কি সত্যিই আসল ওহী নাকি নবি মুহাম্মাদ (সা.) আর তাঁর সঙ্গিরা মিলে লিখেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এটা হয়তো বাইবেলের মতোই—অনেক বছর ধরে অনেক মানুষ লিখেছে। আসলে আমি প্রথমে একটু অভক্তি নিয়েই পড়া শুরু করি। আমার প্রথম কুরআনের কপিটি দাগানো অনেক, প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া, বিস্ময়বোধকও! ঐ সময়ে কিছু ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনি। কুরআন নিয়ে আরো পড়াশুনা করার পর আমি সেগুলো বোঝা শুরু করি।

তবে কুরআনে বর্ণিত আইনকানুনের ব্যাপারগুলো আমি বুঝতে পারছিলাম। প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায়ের নিয়মের পেছনের সৌন্দর্য আর জ্ঞান অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। ব্যাপারটা হলো, দিনের প্রথম কাজটিই হচ্ছে আরাধনা, ফজরের

সালাত, এবং শেষটিও, এশার সালাত। এই দুইয়ের মাঝখানে আরও তিনবার সালাত আদায়ের নিয়ম, দুপুরের খাবারের সময়, জোহরের সালাত, বিকেলবেলায় আসরের সালাত এবং সূর্যাস্তের সময় আকাশ যখন রক্তিম হয়ে যায়, তখন মাগরিবের সালাত। এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বারংবার সৃষ্টিকর্তার কথা মনে করিয়ে দেয়, তাঁর সাথে একজনের সম্পর্ককেও নবজীবন দেয়।

অন্যান্য নিয়মগুলোও আমার কাছে বেশ যৌক্তিক লাগছিল। আগে বন্ধুদের সাথে আমি মাঝে মাঝে মদ্যপান করতাম, কিন্তু অ্যালকোহল ও অন্যান্য মাদকের উপর ইসলামের নিষেধাজ্ঞাটি মেনে নিতে আমার কোনো সমস্যা ছিল না। জিম্বাবুয়ের ছেলেরা বিয়ার খেতে ভালোবাসে, এটা খুব প্রসিদ্ধ একটা ব্যাপার। ওদের মাতলামি, বেতনের টাকা উড়িয়ে দেওয়া, উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম আচরণ আমি আমার শৈশব, কৈশোরে নিজের চোখেই দেখেছি—আফ্রিকান অঞ্চলে মদ্যপানের ধ্বংসাত্মক পরিণতি। পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় যে কোনো একজন, যে এইসব বিয়ারের পঁচা, বোটকা গন্ধ পেয়েছে, এসব জমায়েতের স্পন্দন অনুভব করেছে, মাতাল অবস্থায় করা বমির বিচ্ছিরি স্বাদ পেয়েছে, একজন মাতালের মদের দরকার এবং তা না পাওয়ার ব্যথা জেনেছে অথবা অল্পস্বল্প মাতলামির আনন্দের পরিণাম দেখেছে—সে-ই আসলে অল্প হলেও জানে অ্যালকোহল কীভাবে মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দেয়। যদিও এই চিত্র সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না, কিন্তু এটুকুই মদ ছাড়ার পক্ষে আমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

যাই হোক, আমি কীভাবে শূকরের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলাম, এটা বিস্ময়কর। আমার ফ্ল্যাটের আরেক বাসিন্দা আর আমি মিলে কিছু মাংস কিনে ফ্রিজে রেখেছিলাম। পরদিন যখন ওটা বের করে রান্না করতে গেলাম, দেখি মাংসের পিন্ডটির উপর কিলবিল করছে অনেক শূককীট। জীবন থেকে শূকরের মাংস তাড়িয়ে দিতে আমার আর কিছু লাগেনি। সেদিনের পর থেকে এই শব্দটি শুনলেও যেন আমি অসুস্থ হয়ে যাই।

আমার কাছে মনে হতো, নারী ও পুরুষের শালীনভাবে চলাফেরার এবং একজন আরেকজনকে সম্মান করার যে আদেশ, এটা আসলে সমস্ত যৌন হয়রানি, শিস দেওয়া, আড়চোখে তাকানো ইত্যাদির ইতি টানার জন্যই। পুরুষেরা আমার পোশাক এবং সৌন্দর্য দেখে কী ভাবছে, এই ভাবনারও ইতি টানে এই নিয়ম। এটা আমাকে আমার পোশাকে পরিবর্তন আনার গুরুত্ব বোঝায়। একজন পুরুষের সাথে আমার আচরণও পরিবর্তিত হওয়া দরকার, তাদের সাথে কথা বলার সময় যেন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি। এটা ছিল পৃথিবীটাকে নতুনভাবে দেখার একটা উপায়। এর মানে ছিল আমার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া, আমার সম্পর্কে যতটুকু প্রকাশ করাকে আমি উপযুক্ত বলে মনে করছি, ততটুকুই প্রকাশ করা। এটাকে আমি কী বলব? এটাই তো ক্ষমতায়ন।

ধীরে, কিন্তু আমার জীবনযাত্রায় অবশ্যই পরিবর্তন আসা শুরু করল। তবে, আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না যে ইসলামের এই নিয়মগুলো মেনে লাভবান হওয়ার জন্য আমাকে কি মুসলিম হতে হবে কি না! আমি ভেবেছিলাম কিছু বিষয় পরিবর্তন করব, আর বাকীসব আমার নিজের মতো চালিয়ে যাব। আমি এখনো আমার পরিচিত মুসলিমদের চেয়ে আমার সেইসব শুভাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণাঙ্গ ভাই ও বোনদের প্রতি বেশি কৃতজ্ঞ। আসলেই, আমি ইসলামের দিকে এগিয়ে আসছিলাম ঠিকই—তবুও মুসলিমদের আমার কাছে রহস্যজনক লাগত। আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মেইল এন্ড নামক এলাকায়, হোয়াইট চ্যাপেল আর ব্রিক লেনের অনেক কাছে। ঐ এলাকায় এশিয়ান থাকত, যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম। আমাদের চারপাশে মুসলিম—ঘরে বাইরে, দোকানে, সামনের মসজিদে। গম্ভীর চেহারার লোকদের চোখে পড়ত, অনেকের মুখেই দাড়ি, তারা ক্যাম্পাসের কাছেই একটি ছোট ঘরের দিকে যেত, ওটা ছিল তাদের মসজিদ। আমি পরে জানতে পেরেছি, ঐ মসজিদে মেয়েদের সালাত আদায়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এটা আসলেই দুঃখজনক যে বেশকিছু বড় বড় ঐতিহ্যবাহী মসজিদে মেয়েদের সালাত আদায়ের ব্যবস্থা নেই, অথচ মেয়েরা ঘরে অথবা মসজিদে, দুই জায়গায়ই সালাত আদায় করতে পারে। ওখানকার মুসলিমদের বেশিরভাগই ছিল বাঙালী। মেয়েদেরকেও দেখতাম, কালো আবায়ার নিচ দিয়ে শাড়ি বের হয়ে আছে, ওড়নাটা যেনতেনভাবে মাথা থেকে ঝুলছে, পান খেয়ে ঠোঁট আর দাঁত গাঢ় কমলা রঙে রাঙিয়ে রেখেছে—এ জিনিস চিবুতে তারা পছন্দ করে। অল্পবয়স্ক মেয়েরাও ছিল, উজ্জ্বল চেহারা, ওড়নায় লেইস লাগানো, পাকিস্তানী পোশাক সালোয়ার-কামিজ পরা। আর ছিল তরুণ ছেলেরা, সুঠাম দেহ, চুলে জেল দেওয়া, হাতে আধুনিক মোবাইল ফোন। আমি এদের সবাইকেই দেখতাম, এরা মুসলিম। আমি জানতাম যে তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, প্রতিরাতে যে কুরআন নিয়ে আমি সাধনা করি, ওরাও সেই একই কুরআন পড়ে। এবং তারপরও, তাদের কারো সাথেই আমি হৃদ্যতা অনুভব করতাম না। ওদের চোখে আমি আমাকে দেখতে পেতাম না, তাই দূরেই রাখতাম নিজেকে।

ধর্মের দিকে আমার নিঃসঙ্গ পথচলা শেষ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মেয়ের সাথে পরিচয়ের পর। সে পড়াশুনায় আমার চেয়ে একবছর এগিয়ে—নাম ছিল সান্দ্রা। আমি অনেকদিন ধরেই তাকে আফ্রিকান ক্যারিবিয়ান সোসাইটিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম। ওর সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল হানাহ। হানাহ একজন আরব মুসলিম, ওর বাবা মিশরি আর মা জানজিবারের। আমার মনে পড়ে, আফ্রিকান ক্যারিবিয়ান সোসাইটির বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে সে সবসময়ই সোচ্চার ছিল। এসব থেকে দূরে থাকতে চাই তাই আমি এই দুজনকে তেমন ঘাঁটাইনি আর। কিন্তু একদিন ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সান্দ্রাকে দেখলাম কিছু বন্ধুর সাথে বসে আছে। সান্দ্রা ছাড়া তাদের সবাইকে একরকম দেখাচ্ছিল। সান্দ্রার চেহারার ভাবটা ছিল অন্যরকম,

মাথার হিজাবটাও। ওটা ছিল বাঙালীদের হিজাবের মতো লেইস লাগানো, যদিও সে ওটাকে মাথা থেকে ঝুলতে না দিয়ে ভালোভাবেই পুরো মাথা ঢেকে রেখেছিল। ওকে অন্যরকম লাগছিল। কী করেছে সে? আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। আমার খুব আগ্রহ হলো ওর এই নতুন বেশ সম্পর্কে জানতে, তাই কাছে না গিয়ে পারলাম না। সেদিন তখনই সে আমাকে জানাল যে সে মুসলিমদের বিশ্বাসটাকে নিজস্ব করে নিয়েছে—গত সপ্তাহের ছুটির দিনটায় শাহাদাহ পাঠ করেছে-

আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুলুল্লাহ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের উপযোগী আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

সে তখন একজন মুসলিম। আমি তখন একইসাথে বিস্মিত এবং ঈর্ষান্বিত। তাকে ভীষণ খুশি দেখাচ্ছিল। যেন সে জানে যে সে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহুল কাজ করে ফেলেছে। যেন সে একদম ঠিক কাজটিই করেছে। সে অনেক সাহসী একটা কাজ করে ফেলেছে, যে কাজটি করার জন্য আমি ভয় পাচ্ছি।

"ভালো", আমি কোনোমতে বললাম— "তুমি আমার চেয়ে বেশি সাহসী"। এরপর আমি ইসলাম নিয়ে আমার পড়াশুনা ও অগ্রগতি সম্পর্কে তাকে বললাম। তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কি হোস্টেলে তার রুমে গিয়ে তাকে হিজাব পরা শিখিয়ে দেব কি না। আমি খুশি হয়ে রাজী হলাম। পরেরদিনই গেলাম, মিশর থেকে আনা সোনালী-লাল কারুকাজ করা একটি হিজাব নিয়ে। সাথে আরও দুটি ছিল, হিজাবের জন্য সবচেয়ে উপযোগী কালো রঙের একটি হিজাব আর আরেকটি গাঢ় নীল শিফনের। সে রাতেই, বারবার হিজাব পরা শেখার চেষ্টা করে করে আর ব্যর্থ হতে হতে একটা নতুন বন্ধুত্ব গড়ে উঠা শুরু করল—এমন একটা বন্ধুত্ব যা আমার জীবনকে সারাজীবনের জন্য পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

হঠাৎ করেই আমি ইসলাম নিয়ে কথা বলার, এই ব্যাপারে আমার আগ্রহ নিয়ে কথা বলার, বিশ্বাসের ভেতর বাহির নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করার একজন সঙ্গী পেয়ে গেলাম। আমি খুব উপভোগ করছিলাম ব্যাপারটা। আমার সমস্ত আগ্রহ তখন ইসলামের দিকে, কালোদের ব্যাপারটায় উৎসাহ দিনদিন কমে যাচ্ছিল। আফ্রিকান ক্যারিবিয়ান সোসাইটিতে তখন গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু আমি হতাশ—বছর যায়, বছর আসে, আলোচনার ধরণ পরিবর্তন হয় না আমাদের। আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান পরিচয়ের দ্বন্দ্ব, কালো-সাদাদের সম্পর্কের বিপত্তি নিয়ে বিতর্ক চলে, নারীবিদ্বেষী ও উগ্র গান কবিতা লেখা হয়, পরিবেশ উত্তপ্ত হয়। আমার মন তখন অস্থির—এইসব হালকা-পাতলা অর্থহীন ব্যাপার কি আসলেই এত গুরুত্বপূর্ণ? মানুষ হিসেবে এইসবই কি আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা? ইসলাম নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকা আমার আগ্রহ তখন আমাকে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী উপহার দিয়েছে—চারপাশের পৃথিবী আমি কীভাবে দেখি? মানুষ হয়ে কেন বেঁচে আছি?—

এসব প্রশ্নের উত্তরে। এবং এসব উত্তর এড়িয়ে যাওয়াটা আমার কাছে দিনদিন কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। এই দ্বিধার শেষ হলো একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রেক্ষাগৃহে। জ্যামাইকান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম আমি। বসে আছি, র‍্যাগ মিউজিক বাজছে জোরে, মঞ্চে নাচতে থাকা মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, ওদের শরীর নাচানো, হাঁটু পর্যন্ত বুটজুতা পরা পা দোলানোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার নিজেকে খুব দূরের কেউ মনে হলো, খুব দূরের। মনে হলো, এখানে বসে থাকা আমিটা আসলে আমি নই, আমি আর এখানকার কেউ নই।

আমি উঠে পড়লাম, ক্যাম্পাসের অন্যপাশের প্রেয়ার রুমে চলে গেলাম। আমার আশপাশে আমার মতো কিছু মানুষ দরকার ছিল, কিছু ভালো সঙ্গী দরকার ছিল। খুব গভীরে গিয়ে কিছু অর্থ বের করে আনা দরকার ছিল—দরকার ছিল আত্মার জন্য কিছু খাবার। আমি বুঝতে পারলাম আমি আর আমি নেই, ধীরে ধীরে আমার হৃদয় এগিয়ে যাচ্ছে ইসলামের দিকে।

এসব অনুভূতির পরও আমার ভেতরে বাস্তবতা এসে আঘাত করছিল; আদর্শ, রাজনীতিও। আমি, একজন কালো আফ্রিকান মেয়ে কীভাবে ইসলামের অংশ হবো? আমি নিজেকে তখনো এভাবেই দেখতাম, যদিও আমার বাবা-মা দুজনই কালো ছিলেন না। আমি যতদূর দেখতাম, ইসলাম যেন শুধু আরব এবং এশিয়ানদেরই ধর্ম। আসলে আমি তো মুসলিম বলতে শুধু তাদেরকেই দেখেছি তখন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে কীভাবে নতুন জীবনের সাথে মানিয়ে নেব, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। একটা নতুন বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যা আমাকে আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে পারে—এমন আশঙ্কায় আমার মন ভারাক্রান্ত ছিল।

সান্দ্রা, আমার নতুন বন্ধুটি তখন আমাকে সমর্থন দিয়েছে। আমি যতবারই এসব প্রশ্ন নিয়ে কথা তুলতাম, প্রতিবার ধৈর্য নিয়ে কথা বলেছে আমার সাথে। আমার ধারণা সে দেখতে পাচ্ছিল আমি কোত্থেকে এসেছি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হচ্ছিল কেন আমি এই "আফ্রিকান" পরিচয় নিয়ে এত বেশি ভাবছি! ওর কাছে ব্যাপারটা ছিল সহজ—ইসলাম যদি সত্যি হয়, তাহলে বাকীসব গৌণ। যে পথ তুমি সত্য বলে মানো, এই গৌণ ব্যাপারগুলো কেন সেই পথে চলতে তোমার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

কিন্তু আমার আরও প্রশ্ন ছিল। আমার মনে পড়ে, একদিন আমি কান্না করতে করতে জিজ্ঞেস করছিলাম, "যদি আমার জীবন আমি আল্লাহর জন্য দিয়ে দেই, আর আল্লাহ এমন কিছু করেন যা আমি চাই না, তখন কী হবে?" সবকিছুর পরও আমার কিছু চাওয়া ছিল জীবন নিয়ে। একটা ভালো চাকরি, টাকা, জমকালো একটি বিয়ের অনুষ্ঠান, স্যুটেড-বুটেড কিছু বাচ্চাকাচ্চা। কিন্তু যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিই, এসবই বদলে ফেলতে হবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার পরিকল্পনা, ইচ্ছা সব বিসর্জন দিতে আমি কি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম? না, এই পরিবর্তনের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

আমার অতীত আমাকে দিয়ে ভবিষ্যতের যেই সতর্ক পরিকল্পনা করিয়েছে, তা ছেড়ে দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। অপরিচিত অনিশ্চয়তার ভয়, আত্মসমর্পণের ভয় আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরছিল বারবার।

সেই সময় আমি লন্ডনে একটা জুতার দোকানে অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু করি। সেখানে এক মহিলার সাথে পরিচয় হয়—মনিকা। আরেকজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ পেয়ে আমি খুশিই হলাম। আমি তার সাথে মেশা শুরু করি, সে ছিল খুব বিনয়ী, নিশুক। আমি খুব অবাক হলাম এটা শুনে যে, তার নামের শেষে একটা "এক্স" আছে। কারণ তার গোত্র পরিচয় সে জানে না, আর তাই গোত্রীয় নামের বিকল্প হিসেবে এই এক্স নিজের নামের সাথে যোগ করে রেখেছে। পশ্চিমে প্রায় সব কালো মানুষের, যাদের পুর্বপুরুষেরা ছিল কৃতদাস, তাদের একটি করে ইউরোপিয়ান উপনাম থাকে। এই নাম তাদের মনিবের নামের অংশ। তাদের অধিকাংশই নিজস্ব আফ্রিকান নাম পরিবর্তন করে ফেলেছে, অনেকের হারিয়েই গেছে। আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম, তথাকথিত ন্যাশন অফ ইসলামের অনেক সদস্যই নিজেদের নামের ঐ অংশটুকুর জায়গায় এক্স ব্যবহার করে—যেমনটা করেছিলেন তাদের মুখপাত্র ম্যালকম এক্স। তো মনিকা আমাকে বলল যে সে নিয়মিত ন্যাশন অফ ইসলামের সভায় যায়। আমি তার সাথে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে চাইলাম। মনে হলো আমি সেখানকারই একজন, কালোদের জন্য ইসলাম? তো পরের সভায় এক সন্ধ্যাবেলা আমি মনিকার সাথে সেখানে গেলাম আর সেটাই ছিল বিতর্কিত ন্যাশন অফ ইসলামের সাথে আমার প্রথম যোগাযোগ।

আমরা হলরুমে ঢুকলাম। সেখানকার লম্বা-চওড়া, সুসজ্জিত নিরাপত্তারক্ষীরা আমাদের স্বাগত জানাল। "আসসালামু আলাইকুম, কালো বোনেরা", "আসসালামু আলাইকুম, কালো রাণীরা" —বলতে বলতে সিঁড়ির উপরের দিকটা দেখিয়ে দিল। সেখানে আমাদের দেহতল্লাশী চলল। এরকম ব্যবস্থা ন্যাশন অফ ইসলামের সব সভাতেই থাকে। বুথে বসে থাকা নারীকর্মীটিকে দেখলাম নির্দিষ্ট পোশাক পরা—নেভি ব্লু রঙের জামা, মাথায় টুপি—এটা তার চুল-কান ঢেকে পেছন দিকে পড়ে আছে। অনেকটা নানদের মতো দেখাচ্ছে তাকে। আমাদের দেহতল্লাহী করার সময় তাদের গাম্ভীর্য এবং দক্ষতা দেখে আমি বেশ মুগ্ধ হলাম। কালোদের সংগঠনগুলোয় এমনটা সচরাচর দেখিনি আমি। ভেতরে ঢুকে দেখি মেয়েরা প্রবেশপথের কাছের চেয়ারগুলোয় সারিবদ্ধভাবে বসে আছে, আর ছেলেরা বসেছে অন্যপাশে। মাঝখানে সামান্য ফাঁকা জায়গা। সবাই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে ফ্রুট অফ ইসলাম, ন্যাশন অফ ইসলামের নির্দিষ্ট পোশাক পরিহিত কর্মীরা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি রুমের মাঝখানের দিকে। ১৯৬০ সালে এলিজা মুহাম্মাদের সময়ে যেমন হতো, অনেকটা তেমনভাবে। বাকী সব পুরুষ স্যুট পরা, আর মেয়েদের গায়ে আগের সেই নারীকর্মীটির মতোই পোশাক। দর্শনার্থীরা বসে আছে, অনেকের মাথায়ই কাপড়।

আসসালামু আলাইকুম বলে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু হলো। এরপর কুরআন থেকে প্রথম সূরাটি পড়ল—সূরা ফাতিহা। এরপর হলো ন্যাশন অফ ইসলামের নিজস্ব ভঙ্গিমায় কিছু কথা (এই ভঙ্গিমার জন্য তারা সুপরিচিত), ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলা আর ন্যাশন অফ ইসলামের স্কুলের বাচ্চাদের পরিবেশনা। এই সভার আয়োজন আমাদের সবার মন ছুঁয়ে গেল—বিশেষ করে যারা নিজেদের কালোবর্ণ নিয়ে বেশি সতর্ক। কয়েক সপ্তাহ পর আমি আবার সেখানে গালাম, সাথে আমার ফ্ল্যাটে থাকে যে ইফুয়া, আর সহকর্মী নিশেল। বর্ণবাদ নিয়ে ওদের উপস্থাপনায় নিশেল তেমন মুগ্ধ না হলেও আমার আর ইফুয়ার মুগ্ধতায় ভাটা পড়েনি। তৃতীয়বার যখন আমি আমার এক মুসলিম বন্ধুকে নিয়ে সেখানে গেলাম, তারপর থেকে আমার মনে হতো লাগল ন্যাশন অফ ইসলাম কি আসলেই আমার জন্য ঠিক জায়গা? প্রথমত, তাদের বক্তব্যে ছিল এশিয়ার কালো মানুষদের থেকেই পৃথিবীর সব গোত্রের উৎপত্তি হয়েছে—একথা আমি মেনে নিতে পারিনি। তাছাড়া কালোদের নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠনের কর্মীদের পরনে স্যুট আর বো-টাইয়ের ব্যাপারটাও আমার কাছে হাস্যকর লেগেছিল। আবার তারা আরবি নাম মুহাম্মাদ প্রায়শই ব্যবহার করে আর বলে এ নাকি আফ্রিকান বা ক্যারিবীয় নাম নয়, এশিয়ার নাম। অথচ এটি একটি আরবি নাম। বাড়ি ফেরার পথে আমার সেই মুসলিম বন্ধুটি বলল—“তুমি জানো, আসলে এটা সত্যিকারের ইসলাম না।” আমি যদিও তখন খুব কম জানতাম, তা-ও জানতাম যে সে আসলে ঠিকই বলেছে। ন্যাশন অফ ইসলামের মতবাদের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় সত্যিকারের ইসলাম কতটা উদার, কতটা আন্তরিক, ভারসাম্যপূর্ণ। কালো মানুষ আর সাদা শয়তানের মধ্যকার সম্পর্কে না ভেবে, কালোদের ক্ষমতায়ন বা কালো সমাজের সামাজিক সমস্যা নিয়ে না মেতে—সত্যিকারের ইসলাম সমস্ত মানুষ আর তাদের স্রষ্টার সম্পর্কোন্নয়নে জোর দেয়—বিশ্বাসে, আচরণে, প্রার্থনায়। জীবনের এই দুটো দিক সম্পূর্ণ ভিন্নরকম লাগল। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি তখনো।

আমি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া কোনো একদিকে এগোচ্ছি—এই চিন্তা মাথা থেকে যাচ্ছিল না। পৃথিবী নিয়ে আমার ভাবনার সাথে যায়, ইসলামের শুধু এমন দিকগুলো নিয়ে থাকতে পারছিলাম না। আবার এ-ও জানতাম আমি আমার পুরনো জীবনে ফিরে যেতে পারব না। একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, এমন সময় চলে এলো। সান্দ্রা ততদিনে আমার বেশ ভালো বন্ধু। সে বলল যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, নয়তো অমুসলিম, অবিশ্বাসী হয়ে মরে যাবার ঝুঁকি থেকেই যায়। আমি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলাম। ততদিনে ক্রিসমাসের ছুটি শুরু হয়ে গেছে, আমি আমার বকেয়া বেতনও পেয়ে গেছি। আমি কী করব? পরিবারের সাথে ক্রিসমাস পালন করতে যাব? নাকি এমন কোথাও যাব যেখানে গিয়ে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারব বাকীটা জীবন আমি কীভাবে কাটাতে চাই? আমি পরের কাজটাই করলাম। মুসলিম আফ্রিকার গিনিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কামার লায়ের ‘লা এনফ্যান্ট নয়ের’

বইটায় পড়া গিনির বর্ণনা, জীবন, প্রকৃতি আমার মাথায় গেঁথে ছিল। গিনিকে বেছে নেওয়ার আরেকটি কারণ ছিল, আমি জানতাম এখানে একটি বেশ বড় মুসলিম সম্প্রদায় আছে। মিশরে যাওয়ার পথে গিনির পোস্টাল সার্ভিসের পরিচালক ও তার সাথের কিছু মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাদের বিশ্বাসের ভিত আর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। ওখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে আমি তার সাথে যোগাযোগ করি।

আমার বন্ধুরা এই সিদ্ধান্ত শুনে খুব আতঙ্কিত হয়ে যায় আমাকে নিয়ে। এই পুরো ব্যাপারটাই তাদের কাছে পাগলামি মনে হয়। যার কাছে যাচ্ছি, তাকে ঠিকমতো চিনি না, সেই দেশে আগে কখনো যাইওনি। তার উপর একা একা যাচ্ছি, সাথে কেউই নেই। ওদের আপত্তির জায়গাগুলো এতই শক্তিশালী ছিল যে আমি যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় বাদই দিয়ে ফেলছিলাম। হঠাৎ কিছু ব্যাপার ঘটে যে জন্য আমার মনে হয় এই যাওয়াটা আমার ভাগ্যে লেখা আছে। প্রথম ব্যাপারটা ছিল, আমার কাজ করার দোকানটিতে নাইজেরিয়ার কিছু মুসলিম নারীর সাথে আমার দেখা হয়। তাদের পোশাক দেখেই আমি বুঝে ফেলি যে তারা নাইজেরিয়ার। টাই-ডাই করা বৌবৌ পরনে, কাফতানের মতো দেখতে, বেশ বড়। কিন্তু মাথায় ওদের সবসময়ের প্যাঁচানো কাপড় ছিল না, বরং আমার এলাকার এশিয়ান মেয়েগুলোর মাথার হিজাবটাই ছিল। আমার কৌতূহল জাগে। সেই সময় আমি সালাম দেওয়ার অভ্যাস করছিলাম। নিজে থেকে গিয়েই বলি—আসসালামু আলাইকুম— আপনাদের উপর শান্তি নেমে আসুক। তারা সবাই সুন্দর করে হেসে সালামের উত্তর দেয়—ওয়া আলাইকুমুস সালাম—তোমার উপরও নেমে আসুক। আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করি তারা কোথা থেকে এসেছেন, কী করছেন। সবচাইতে মিশুকমতো নারীটি জানাল যে তারা লাগোসের, লন্ডনে এসেছেন বেড়াতে। তারপর জানলাম তিনি একটি ট্রাভেল অ্যাজেন্সির মালিক, তার আদিবাড়ি নাইজেরিয়ায়। কথায় কথায় বেরিয়ে এলো তার একজন সহকর্মী আছেন, যিনি কোনাক্রিতে একটি ট্রাভেল অ্যাজেন্সি চালান। কোনাক্রি গিনির রাজধানী! আমি যখন তাকে বললাম যে আমি গিনিতে যেতে চাচ্ছি কিন্তু সেখানে আর কাউকে চিনি না, তিনি জোর করে তার কার্ড আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, গিনিতে গিয়েই যেন কোনাক্রির সেই সহকর্মী নারীটির সাথে যোগাযোগ করি। আমার মন ভরে গেল আনন্দে, এটা কি একটা ইঙ্গিত ছিল যে শেষপর্যন্ত গিনিতে আমার যাওয়া হচ্ছেই?

এরপর টিউবে করে বাড়িফেরার সময় আরেকজন মহিলার সাথে দেখা হলো। আমার কেন যেন মনে হলো আমি যা খুঁজছি, তা তার কাছে আছে। আমি বাধ্য হই তার সাথে কথা বলতে।

নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি একজন মুসলিম?"

—জি।

জানতে পারলাম তিনি সিয়েরা লিওনের। অথচ আমি ভাবছিলাম তার বাবা গিনির। ব্যাপারটা খেলার মতো ছিল, যেন আমার মাথায় ঘুরছে কিছু উত্তর, যেগুলোকে সঠিক বলে মনে হচ্ছিল। খুবই বোকা বোকা একটা ব্যাপার মনে হলেও ঠিক তখনই, সেখানেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম—আমি গিনিতে যাচ্ছি। আমার মনে পড়ে এক বন্ধুকে বলেছিলাম—'আমি যাচ্ছি এবং সেখানে যদি আমি মারাও যাই, আমি জানি সেটা শুধুই আল্লাহর ইচ্ছায়।'

সারামাসের খরচ সংগ্রহ করতে কিছুদিন অতিরিক্ত কাজ করা লাগল। আমি টিকেট কিনে ব্যাগ গুছিয়ে ফেললাম। আমার ভাই ও বোন তখন লন্ডনে ট্রানজিটে ছিল, ওদের বিদায় জানিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। প্রথমে প্যারিসে, সেখান থেকে সেনেগালের ডাকারে, তারপর কোনাক্রিতে। পুরোটা সময় অপরিচিত অনুভূতি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন ভাসছি, তাকদিরের তরঙ্গে ভাসছি, স্রোতে সাঁতার কাটছি, তীর থেকে দূরে, বহুদূরে। কিন্তু আমি ছিলাম শান্ত, ভয়হীন। অথচ সম্ভাব্য সব বিপদ সম্পর্কেই আমি জানতাম। পোস্টাল সার্ভিসের লোকটা মিথ্যে বলতে পারে, তার কোনো স্ত্রী-সন্তান না-ও থাকতে পারে, সুবিধা হাসিল করতে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার একটা নাটকও হতে পারে ব্যাপারটা। কিন্তু এসব চিন্তা আমার মেনে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারছিল না। আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না। প্যারিসের ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে ছিলাম, জানতাম আমি মুসলিম হতে চাই, আমার আশপাশের সেই মানুষগুলোর মতো হতে চাই—যারা নিজেদের নিয়ে ভীষণরকম আত্মবিশ্বাসী—ইসলামের উপর নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে নির্ভীক। ঐ সময়ে আমার কাছে একটি পত্রিকা ছিল, তাঁর উদ্ধৃতাংশ

> *"সেনেগালের মুসলিমদের দেখে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি, আমার চেনা মানুষগুলোর মতো দেখতে একদম!। আনন্দে আমার বুক ভরে যায়, চোখে পানি চলে আসে—আলহামদুলিল্লাহ! তারা কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে, এটা কি আরবি ভাষা? সবার হাতে রূপার আংটি, একজন বৃদ্ধের পায়ে অ্যাডিডাসের জুতো। বাদামী বৌবৌ আর মেলানো মাথার রুমালে তাকে মানিয়েছে বেশ!"*

আমার দেখা ইংল্যান্ডের মুসলিমদের চেয়ে ভিন্ন এই বেশে আমি পুরোপুরি গলে যাই। তখনো আমার ভেতরে কালো জাতীয়তাবাদ গেঁথে আছে, এই মুসলিমদের আমার নিজের মানুষ মনে হয়, আমার আফ্রিকার কালো মানুষ। তারা নিজেদের আফ্রিকান পরিচয়ে গর্বিত—সৌন্দর্যে, আচরণে, পোশাকে, সব মিলিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এরকম দেখা যায় না। ব্রিটিশ উপনিবেশনের ফলাফল সেখানে এতটাই প্রখর যে মানুষজন ব্রিটিশদের মতো হওয়াটাকেই সম্মান ও গৌরবের ব্যাপার মনে করে। এই পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিমদের সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম।

ডাকারে বেশ লম্বা সময় পার করার পর উড়াল দিলাম কোনাক্রিতে। পোস্ট অফিসের পরিচালকের বাড়িতে তার স্ত্রী ছিলেন, মাদাম; আর ছোটো দুটো বাচ্চা ছেলে। বেশ নিরাপদ লাগল আমার। তখন থেকে শুরু হলো কখনো ভুলতে না পারা সেই চার

সপ্তাহ। ঐ সময়ে কোনাক্রিতে খুব গরম, আমি হিজাব পরছি, সাথে কাফতান। এসব পরে ঢিলা আর আরামদায়ক লাগল, তবুও খুব সুন্দর লাগছিল। আমার শরীরের গঠন বোঝা যাচ্ছিল না, নিজের কাছেই ভালো লাগছিল। আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, স্বাচ্ছন্দ্যে ওখানকার মানুষজনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ আমাকে আলাদা করে লক্ষ্য করছে না। সাথে করে কিছু ওয়েস্টার্ন জামাকাপড় নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলো পরতে বারবার খুব ইচ্ছে করছিল। যদিও সবার এমন মনে হয় না। ঐ বাড়ির মহিলাটি নিজেও ইসলামিক রীতিতে পোশাক পরতেন না। বরং তিনি ও তার সাথের কিছু মহিলা প্রায়ই আমাকে বলতেন ওসব বুড়ো মানুষের কাফতান ছেড়ে জিন্স পরতে। প্রতিবারই এমন প্রস্তাবে আমি হতভম্ব হয়ে যেতাম এবং মানা করে দিতাম। প্রথমত, আমি ফেলে আসা জিন্সের জীবনে ফিরে যেতে চাইনি। দ্বিতীয়ত, গিনির বাজার থেকে জিন্স কিনে পরার জন্য আমি সেখানে যাইনি। যত যা-ই হোক, নিজের কিছুটা সম্মান তো রাখতেই হয়। কাফতান পরে নিজেকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারটা আমার মাথায় আরো শক্ত হয়ে গেঁথে বসল একটা ঘটনার পর। এটি ঘটেছিল গিনির তখনকার সবচেয়ে ধনী লোকদের একজনকে ঘিরে। যেদিন আমি নিজের মুসলিম হবার ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছিলাম, সেদিনের পর থেকে সবার মাথায় যেন একটা ব্যাপারই ঘুরে—আমি কাকে বিয়ে করব? এখন, সত্যি বলতে গেলে বিয়ে আমার মাথায়ই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করে এই চিন্তাটা আমাকে গ্রাস করে ফেলল, সবসময় মাথায় ঘুরত। সবারই কোনো না কোনো ভাই, চাচা, চাচাতো-মামাতো-খালাতো-ফুপাতো ভাই ছিল, যে স্বামী হিসেবে খুব ভালো হবে—আমার মাথা খারাপ করে ফেলল তারা! আমার গৃহকর্তার পরিবারও এমন একজনকে আনল যে খুব বড়লোক এবং বয়সেও আমার প্রায় দ্বিগুণ। তারা সেই লোককে বাড়িতে এসে আমার সাথে গল্প করতে উৎসাহিত করত। এক সন্ধ্যায় সে তার ফুটবল টীম দেখতে যেতে আমাদের দাওয়াত দেয়, টীমটা তখন ছিল একটি পাঁচ তারকা হোটেলে। সেখানে যাওয়ার সময় মাদাম দেখল যে আমি কাফতান পরেই যাচ্ছি। তখন সে আজব একটি দৃষ্টি দিয়ে আমাকে জোর করে অন্যকিছু পরতে, যাতে আমাকে আরো কমবয়সী, আধুনিক লাগে, যেগুলো আয়তনে ছোট। বোকার মতো আমি তার কথা শুনে ফেললাম। এরপর আমি আমার জীবনের সবচেয়ে অস্বস্তিকর সন্ধ্যাটা কাটালাম। ছেলেরা ফুটবল নিয়ে কথা বলছিল, আমি উপেক্ষিত থাকলাম। আমি ছিলাম দর্শনীয় বস্তুর মতো এবং অবশ্যই কথা বলার মতো কেউ না। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই আজব লাগে যে নারীরা নিজেদের এ অবস্থান মেনে নেবে, সেটাই তারা আশা করে। তারা একজন ছেলের সামনে থাকবে নিজেদের সৌন্দর্য দেখিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে ভুলবার জন্য, কিন্তু কোনো কথা বলা বা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করার জন্য না। ছেলেদের ক্ষেত্রেও একই বিরক্তি আমার—নিজের পাশের সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে বন্ধুদের খোঁচা, ঈর্ষা, লোভ যেন তারা উপভোগ করে। মনে হয় যেন এই মেয়েটির কারণেই তার অস্তিত্ব, সুন্দরী মেয়েটি যেন তাঁর রুচির পরিচায়ক, নিজেকে মনে হয় ওদের তখন মর্দ মর্দ

লাগে। আমি এসবে অস্বস্তিবোধ করতাম, যদিও বড় হয়েছি এসব দেখেই, আকর্ষণীয় নারীরা ছেলেদের এসবের জন্য অপেক্ষা করছে। কোনাক্রির সেই উষ্ণ সন্ধ্যায় আমি খুব অপমানিতবোধ করছিলাম, ক্ষিপ্ত হচ্ছিলাম, কেন আমি হার মানলাম, কেন আমি আমার বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকতে পারলাম না? সেই জলসা থেকে সরে এলাম, হোটেলের বাগানের দিকে, শেষপ্রান্তে, ঢেউ এসে পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে সেখানে, আর একটা নোনা ঘ্রাণ। তা-ও, আমার মাথায় কাপড়টা তো আছে! ব্যাপারটা অদ্ভুত যে এটা আমার জীবনের অংশ হয়ে উঠছিল তখন, যদিও সত্যিকারের ইসলামি হিজাবের কিছুই সেটি ছিল না। যতক্ষণ ওটা আমার মাথায় থাকত, মনে হতো আমি আমার বিশ্বাসে ঠিকঠাক আছি। জানতাম, যদি আমি এই হিজাব হারিয়ে ফেলি, তাহলে শুধু মাথার আবরণই হারাব না, নতুন পরিচয়ের জন্য যে যুদ্ধ আমি করছি—সেখানেও আমি হেরে যাব। সেই সন্ধ্যায় আমি আর কখনো হার না মানার সিদ্ধান্ত নিলাম। ছেলেদের পুতুল হয়ে থাকার দিন শেষ হলো সেদিনই।

আমার এই পরিবর্তনের কথা খুব দ্রুত ছড়িয়ে গেল। পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে আমি 'আলহাজ্জা' নাম পেয়ে গেলাম, এর মানে মক্কা থেকে হজ্ব করে আসা ব্যক্তি। এই নামের কারণ আছে। মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই মধ্যবয়স পর্যন্ত অনৈসলামিক জীবনযাপন করে, তারপর হজ্ব করতে যায়। যেহেতু হজ্বের পুরস্কার হচ্ছে সমস্ত পাপ মুছে যাওয়া, অনেকেই মক্কা থেকে ফিরে আসে পরিশুদ্ধ মন নিয়ে, ইসলামিক জীবনযাপন শুরু করার উদ্দেশ্যে, যৌবনের আনন্দ তো করা হয়েছেই, সেই দিন শেষ। যেহেতু আমি ছোট ছোট জামাকাপড় পরা, মাথার চুল দেখানো, বয়ফ্রেন্ড ছেড়ে দিয়েছি, সেহেতু এই নাম পেয়ে গেলাম।

গিনিতে আমি আরেকবার ইবাদাতের একটা পরিবেশ দেখতে পেলাম। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আযান, শুক্রবার মসজিদে জুম'আর সালাত। প্রতিদিন পাঁচবার আমি ওযু করতাম, বড় একটা হিজাব পরতাম—যাতে মাথা, কাঁধ ও বুক ঢেকে থাকে। সালাতের মাদুর বিছিয়ে কিবলার দিকে ফিরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতাম। এসব আমার দিনযাপনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমার খুব ভালো লাগত যে নবি মুহাম্মাদ (সা.) আর তাঁর অনুসারীরাও এই কাজ করতেন, সমস্ত মুসলিমই করে। এরপর দেখা গেল আমি পুরো উম্মাহকে নিয়ে ভাবছি, এতবড় মুসলিমগোষ্ঠীর অংশ হতে পেরে আমার খুব গর্ব হতো।

প্রতি শুক্রবার আমার গৃহকর্ত্রীর মা, হাজ্জার সাথে আমি মসজিদে যেতাম। হাজ্জা একজন দুর্দান্ত মহিলা, বেশ রসিক, সাথে প্রখর ব্যক্তিত্ব তার। আমরা নিজেদের মাথার উপরে বড় কাপড় জড়িয়ে নিতাম, যেটা ঘাড় ও কাঁধ হয়ে নিচে ঝুলে পড়ত। এটা পরে আমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হতাম। এই প্রথম আমি সালাত আদায় করলাম, যেভাবে ১৪০০ বছর আগে রাসূল (সা.) সালাত আদায় করতেন। আশপাশের অন্যরা যা করছিল, দেখাদেখি আমিও তা করছিলাম। তারা উপরে হাত

উঠালে আমিও উঠালাম, "আল্লাহু আকবার"—আল্লাহ সবচেয়ে বড়। ওরা রুকু করতে সামনের দিকে ঝুঁকে গেলে আমিও তা-ই করলাম, "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম"—আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তারা যখন হাঁটু গেড়ে মেঝেতে তালু ও চেহারা লাগাল, আমিও তাদের সাথে সিজদা দিলাম, "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা"—আমার রব্বের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি, যিনি সবার উপরে।

একজন মানুষের সাথে তার স্রষ্টার সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে এই সিজদার চেয়ে বেশি কিছু কি আছে? একজন মানুষ, যে সাধারণত সোজা হয়ে গর্বভরে হাঁটে, শিরদাঁড়া টানটান—স্রষ্টার সামনে এভাবে মেঝেতে চেহারা লাগিয়ে নুয়ে পড়াটাই তো তার বিনয়। সিজদার এই ভঙ্গি আমার কাছে খুব ভালো লাগল। যখন এভাবে ছিলাম, সিজদায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করছিলাম, মনে হলো আমি তার সবচেয়ে কাছে আছি। আমি তখন তাঁর সাথে কথা বলতে পারছিলাম, তাঁকে ডাকতে পারছিলাম, তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারছিলাম, তাঁর সামনে কাঁদতে পারছিলাম। আমি তাঁকে ভালোবাসতে শিখলাম, সিজদার মধ্যেই।

প্রথম শুক্রবার বাড়ি ফেরার পর, ঐ লোকদের একজন আমাকে কুরআনের প্রথম কিছু অংশ পড়তে শেখাল-

শুরু করছি আল্লাহর নামে—যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার—যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।

বিচার দিনের একমাত্র অধিপতি।

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

আমাদের সরল পথ দেখাও।

সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ।

তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (সূরা ফাতিহা)

যদিও এই নতুন শব্দগুলো উচ্চারণা করতে জিহ্বা জড়িয়ে যাচ্ছিল বারবার, তা-ও আমি শিখতে থাকলাম, আরও দুটিসহ। বাড়ির মালিক আমাকে রাস্তার ধারের এক বিক্রেতার কাছ থেকে ছোট একটা বই কিনে দিলেন, সেখানে সালাতে বিভিন্ন ভঙ্গি ব্যাখ্যা করে লেখা ছিল, সাথে সালাতে কী কী পড়তে হবে তা-ও। তারা আমাকে একটি সবুজ রঙের মাদুরও দিল, যেটা বিছিয়ে আমি রুমেই সালাত আদায় করতে পারব। আমাকে ওযু করা শিখিয়ে দিলেন, এটা সালাত আদায়ের আগে পবিত্রতা অর্জনের একটি উপায়।

নীল রঙের টাইলস লাগানো বাথরুমে ওযু করতে গেলাম, তিনবার হাত ধুলাম, আমার হাতের কবজি হয়ে আঙুল বেয়ে ঠান্ডা পানির ধারা বেয়ে পড়ছে। ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করলাম, কিছুটা পানি নাকের ভেতরেও দিলাম। বাম হাত দিয়ে নাকের ভেতরের পানি বের করে আনলাম। তিনবার করলাম এমন। এরপর তিনবার আমার মুখ ধুলাম, তিনবার হাতের বাহুসহ ধুলাম, প্রথমে ডান, এরপর বাম। চুলের কিছু অংশে পানি দিয়ে মুছলাম, প্রথমে সামনের দিকে, পরে পেছনের দিকে। কানও মুছে নিলাম এভাবে, আঙুল দিয়ে। তারপর জগে পানি নিয়ে পায়ে ঢাললাম, তিনবার করে। ওযু করার মতো শান্তিদায়ক ব্যাপার খুব কমই আছে, বিশেষ করে গিনির প্রচন্ড গরমের সময়ে। আমার খুব পবিত্র অনুভূতি হতে লাগল, আমি সালাত আদায়ের জন্য সতর্ক হয়ে প্রস্তুত, ঠান্ডা ঠান্ডা ঘরটার বাইরে কিছু গাছ, জানালা দিয়ে তার নানারকম ছায়া খেলছে আমার জায়নামাজের উপর, টেরাকোটা নকশা করা মেঝের উপর।

কোনাক্রির দিনগুলো খুব দ্রুত চলে যাচ্ছিল—মার্কেটে যাওয়া, সালাত আদায়, নতুন বৌবৌ কেনা, প্রতিবেশী ও অন্যান্যদের সাথে ফ্রেঞ্চে কথাবার্তা বলা। সে বাড়ির লোকজনদের আনন্দ দিতে আমি তাদের ভাষার কিছু শব্দ শিখে ফেললাম, কথায় কথায় সেগুলোও ব্যবহার করতাম। এবং তারপর, একদিন হঠাৎ করে রামাদান চলে এলো। আমি যেন রামাদান অনুভব করতে পারছিলাম সেই পরিবেশে-

> "রামাদান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুষ্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।" (সূরা বাকারাহ, ২:১৮৫)

রামাদান মাসে একটি মুসলিম দেশে থাকার মতো ব্যাপার আমার কাছে আর একটিও নেই। ওয়েস্টার্ন মুসলিমদের কাছে এর প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কোনো আচার-অনুষ্ঠান নেই। এরকম সংহতি নেই, এরকম কিছুই নেই। মনে পড়ে, তাদের সবার (হ্যাঁ, প্রায় সবাই-ই) কাছ থেকে সূর্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার কথা জানতে পেরে আমি অন্যরকম একটি আস্থা অনুভব করেছিলাম। আর মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানের মতো আমরাও সূর্য ডোবার পর পেটপুরে খেলাম—সুগন্ধী চালের ভাত, সাথে মসলাদার মাছভাজা। শহরের সবচেয়ে ভালো বেকারীর মিষ্টি রুটি, টক-মিষ্টি স্যুপ যেটাকে বিসাপ বলা হয়, এক ধরণের ধনেপাতা, গোলাপজল দিয়ে বানানো হয় এই স্যুপ; ধোঁয়া ওঠা সুজির খাবার, মুরগীর রোস্ট আর বাড়ির কর্ত্রীর বানানো সুইটকর্নের বিশেষ সালাদ। মনমতো খাওয়ার পর মসজিদে যেতাম, ইশার সালাত আদায় করতে। নানান রঙ এর বৌবৌ এর সাথে কাঁধ থেকে ঝুলে পড়া স্বচ্ছ হিজাব পরা মহিলারা মসজিদের উপরের অংশ দখল করে রাখত আগেভাগে, বিশেষ করে তারাবীহর সময়। এটা হচ্ছে রামাদানের লম্বা সালাত যা প্রায় সব মসজিদেই আদায় করা হয়। রামাদানের ঊনত্রিশ বা ত্রিশ দিনে এই সালাতে পুরো কুরআন পাঠ করা হয়।

দিন যাচ্ছিল, আমিও নিজেকে দিব্যি মুসলিমদের একজন ভাবতে পারছিলাম—যারা একমাস আগেই আমার কাছে অচেনা ছিল। ঐ বাড়ির মহিলা আমাকে নিজের মেয়ের মতো দেখেন আর আমিও নিজেকে তাদের একজনই ভাবা শুরু করি। আমি তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছিলাম। পরিবারের সদস্যরা মিলে বেড়াতে গেলে সেখানে আমি উপস্থিত, বিয়ে বা কেনাকাটা করতে যাওয়া, কোথাওই তারা আমাকে ছাড়া যেত না। এর মানে এই না যে সেখানে আমার কোনো মানসিক পীড়া ছিল না। ব্যক্তিত্বের সংঘাত তো ছিলই, সাথে এমন কিছু বিষয়ও ছিল, যেগুলো সম্পর্কে আমি জানতাম যে ওসব অনৈসলামিক এবং হারাম (নিষিদ্ধ)—যদিও ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব কম ছিল। কিন্তু আমি এ-ও দেখতে পাচ্ছিলাম যে ইসলাম এমন একটি বিষয় যা মানুষ যাপন করে—শুধুই কিছু আদর্শের নাম ইসলাম না। এবং এখন আমি জানি, এই জীবন আমিও যাপন করতে পারি। (শুধু প্রশ্ন ছিল আমি কাকে বিয়ে করব!) কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমি সালাত আদায় করতাম, রোজা রাখতাম, মাথা ঢেকে রাখতাম, তবুও তখন পর্যন্ত আমি শাহাদাহ পাঠ করিনি—তখনো আমি মুসলিম ছিলাম না।

পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আমি একজন বদলে যাওয়া নারী হয়ে ফিরে এলাম। ইসলাম আমার জন্য—এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। আমি নিজেকে সঁপে দেওয়ার, আত্ম-সমর্পণের প্রস্তুতি শুরু করলাম। ওখান থেকে ফিরে আসার কয়েক সপ্তাহ পর, লন্ডনের এক ঠাণ্ডা বিবর্ণ দিনে আমি আর আমার বন্ধু সান্দ্রা রিজেন্ট পার্কের সেন্ট্রাল মসজিদে গেলাম। মাসের পর মাস প্রশ্ন করা, উত্তর খোঁজার পর অবশেষে ওখানে আমি দিলাম সেই সাক্ষ্য, সবচেয়ে বেশি সময় ধরে যা নিজের মাঝে লালন করে রেখেছিলাম-

> *“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর রাসূল”*

এক কথায়, “আমি মুসলিম হবো”—আমাকে নিয়ে এরকম আশা করা অন্যদের কাছে কঠিন ছিল। আমার বেড়ে ওঠা ছিল একেবারেই অধার্মিক পরিবেশে, আমার বয়স কম, একটা আনন্দময় ব্যস্ত জীবন পার করছিলাম আমি। পড়াশুনা করছিলাম, ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও, রাজনীতি নিয়ে সজাগ, সক্রিয়। আমি যা বিশ্বাস করি, তা নিয়ে উৎসাহী ছিলাম। এরপর ইসলাম এলো এবং আমার জীবনকে উল্টে দিল। আমাকে প্রশ্ন করতে শেখাল, উত্তর চাইতে এবং প্রকৃত সত্য গ্রহণ করে নিতে শেখাল। আমি ইসলাম থেকে ফিরে আসব এবং নিজের মতো করে স্বাধীন জীবনযাপন করব—এরকম কোনো উপায় আমার ছিল না। আমার কাছে এটাই ছিল প্রকৃত সত্য এবং আমি সেই সত্য গ্রহণ করে নিলাম।

আমার বোনদের পথচলা

আমার গল্পটা অবশ্যই আর সবার মতো ছিল না—যা অন্যরা সহজে গ্রহণ করতে পারে। সবকিছুর পর অধিকাংশ নারী কি খুব সহজেই প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে না? তাদের কিছু একটা বলে বুঝ দিলেই হয়। জীবন নিয়ে তারা হতাশ, বঞ্চনার জীবনে প্রলেপ দিতে তাদের কিছু বিশ্বাসের দরকার হয়—এদের ইসলাম গ্রহণের কারণ কি তা-ই নয়? অথবা তারা এ কাজ করে কোনো একজন পুরুষের জন্য, তাকে ধরে রাখতে, হয়তো সেই পুরুষের সন্তানের মা হতে। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে দুনিয়াতে সব নারীই এমন নয়—সুন্দরী, বুদ্ধিমান, নিজের পছন্দের ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার পরও যারা স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে ইসলামকে আলিঙ্গন করে। এটা জেনে অনেকেই অবাক হবে যে, এখনকার যেসব নারী মুসলিম হচ্ছে, তাদেরকে একই দলে ফেলে দেওয়া যায় না। তাদের প্রত্যেকের গল্প প্রত্যেকের চেয়ে আলাদা, এবং অসাধারণ।

কেন এসব বলা?

মুসলিমরা কখনোই অন্যদের এই গল্প শুনতে ক্লান্তিবোধ করে না—কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন চেহারার মানুষগুলো ইসলাম গ্রহণ করল? এই ব্যাপারটা প্রায় ক্ষেত্রেই প্রেরণা জাগায় যে বিভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়া মানুষগুলো জীবনের উদ্দেশ্যটা একইভাবে বুঝতে পেরে একত্রিত হয়েছে। মুসলিম বোন হিসেবে, মনের মিল থেকে আমরা এইসব মুগ্ধ করা গল্প শুনতে অভ্যস্ত। এগুলো আমাদের ইতিহাসের অংশ। অমুসলিমদের জন্য তা-ও তারা রহস্যাবৃতাই থেকে যায়, যদিও তারা একই রাস্তা দিয়ে হাঁটে। একই রাস্তার ধারে বাস করে, যদিও তাদের বাচ্চারা আমাদের বাচ্চাদের সাথে একইসাথে পড়াশুনা করে। আমার মনে হয় ভেতরের সেই একাত্মাগুলোকে সামনে আনার সময় হয়ে গেছে। গত ছয় বছরে তাদের একজন হয়ে আমি যেই সুবিধাগুলো ভোগ করেছি, তা আমি সবাইকে জানাতে চাই, যাতে করে অন্যরাও তাদের এই আধ্যাত্মিক সফরের বিস্ময়কর গল্পগুলো বলতে পারে। সেই গল্পগুলো বলতে পারে, যা নানান বয়সের, নানান বর্ণের, নানান জায়গার, নানান পরিবেশের অনেক মানুষকে এক জায়গায় এনেছে।

পাশের বাড়ির মেয়েটি

এই বইয়ের সমস্ত নারী একটা ক্ষেত্রে একই রকম—তারা প্রত্যেকেই এই সমাজের একটি পণ্য। তারা এই সমাজে জন্মেছে, এই সমাজের নিয়মে বড় হয়েছে, এই সমাজের ধ্যান-ধারণা নিজের মধ্যে শোষণ করেছে, এই সমাজের দেখানো স্বপ্ন আঁকড়ে সামনে এগিয়েছে। একটা সময় ছিল, খুব বেশিদিন আগে না, যখন অক্সফোর্ড স্ট্রিট এবং এডগার রোডে হেঁটে যাওয়া নিকাবাবৃতা নারীরা ছিল শুধু আরবেরই। যাই হোক, এই বইয়ে উল্লেখ করা বোনদের গল্পই আমাদের জানাবে যে, সমসাময়িক লন্ডনের আবৃতা নারীদের পেছনের চেহারাটা শুধুই মধ্যপ্রাচ্যের কোনো নারীর চেহারা নয়। মুসলিম হওয়ার পর থেকে আমি নানান দেশের নওমুসলিমদের সাথে মিশেছি, ইংরেজ, ওয়েলশ, স্কটিশ। আফ্রিকার কালোবর্ণের বোনরা, দূরপ্রাচ্যের চায়না, মালয়েশিয়া, তাইওয়ানের বোনরাও বাদ যায়নি। এমনকি সুদূর নিউজিল্যান্ডের নওমুসলিমদের সাথেও মিশেছি, হ্যাঁ, একজন সত্যিকারে কিউইয়ের সাথে, অস্ট্রেলিয়াও বাদ যায়নি। এখন মুসলিম নারী মানেই এই না যে তারা একটি ভিন্ন সংস্কৃতি লালন করে। যদিও সে যেমন, সেখান থেকে এই প্রশ্ন চলেই আসে—"আচ্ছা, সে আমাদের মতো নয়, তাই না?"

সত্যি কথা হলো, এই নারীটি আপনার পাশের বাড়িরও হতে পারে, আপনার মেয়ের স্কুলে যাওয়ার সঙ্গীও হতে পারে, আপনার ছেলে যেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে যায়, সে-ও হতে পারে। সে একটি চিলেকোঠার বাড়িতে বড় হতে পারে, আবার বিশাল অ্যাপার্টমেন্টেও হতে পারে। সে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে পারে, আবার তার কথায় নানানরকম আঞ্চলিক টানও থাকতে পারে। সে ফ্রেঞ্চ বলতে পারে, স্প্যানিশও বলতে পারে অথবা ইতালিয়ান, তার উচ্চারণ শুদ্ধ না-ও হতে পারে। সে হয়তো আপনার এ যাবতকালের খাওয়া সবচেয়ে ভালো স্টেক বানাতে পারে, অথবা পাই বানাতে পারে—হয়তো আপনি কখনো জানবেনও না খাবারটা হালাল ছিল! এরা হচ্ছে ফিশ অ্যান্ড চিপস, রাইস অ্যান্ড পিস, কোলস্ল সালাদের মতো নারী। তারা বিরিয়ানী, খিচুড়ী, তেহারী, স্প্রিং রোল, স্যুপ—সারাদিন তরকারী খাওয়া মানুষের মতো নয়। সমাজের প্রতিটি কোণা থেকে উঠে আসা এই পশ্চিমা নারীরা ইসলামকে সাগ্রহে গ্রহণ করে নিয়েছে, তবে পুরনো ধ্যান-ধারণা তাতে করে ধুয়ে যায়নি।

নামের মুসলিম

অবশ্য শুধু যে পশ্চিমা অমুসলিমরাই ইসলামে আসছে, তা নয়। যদিও জন্মগত মুসলিমরা ইসলামের ছিটেফোঁটা নিয়ে বড় হয়, তবুও আজকাল এমন ছেলে-মেয়ে পাওয়া খুব সহজ যারা মুসলিম নাম নিয়ে ওয়েস্টার্ন পিটার আর জ্যানের মতো করে বড় হয়। আল্লাহ শব্দটা তাদের কাছে নতুন, ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার তাদের কাছে এলিয়েনের মতো। অভিভাবকেরা অতি সতর্কভাবে সন্তানদের ইসলামবিহীন

করে বড় করে; এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। কেউ চায় তার সন্তান এই সমাজের মতো করে বড় হোক, এখানে এদের মতো করে বড় হোক, খাপ খাইয়ে নিক এই সমাজব্যবস্থায়। কেউ চান তার সন্তান ধার্মিক হয়ে পথচ্যুত না হয়ে পড়াশুনা, ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হোক, কেউ হয়তো চান না তার সন্তান এইসব ধর্মীয় সংস্কৃতির বোঝা মাথায় নিয়ে পেছনে পড়ে থাকুক; হয়তো তাদের এবং তাদের সন্তানের জীবনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই তারা সন্দিহান। এই বইয়ে এমন মুসলিম মায়েদের কথা আছে, যারা অমুসলিম মায়েদের সাথে একই স্কুলে গিয়েছে, একই রীতিনীতি মেনে বড় হয়েছে, একই মূল্যবোধ লালন করে এবং একই সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। তারাও এই সমাজের পণ্য এবং তাদের ইসলামে প্রবেশ করা অন্য কোনো পশ্চিমা নারীর ইসলামে প্রবেশে চেয়ে কম অদ্ভুত, কম অপ্রত্যাশিত নয়।

সারা এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছে, যেখানে ইসলামের চিহ্নমাত্র নেই।

> "আমার বাবা কোনোভাবেই একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম ছিলেন না" —সে বলছিল আমাকে। "তার জীবনে ইসলামের একটিমাত্র নিয়ম ছিল যে তিনি শূকরের গোশত খেতেন না। কিন্তু এছাড়া আমি কখনোই তাকে আল্লাহ নিয়ে কথা বলতে শুনিনি, সালাত আদায় করতে দেখিনি, রামাদানে রোজা রাখতে দেখিনি অথবা অন্যকিছু। এগুলো আমার কাছে এলিয়েনের কাজকর্ম মনে হতো। বাবা ছিলেন ইউরোপিয়ান সংস্কৃতিতে পুরোপুরি মুগ্ধ। পাকিস্তানের অশান্তির সাথে তুলনায় ইউরোপিয়ান সমাজব্যবস্থা তার কাছে ভালো লাগে এবং মানসিকতার সাথে মিলে যায়। তিনি চিত্রকলা পছন্দ করতেন, সংগীত পছন্দ করতেন, নানান ভাষা পছন্দ করতেন। বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানাশোনা তার প্রিয় ছিল।"

মূলত ইসলামের সাথে সারার পরিচয় হতো শুধুমাত্র স্কুলের বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে। সে তাদের পরিচয় জানত, কিন্তু এটা জানত না এই পরিচয় আসলে কী বহন করে!

"আমার মনে আছে, আমার এক পাকিস্তানী বন্ধু তার ভাইয়ের জন্য উপহার কিনতে গিয়ে এমন একটি আংটি কিনেছিল, যেটার উপরে আল্লাহ লেখা।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কী?

-আচ্ছা, এটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার নাম। সে আমাকে বলল, আমরা মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করি।

আমি বলেছিলাম, ও আচ্ছা...

"আমি আমার মুসলিম পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলাম। আমার জীবনে আমি কোনো মুসলিমকে সালাত আদায় করতে দেখিনি। আমার কাছে প্রার্থনা করা ছিল দুহাতের তালু সামনে এনে হাতজোড় করা।"

অন্য পাকিস্তানী বাচ্চাদের মতো সন্ধ্যাবেলা মাদ্রাসায় (যেখানে কুরআন পড়া এবং আরবি লিখতে-পড়তে শেখানো হয়) না গিয়ে সারা যেত চার্চে, সানডে স্কুলে যেত ব্রাউনি এবং গার্ল গাইডদের সাথে।

ফ্রান্সে বড় হওয়া 'হাযার'ও নিজের শেকড় থেকে উৎপাটিত ছিল। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অভিবাসীদের অনেকেই বড় বড় আরব প্রদেশে চলে যেত, অনেক আলজেরিয়ান চলে যেত মুসলিম ছিটমহলগুলোয়, কিন্তু হাযার এসব জায়গার কোনোটাতেই বড় হয়নি। হাযারের বাবা ছিলেন একজন হারক্কিস, যিনি আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্সের হয়ে লড়াই করেছিলেন।

সে আমাকে বলল, হারক্কিসদের সন্তানেরা ফরাসী হয়েই বড় হয়েছে, কারণ তাদের আর কিছু হওয়ার উপায় ছিল না। আলজেরিয়ান পরিচয়ও যেন গ্রহণ করতে পারত না। বাবা সবসময়ই আমাদের আরব প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চাইতেন। আমরা এমন জায়গায় থেকেছি, যেখানকার লোকজন অনেক বেশি ফরাসী। আলজেরিয়ান এবং ফরাসী পরিচয়ের মাঝামাঝি হওয়া নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা আমাদের বাড়িতে ছিল না, আমরা সত্যিই ফরাসীদের মতো বড় হয়েছি। আমার কখনোই কোনো আরব বা মুসলিম বন্ধু ছিল না। সবসময়ই আমার বন্ধু ছিল কারিন, এভেলিন, ইসাবেলা; ফরাসী, ফরাসী, ফরাসী।

সেখানে কোনো আরব প্রভাব ছিল না সত্যি, কিন্তু ইসলামের অল্পস্বল্প ছায়া অবশ্য ছিল। "আমাদের বাড়িতে কোনোরকম ইসলাম ছিল না যদিও, তবু কিছু বর্বর প্রথা ছিল। আমার বাবা-মা মানতেন সেগুলো, যেমন- বিয়ে, খতনা।"

জামিলার বাবা-মা ছিলেন বাংলাদেশের, তবে সে-ও বড় হয়েছে একদম অনৈসলামিক পরিবেশে।

> "আমি বড় হয়েছি এশিয়ান পরিবারে, যেটা ইসলামিক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এরকম কিছু হয়নি। বরং আমার নাম ছিল জ্যানে আর আমার ভাইয়ের নাম ছিলো গ্যাভিন। হ্যাঁ, আসলেই—জ্যানে আর গ্যাভিন!"

গির্জা, মন্দির

সবাই আমার মতো না, অনেক মেয়েই কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছে। এই বিশ্বাসের ব্যাপ্তি বিশাল—গোঁড়া খ্রিস্টান থেকে নামমাত্র খ্রিস্টান, তাওবাদী[১] থেকে ইহুদীবাদী, শিখ থেকে হিন্দু—আমি সব ধর্মের মেয়েদেরই দেখেছি। কেউ কেউ তাদের ধর্মীয় পটভূমির গল্পটা আমাকে বলেছেও।

উম্মে তারিক তার প্রজন্মের ক্যারিবিয়ানদের মতো একজন গোঁড়া খ্রিস্টান হিসেবে বড় হয়েছে। সে বলে, আমার বাবা-মা সবসময় ঈশ্বরকে ভয় পেতেন, তারা সবসময়

[১] এটা একটা চীনা ধর্ম।

আমাদের শিখিয়েছেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে এবং তাকে স্বীকার করতে। তো আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম, ঈশ্বরের ভয় সবসময়ই আমাদের মনের ভেতর ছিল।"

উম্মে মুহাম্মাদও এরকম দৃঢ় ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছে— "মা আমাদের খ্রিস্টান হিসেবে বড় করেছেন, আমরা চার্চ ও সানডে স্কুলে যেতাম। আমাদের সবসময় ঈশ্বরকে ভয় করতে শেখানো হতো এবং মনে রাখতে বলা হতো যে তিনি আমাদের দেখছেন। এটা ছিল পশ্চিম ভারতীয় ধারা।"

আলিয়া বড় হয়েছে একটি অধার্মিক পশ্চিম ভারতীয় পরিবারে, এর কারণ হতে পারে ধর্মের প্রতি তার নানার বাঁকা দৃষ্টি।

"আমরা ধার্মিক ছিলাম না। হয়তো এজন্য যে আমার নানা ছিলেন একজন সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট। তিনি এতটাই গোঁড়া ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি তার সব ছেলেমেয়েকে ধর্মের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে বড় করেন।"

মেই লিং খুব ছোট বয়স থেকেই ধর্মে বিশ্বাস করত। "যতদূর মনে পড়ে আমি যখন খুব ছোট, তখন থেকে আমার ভেতরে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, ঈশ্বর বলতে কেউ একজন আছেন।" তার জীবনের প্রথম বছরগুলো কাটে দাদা-দাদীর সাথে। তাওবাদে ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নিয়মিত মন্দিরে যেতেন, প্রার্থনা করতেন যাতে ইউনাইটেড কিংডমে থাকা মা-বাবার সাথে তারা মিলিত হতে পারেন।

> "আমার বাবা-মা তাওবাদী ছিলেন, কিন্তু তা চর্চা করতেন না। আমার দাদী করতেন এবং আমরা তাকে অনুসরণ করতাম। তিনি ছিলেন খুব প্রভাবশালী। আমরা সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম তাকে খুশি করার জন্য। অথচ মন্দিরে থাকা মূর্তিগুলোকে আমি কখনোই পছন্দ করতাম না—আমার কাছে সেগুলো ছিল শুধুই সাজিয়ে রাখার বস্তু—ওগুলো কখনোই আমার কাছে ঈশ্বর ছিল না। আমি ঈশ্বরকে আমার ভেতরে অনুভব করতাম। তিনি অবশ্যই ঐ স্বর্ণের মূর্তিগুলো ছিলেন না।"

একবার ব্রিটেনে, মেই বুঝতে পারল সে খ্রিস্টধর্মের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, সম্ভবত ইংল্যান্ড স্কুলে পড়ার সময় ওখানকার চার্চে সে এ বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তাই। কিন্তু এ লেভেলে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়ার সময় বাইবেলের উপর তার বিশ্বাসে চিড় ধরল।

> "আমি খুব বিস্মিত হলাম এবং ভয় পেলাম যে বাইবেল, দ্য নিউ টেস্টামেন্ট, নিজেদের মতো করে লেখা। এই খ্রিস্টধর্ম আমার কাছে প্রহসন মনে হলো। নিউ টেস্টামেন্ট ছিল এলোমেলো, তারা যা পড়ত, তা নেই, সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মনে হচ্ছিল যেন একটা বই হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছে এবং কোন পৃষ্ঠার পর কোন পৃষ্ঠা, তা না জেনেই আবার সেগুলো এক করে ফেলা হয়েছে। এগুলোর কোনো মানে হয় না। ঐ স্কুলের অনেক মেয়েই ছিল বিশপের মেয়ে। একদিন ক্লাসে কথাবার্তা বলার সময়, তারা দাঁড়িয়ে বলল, "যদিও বাইবেলকে পরিবর্তন করা হয়েছে, আমি এখনো এতে বিশ্বাস করি, আমি এখনো এই ধর্মের অটল অনুসারী।"

সেদিনই আমি আমার ক্রুশ খুলে রাখলাম এবং নিজেকে বললাম, ভুলে যাও এইসব।

কিন্তু, ইসলামে প্রবেশ করার চেয়ে মেই নিজে যেই বিশ্বাসগুলো নিয়ে বড় হয়েছে, সেগুলোকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেটা অন্য মেয়েরা করেনি। তারা খ্রিস্টান, হিন্দু অথবা শিখ পরিচয় নিয়েই ছিল, যার ছোটবেলার ধর্মপরিচয় যা।

বঞ্চিত শিশুরা

ইসলামে প্রবেশ করাটা অনেকের কাছেই একদম শেষ অবলম্বন। সেজন্য এই চিন্তা চলেই আসে যে, মুসলিম হওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে—একটা দুঃখজনক শৈশবও হতে পারে এর কারণ। আমি সেটা জানি, আমার ক্ষেত্রে এটা সত্যের চেয়ে বহু দূরে। জিম্বাবুয়েতে আমার শৈশব, কৈশোর ছিল সুখে, আনন্দে পূর্ণ। কিন্তু আমার অন্য বোনদের গল্পটা হয়তো ভিন্ন! এ কারণেই আমি তাদের বলেছি, তাদের ছোটবেলার এবং বেড়ে ওঠার গল্পগুলো আমাকে বলতে।

তাদের মধ্যে কেউ ছিল অতি যত্নে বড় হওয়া, কেউ মধ্যবিত্ত পরিবারের, কেউ একক পরিবারের। কারো পরিবার বেশ ঐতিহ্যবাহী, কারোটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এসব জেনে আমি অবাক হইনি। উদাহরণ হিসেবে ক্লেয়ারের কথা বলা যায়, আয়ারল্যান্ডে মা-বাবার নিজস্ব খামারে ওর শৈশব ছিল শান্ত, মনোরম।

> "আয়ারল্যান্ডে আমি একজন ধার্মিক ক্যাথলিক হিসেবে বড় হয়েছি। আমি ছিলাম খুবই যত্নের, সাদাবর্ণের, আইরিশ, ক্যাথলিক হয়ে বড় হওয়া মেয়ে। ছিলাম খুব পরিবারকেন্দ্রিক, অনেক চাচাতো ভাই-বোন, অনেক খালা-ফুপু-চাচী—একটা বিশাল পরিবার। আমি বড় হয়েছি কোনোকিছুকে পরোয়া না করে, দৌড়াদৌড়ি, ভেড়ার পালের পেছনে ছুটে, মাঠে এ মাথা থেকে ওমাথা বেড়িয়ে..."

মেই লিংও এরকম গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, যদিও আইরিশ তৃণভূমির চেয়ে তার জায়গা একটু ভিন্ন ছিল।

> "আমি বড় হয়েছি আমার নানীর সাথে তাইওয়ানের এক গ্রামের খামারবাড়িতে। মাঝে মাঝে নানা-নানীর সাথে দেখা করতে পাহাড়ে বেড়াতে যেতাম, ওখানে জীবনের সত্যিকার রূপ দেখা যেত, উঠোনে গোসল করার খোলা জায়গা, কোনো বাঁধা-ধরা সময় নেই..."

বয়স যখন তার সাড়ে চার, তখন মা-বাবা তাকে নিজেদের কাছে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। দুজন কঠোর পরিশ্রমী গতানুগতিক চাইনিজ মা-বাবার সবচেয়ে বড় মেয়ে হিসেবে সেখানে জীবন অনেক কঠিন হয়ে উঠল মেইয়ের জন্য।

> "শুরুতে ইংল্যান্ডে খাপ খাইয়ে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল—নতুন ভাষা, নতুন সংস্কৃতি, আমার মা-বাবার কথাবার্তার অনেক শব্দই আমার বোধগম্য হতো না। আমাকে কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হতো, অথচ আমি বেড়ে উঠেছি কোনো নিয়মকানুন না মেনেই। তারা যখন খেতে বলবে, ঘুমোতে বলবে, তখনই খেতে

হতো, ঘুমোতে হতো। তাইওয়ানে আমি অনেক অবাধ্য ছিলাম। আর ইংল্যান্ডে আমাকে সবসময়ই মা-বাবার সাথে থাকতে হতো, যেখানে তাইওয়ানে আমি থাকতাম নানা-নানুর সাথে, মামা, খালা, অন্যান্য ভাইবোন মিলে। সেখানে মা-বাবা ছিল আমার কাছে এমন ব্যাপার—যার সাথে আমি অভ্যস্ত না।"

সারা'র মতো কেউ কেউ বড় হয়েছে এমন পরিবারে, যেখানে মা-বাবারা নারী-পুরুষের গতানুগতিক ব্যাপারগুলো মেনে জীবন পরিচালনা করে।

"আমার মা-বাবা যখন বিয়ে করে, তখন মায়ের জন্য চাকরী করা কোনো সমস্যা ছিল না। তারা অনেক মজা করেছে, অন্যান্য অল্পবয়সী ইউরোপিয়ান জুটিরা যা করে, তারা তা সবই করেছে। কিন্তু যখন আমার মায়ের কোলে সন্তান এলো, বাবা তখন তাকে বলল, "হয়েছে, এখন তুমি বাচ্চাদের সাথে ঘরে থাক, রান্না কর, কাপড় ধোও। তোমার জায়গা এখন ঘরে।" আমার মা তখন জানত না তার কী করা উচিত। হুট করে আমার বাবা আর সব পাকিস্তানী পুরুষের মতো আচরণ করা শুরু করল, যেটা আমার মা তার কাছ থেকে কখনোই আশা করেনি। কিন্তু বাবা যে আমার ভাইকে আর আমাকে ভালোবাসত, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাবা আমাদের অনেক আদর করত, খুব খেয়াল করত। আমাদের অনেক সময় দিত বাবা, এমনকি মা আর বাবা আলাদা হয়ে যাওয়ার পরও বাবা আমাদের সময় দিত।"

আলিয়াহ'র মতো কেউ কেউ শুধু মায়ের কাছেই বড় হয়েছে।

"আমার মা এবং বাবা, দুইজনই সেন্ট লুসিয়ান, কিন্তু আমি বড় হয়েছি এক-অভিভাবকের পরিবারে—শুধু আমার মা, আমার ভাই আর আমি। শৈশব নিয়ে আমার কোনো খারাপ স্মৃতি নেই। মা কখনোই আমাদের মারেননি, এমনকি উঁচু গলায় বকাও দেননি। ছোটবেলার এমন কিছুই আমার মনে পড়ে না।"

এইসব বোনদের শৈশবের গল্প শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পারলাম, এদের কারো গল্পকেই নির্দিষ্ট কোনো ছাঁচে ফেলা যায় না। ভাঙা পরিবার থেকে এরা ইসলামে এসেছে, অথবা বাবার অনুপস্থিতিতে, অথবা মায়ের অত্যাচারে, অথবা খুব খামখেয়ালী জীবন থেকে এরা সবাই ইসলামে ঢুকেছে—এমন কথা কোনোভাবেই বলা যায় না। এই নারীদের নিজেদের মতোই তাদের প্রত্যেকের ছোটবেলা নানারকমের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ। এবং অবশ্যই এই নারীদের গল্প প্রমাণ করে, অসুখী জীবনযাপন থেকে বেরিয়ে আসতেই মানুষ শুধু ইসলাম গ্রহণ করে—এই ধারণা ভুল। একথাও ঠিক না যে তাদের জীবনে আশা-ভরসা, স্বপ্ন নেই। অনেকক্ষেত্রে মা-বাবার কাছেই পড়াশুনার গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। জামিলা যেমনটা বলেছিল,

"আমার বাবা-মায়ের জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল পড়াশুনা, এটাই ছিল সব। আমাদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে মুখ্য, আর বাকী সব ছিল গৌণ। আমার ধারণা এর পেছনে কারণ হলো, এদেশে অভিবাসী হিসেবে

আসায় তারা ভাবতেন এখানে নিজের জায়গা করে নেওয়ার জন্য শিক্ষাটাই সবচেয়ে বেশি দরকারী।"

মেই একটি বেসরকারী স্কুলে যেত। তার উপরও খুব ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা ছিল, যদিও বাবা-মায়ের দিক থেকে সহযোগিতা খুব একটা ছিল না। তার স্কুলের ব্যাপারে বাবা-মায়ের দায়িত্বপালন সম্পর্কে সে আমাকে বলেছিল।

"আমার বাবা-মা আমাকে একটা নিখুঁত বাচ্চা হিসেবে চাইতেন—টানটান ফ্রক গায়ে, পরিষ্কার মোজা, চকচক করা জুতো......কিন্তু তারা নিজেদের কাজ নিয়ে আসলেই খুব ব্যস্ত থাকতেন, রেস্তোরাঁ চালাতেন। এ ব্যাপারে তারা জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করতেন, কারণ তারা সফল হতে চাইতেন। এটা চাইনিজ সংস্কৃতির একটা অংশ—তুমি যখন মারা যাবে, তুমি তোমার সন্তান, তোমার পরিবারের জন্য কিছু রেখে যাও। যদি না পারো, তাহলে তুমি ব্যর্থ। সন্তানদের অনেক ভালোবাসলেও তুমি ব্যর্থ, তাদের না দেখে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করলেও তুমি ব্যর্থই।"

আলিয়াহ অবশ্য স্কুলে তেমন নামকরা ছাত্রী ছিল না, বরং তার এবং তার মতো বাচ্চাদের ব্যাপারে অন্যদের নেতিবাচক ধারণা সত্যি করেই সে বড় হচ্ছিল।

"আমি ছিলাম স্কুলের "দুষ্টু বাচ্চা"দের একজন। আমি যে গ্রামার স্কুলটায় যেতাম, সেখানে কালো বাচ্চা খুব বেশি ছিল না, বেশিরভাগই ছিল শ্বেতাঙ্গ। ওখানে কালো বাচ্চা মানেই খারাপ ভাবা হতো। মা আমাকে ভালো বাচ্চা বানানোর জন্য সেখানে পাঠালেন, আমিও চেষ্টা শুরু করলাম। কিন্তু একটা সময় আমি যা করিনি, তার জন্য অভিযুক্ত হতে হতে আমি সেগুলোই করা শুরু করলাম। এভাবে আমি খ্যাতি পেয়ে গেলাম। আমরা আসলেই খারাপ ছিলাম—স্কুল পালাতাম, ধূমপান করতাম, অন্য বাচ্চাদের মানসিক যন্ত্রণা দিতাম, দেয়ালে দেয়ালে ছবি আঁকতাম। পরীক্ষার শেষ দিনে আমি স্কুল ছেড়ে চলে এলাম—আর কখনো সেখানে ফিরে না যাওয়ার জন্য।"

নিজের এই কাজগুলোর সাজা সে নিজেই পেত পরীক্ষা আসলে। কিন্তু নিজের মতো করে কিছু করার জন্য সে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পড়াশুনা নিয়ে সে যা করেছে, তা ঢাকতে।

"আমি কলেজে যেতে চাইলাম কারণ আমার মনে হলো আমি অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছি। শেষের দিকে আমার মনে হলো আমি মনে হয় পাশ করতে পারবই না। স্কুলে থাকতেই রান্নার প্রতি আমার আগ্রহ তৈরী হয়, অন্য সব বিষয়ে খারাপ করলেও গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে আমি সবসময় ভালো নাম্বার পেতাম। খুব ছোটোবেলা থেকে আমার শেফ হওয়ার স্বপ্ন ছিল—আমি সেটা হওয়ার জন্যই কলেজে গেলাম।"

উম্মে মুহাম্মাদ স্কুল ভালোবাসত, শেখার এই পুরো প্রক্রিয়াটিই ছিল তার প্রিয়। কিন্তু বাসার ভেতরের সমস্যাগুলো তাকে প্রভাবিত করা শুরু করল।

"আমি সবসময়ই প্রথমদিকের ছাত্রী ছিলাম, সব বিষয়ে ভালো নাম্বার পাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে আমি আর আমার বাড়ির কাজগুলো করতে পারছিলাম না আর। আমি চাচ্ছিলাম না শিক্ষকরা আমাকে বলুক, এটা করো, ওটা করো না। আমি

ক্লাসের পড়ার সময় খেলাধুলা শুরু করলাম, স্কুল পালানো শুরু করলাম। আমি আর আমার এক বান্ধবী প্রায়ই নাম লিখিয়ে বের হয়ে যেতাম, ক্লাস করতামই না বলতে গেলে। আমি একেবারেই আগ্রহী ছিলাম না কারণ আমার মাথায় অনেক কিছু কাজ করত। শেষ পর্যন্ত আমি ও-লেভেলের মাত্র একটি পরীক্ষা দিলাম, আর একটিও দিতে যাইনি, এবং ফলাফল দেখতেও না।"

মেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল, পারিবারিক ব্যবসা দেখার জন্য এই পড়াশুনা তার জন্য দরকারী।

"স্কুল শেষ করে আমি নটিংহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে যাই। মা-বাবা আমাকে এমন কিছু নিয়ে পড়তে বলেছিলেন, যেটা পারিবারিক ব্যবসা চালানোর সময় আমার জন্য সহায়ক হবে। আমি ব্যবসায় শিক্ষা বেছে নিলাম।"

ক্লেয়ার ব্রিস্টলে আইন নিয়ে পড়ার জন্য আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে গেল। ভূগোলে একটা ডিগ্রী নিয়ে সারা মন দিল দুনিয়াটা ঘুরে বেড়ানোয়। ফিরবার সময় উন্নয়ন অধ্যয়নে মাস্টার্সটাও করে ফেলল।

ইসলাম গ্রহণ করা সাধারণ, অশিক্ষিত অল্প কিছু নওমুসলিমের থেকে অনেক আলাদা এমন নারীও আছে যারা পড়াশুনায় বেশ ভালো করেছে। আবার অনেকেই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে, কেউ মাস্টার্স করেছে, কেউ হয়তো নিজের সফল ক্যারিয়ারের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছে। এদেরকে একই সংজ্ঞায় ফেলে দেওয়ার কোনো উপায় নেই—এরা কেউই সিদ্ধান্ত নিতে না পারা অজ্ঞ, বোকা নারী নন।

ক্যারিয়ার গার্লস...

অনেক নারী শুধু যে উচ্চশিক্ষা নিয়েছে তা নয়, তাদের মধ্যে অনেকজন ক্যারিয়ার গড়ার জন্য কঠোর পরিশ্রমও করেছে।

ফ্রান্সের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে হাযার লন্ডনে চলে আসে। সংগীতশিল্পে প্রায় ছয় বছর সময় দিয়ে একটি রেকর্ড কোম্পানির মার্কেটিং এ কাজ করছে।

"একক সংগীতায়োজন এবং পিআর কোম্পানির কাজ করেছি আমি। মিউজিকের জন্য, মিউজিকের সাথে মিউজিকেই থেকেছি আমি। আমি ভেবেছি এটাই আমার ধর্ম। আমার এক ডিজে অংশীদার আর আমি দুজন একইরকম লক্ষ্য নিয়ে বাঁচতাম। একটা সময় আমি ক্লাবে রেকর্ড বাজাতাম, একটা স্থানীয় রেডিও স্টেশনেও, ওখানে সপ্তাহান্তে সকালবেলার একটা অনুষ্ঠানও করতাম।"

আবারো আলিয়াহ'র কথা, এটা সত্যি, ওর শুরুটা ছিল বেশ দুঃখজনক, কিন্তু খুব দ্রুত সে একজন দক্ষ ও উদ্যমী শেফ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। কলেজে থাকতেই প্রথমসারির এক হোটেলে কাজ শুরু করল। সে সময় তার লক্ষ্য ছিল প্রধান শেফ হওয়া, একটা সময় নিজের একটা রেস্তোরাঁ খোলা। এক সন্তান জন্মদান এবং

হৃদয়ভাঙার একটি পর্ব শেষ করে সে আবার নিজের কাজে ফিরে আসে এবং মহাউদ্যমে কাজ করতে থাকে।

> "আমার বাচ্চাকে একটি নার্সারিতে রেখে আমি আবার হোটেলের কাজে ফিরে আসি। আমার ওজন কমিয়ে ফেলি, আবার সেই সুশৃঙ্খল পোশাকে আমি আবার আমাকে খুঁজে পাই। ঐ সময় আমি কাজেও খুব ভালো করতে থাকি এবং আমার মনে হতে থাকে আমার সব আছে—আমার একটা সন্তান আছে; আমার সন্তান যা চায়, সব তার আছে, জামা-কাপড়ের অভাব নেই, সপ্তাহ শেষে মদের বারে সময় কাটানো, ঘুরতে যেতে চাইলে আমি তা-ও করতে পারি।"

যেমন জীবনের স্বপ্ন সে দেখেছিল, অথবা যেমন জীবন সে ভেবেছিল, তেমন জীবনই সে যাপন করছিল।

মেইও অনেক পরিশ্রমী ছিল। তার সময় ভাগ করা ছিল প্রতিদিনের কাজ আর পারিবারিক ব্যবসা দেখার জন্য, এর ফাঁক দিয়ে বন্ধু-বান্ধবের জন্যও সময় বের করে নিত। সে তার প্রতিদিনকার কথা আমাকে এভাবে বলেছিল—

> "নয়টা-পাঁচটার চাকরি শেষে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ছয়টা বাজত আমার। সাড়ে ছয়টার মধ্যে কিছু খেয়ে আবার রেডি হয়ে যেতাম রেস্টুরেন্টে, সেখানে রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতাম। এরপর বাড়ি ফিরে ঘুম, আবার উঠা, কাজে যাওয়া—এভাবেই টাকা কামাই করতাম আর বাবা-মাকে খুশি রাখতাম। যদি বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-পরিচিতদের সাথে সময় কাটাতে চাইতাম, তাহলে কাজ শেষ করে যেতাম। আমি থাকতাম সেন্ট্রাল লন্ডনে, খুব ভালো সময় কাটছিল আমার। অনেক বন্ধু-বান্ধব, টাকা........."

গুড টাইমস অ্যান্ড পার্টি গার্লস

কাজ আর পড়াশুনার বাইরেও এই নারীদের একটা সামাজিক জীবন ছিল এবং সেই জীবনে তাদের কেউ কেউ ছিল খুবই সক্রিয়।

উম্মে মুহাম্মাদ তার কিছু কাজকর্মের ব্যাপারে আমাকে বলেছিল—

> "ঐ সময়ে আমার আর আমার বোনের এমন একটা বয়স, আমাদের কেউ আটকাত না। আমরা ভালোবাসতাম গান, ফ্যাশন, গ্ল্যামার, হৈ-হুল্লোড়, নাটক, সমস্ত কিছু। তখন আশির দশক, লেগিংস, রা-রা স্কার্ট, ব্যাগি ট্রাউজার আর এলোমেলো গহনার চল। আমরা মহাসমারোহে এসব নিয়ে আনন্দ করে বেড়াতাম।"

ব্রিস্টলের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ক্লেয়ার যখন আয়ারল্যান্ড ছেড়ে গেল, তখন নিজের মতো উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করা কাউকে সে খুঁজে পাচ্ছিল না।

> "আমি প্রতিরাতে জেগে থাকতাম মদ খাওয়ার জন্য, প্রতি সপ্তাহের ছুটিতে রাতের বেলা নেশা করার জন্য জাগতাম কিন্তু এসব কাজে আমাকে সঙ্গ দেওয়ার মতো কাউকে পেতাম না। আমি ভাবতাম কে আমার সাথে রাত দুইটায় বারে যাবে? কেউই

যেত না। অথচ আমি পুরোপুরিভাবে চাইতাম এসব, এবং তা যে পাচ্ছি না, তাই আমি অখুশি থাকতাম। ছুটিতে যখন বেলফাস্টে যেতাম, পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা হতো—আমার উন্মাদনা তখন চরমে পৌঁছত।"

হাযার আর তার বন্ধুরা ছিল লন্ডন ক্লাবের পরিচিত মুখ। ডিজে পরিচালনা, বিনোদন জগতের তারকাদের সাথে উঠাবসা, ইভেন্ট-পার্টির আয়োজন করা ছিল তাদের নিত্যকাজ। নতুন নতুন ফ্যাশনের পোশাক পরা, নামীদামী রেস্টুরেন্টে খাওয়া—এ সবই হতো।

সারার মতো কেউ কেউ ছিল ভিন্নরুচির, ওরা ঘুরে বেড়াত আর্টহাউজে, গ্যালারিতে। সারা ঘুরে বেড়াতেও পছন্দ করত। যখনই টাকা জমত, সাথে সময়ও মিলে যেত—সে ইউরোপ-আমেরিকার কোনো দেশে চলে যেত।

"আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, নতুন জিনিস দেখছিলাম, নতুন ভাষা শিখছিলাম—আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিটাকে ভারী করছিলাম" —সে আমাকে বলেছিল।

জামিলার পরিবার মুসলিম হলেও তার জীবনে বাঁধাধরা নিয়মগুলোর বালাই ছিল না।

> "আমার জীবনযাপন চলছিল পশ্চিমাদের মতো করে, সবকিছুতেই। ওয়েস্টার্ন জামাকাপড় পরা আমার জন্য কোনো সমস্যা ছিল না। আমার যা খুশি আমি তা-ই পরতে পারতাম। আমার ভাই ও আমার উপর কোনো নিয়ম চাপানো ছিল না। কিন্তু তা-ও আমরা একটা সীমারেখার মধ্যে থাকতাম, বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাইনি—মানে আমরা কোনো মাদক নিতাম না। আসলে আমরা বড় হয়েছি স্বাধীন, সংস্কারমুক্ত হয়ে।"

নারীবাদী ও বিদ্রোহীরা

অনেক নওমুসলিমই হয় সন্ধানী ধরনের—সত্য সন্ধান করে। ফলাফলে এটা খুবই স্বাভাবিক—ইসলামের দিকে আসার পথে তারা নানারকমের আদর্শের দিকে পরিচালিত হয়—আমি যেমন কালো জাতীয়তাবাদের দিকে চলে গিয়েছিলাম।

সারার ইসলামে আসার রাস্তাটা বাঁকে বাঁকে, বিরতিতে বিরতিতে ভরা, সে বলছিল—

> "আমি সবসময়ই হেঁটে যাচ্ছিলাম, কোনো একটা সত্য খুঁজে পেতে চাচ্ছিলাম। আমি এটা বুঝতে পারছিলাম যে জীবনে চলার জন্য একটা সঠিক পথ আছে কিন্তু আমি জানতাম না কোনটা সেই পথ। আমি যখন খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম, তখন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা চলে আসলো। তৃতীয় বিশ্ব বলতে যা বোঝানো হয়, আমি সেখানকার উন্নয়নের ব্যাপার নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। এটা আমাকে নিয়ে গেল সমাজতন্ত্রের দিকে। সতেরো বছর বয়স থেকে আমি ছিলাম তীব্র নারীবাদী। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, আমি যখন আমার বাবাকে হারাই, তখন বুঝতে পারি যে আমি একজন পুরুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছি কারণ তিনি তার সবটুকুই আমার জন্য রেখেছিলেন। এটা আমার মাথায় নানান চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়,

আমি ফেমিনিজমের বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা শুরু করি। শির হাইট, নাওমি ওলফ, জার্মান গ্রির এর বই, সাইমন দ্য বেভর এর মতো ক্ল্যাসিক আমি গিলতে থাকি।"

ক্লেয়ার সবসময়ই ছিল "রেইজ অ্যাগেইন্সট দ্য মেশিন" ধরনের মেয়ে—সে নিজেকে খুঁজে পায় নারীবাদী আন্দোলন দ্য রায়ট গার্লস এ।

সে নিজের ব্যাপারে এভাবে বলছিল—

"দ্য রায়ট গার্লসকে আমার ভালো লাগে কারণ আমি গান-বাজনা খুব পছন্দ করতাম। আমার কিছু বন্ধু লিড গিটার বাজাত, ওদের সাথে আমি বেজ গিটার বাজাতাম। এক বন্ধুর কাছে আমি প্রথম রায়ট গার্লসের রেকর্ড পাই। এভাবে জড়িয়ে যাই প্রথমে। আর সেই সময় আমি সাহিত্যেও খুব আগ্রহী ছিলাম। ওদের লিরিকগুলো বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারি। সেগুলোতে একটা ব্যঙ্গাত্মক ব্যাপারও থাকত, যেমন 'আমরা ভালো গাইতে পারি না, ভালো বাজাতেও পারি না, তা-ও এসব করছি কারণ কে এসবে পাত্তা দেয়?'—এটাই ছিল সেই দ্রোহ, যা আমি খুঁজছিলাম।"

এখন কী করা?

এই নারীদের জীবনে সব ছিল—শিক্ষা, টাকা, বন্ধুবাধব, আনন্দ। কিন্তু তা-ও কোথায় যেন কী একটা ছিল না। কেউ এটা বুঝত, কেউ এটা এড়িয়ে যেত, কিন্তু এটা অস্বীকার করার তো কোনো উপায় নেই যে, একটা শূন্যস্থান তো থাকেই—যা পৃথিবীর সমস্ত ভালো জিনিস মিলেও পূরণ করতে পারে না।

নিজের উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাপনের ব্যাপারে আলিয়াহ একটু-আধটু ভাবত—

"গতবছর মুসলিম হওয়ার আগে আমার মানসিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। মনে হতো আমার সব আছে কিন্তু তা-ও কী যেন একটা নেই। আমি ভাবছিলাম, জীবনে এসব ছাড়াও কিছু একটা দরকার। পোর্শে গাড়িওয়ালা লোকেরা আমাকে এখানে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু ওসব আমাকে টানত না। ঐ সময় আমার নিজেকে রোবট মনে হচ্ছিল—কাজে যাও, টাকা কামাও, খরচ করে বাড়ি ফেরো—এরকম জীবনের কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হচ্ছিল না। একটা সময় ধরে আমি কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম— "আমরা কেন বেঁচে আছি?" এইরকম প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম।"

উম্মে মুহাম্মাদ বলেছিল, আনন্দ করে দিনশেষে বাড়ি ফিরে সে জানালার পাশে বসে থাকত, রাতের আকাশ দেখত, ভাবত জীবনে এর বাইরে কিছু কি আসলেও আছে? কোনো উদ্দেশ্য কি আছে?

ক্লেয়ারের হই-হুল্লোড়ে ভরা জীবনও একটা সময় রঙ ফেলা শুরু করল।

"এক রাতে আমরা ক্লাবে গেলাম, সবাই মাদক নিচ্ছিল। কিন্তু তারপর সব থেমে গেল। আমার শুধু মনে হলো আমি আর এসব করতে পারি না। আমার কাছে এগুলো ভালো লাগছে না। রাতে আমি বাড়ি ফিরছিলাম, একদম শূন্য লাগছিল নিজেকে।

ওগুলোকে আর আমার পক্ষের কিছু মনে হচ্ছিল না। সবকিছু সাদা-কালো লাগছিল। সমস্ত কিছু আমার কাছে খুব ভয়ঙ্কর লাগল।"

উম্মে তারিকের গল্পটা আবার ভিন্ন রকম। বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশ—পরিবার, সন্তান সমস্ত দায়িত্বপালন শেষে তিনি আবার তার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ভাবতে বসলেন—ছোটবেলা থেকে যে বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছেন।

"আমি ভাবলাম, আমি মরে গেলে কী হবে? জাহান্নামের আগুনের কথা শুনে শুনে তুমি বড় হয়েছ এবং ভালোমতোই জানো ওটা মোটেও সুখের কোনো জায়গা না। তুমি নিশ্চিতভাবেই জানো যে তুমি মারা যাবে। তারপর কী ঘটবে তোমার সাথে? আমি স্রষ্টার ইবাদাত করার ব্যাপারে মনোযোগ দিয়ে ভাবতে লাগলাম।"

এটাই তাকে নতুন কিছুর দিকে নিয়ে গেল। তিনি সত্যিকারের গির্জার সন্ধানে নামলেন—যেখানে একজন ঈশ্বরের ইবাদাত করা হয়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা স্পষ্টতা ছিল, একটা স্বচ্ছ ভাবনার মুহূর্ত ছিল যেটা কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, আর সেই প্রশ্নগুলোই অজস্ররকম পথে উত্তরের দিকে নিয়ে গেছে—একটা আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা, জীবন-বদলানো অভিজ্ঞতা, সত্যান্বেষণের মধ্য দিয়ে ইসলামের উত্তরগুলো পথ দেখিয়েছে।

ইসলামের মুখোমুখি

ইসলামের সাথে হাযারের পরিচয় ছিল একদমই অপরিকল্পিত এবং অপ্রত্যাশিত। একদিন একটি জ্যায ক্লাবে ডিজে করার সময় এক সদ্য মুসলিমের সাথে তার পরিচয় হয়, বেশ ভালো কথাবার্তা হয় তাদের। প্রায়ই বিভিন্ন কথাবার্তায় নিজের তিন বছরের ছোট ছেলেটির পড়াশুনা নিয়ে উদ্বিগ্নতার কথা চলে আসতো। সে চাইতো তার বাচ্চা খুব ভালো-সঙ্গের সাথে বড় হোক, আবার একই সাথে তাকে কোনো বেসরকারী স্কুলে পাঠাতে চাইত না। সে চাইত না দিনশেষে তার বাচ্চা একটা উগ্র পিচ্চি হোক, যার সাথে বাবা-মায়ের কোনো মিলই নেই। নতুন পরিচিত বন্ধুটি তাকে পরামর্শ দিল বাচ্চাকে মুসলিম স্কুলে পাঠাতে।

"আমি প্রথমে ভাবলাম, কোনোভাবেই এটা করা যাবে না। এই ধার্মিক লোকগুলো আমার বাচ্চার মগজধোলাই করুক সে আমি হতে দিতে পারি না। কিন্তু বেশ কয়েকবার এ নিয়ে কথা বলার পর আমি এলাকার মুসলিম স্কুলটি একবার দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আপাদমস্তক কালোতে ঢাকা একজন মেয়ে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আমি কি পুরোটা দেখব কি না! কিন্তু সেইসাথে পর্দার আড়ালের কণ্ঠটির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ কাজ করছিল। আমাকে ভেতরে ডাকা হলো, প্রধান শিক্ষিকার সাথে দেখা হলো, তার চেহারা আমার এখনো মনে পড়ে। আমার আগ্রহ মিটিল, একটা প্রশান্তি নিয়ে আমি বের হয়ে এলাম, কারণ ওখানে আর কোনো আসন খালি ছিল না।"

তবে এক সপ্তাহ পর হাযারের কাছে একটি ফোন আসে সেখানে থেকে, জানানো হলো একটি আসন খালি হয়েছে, তাকে এবং তার বাচ্চাকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হচ্ছে। হাযার নিজেকে বোঝালো ব্যাপারটা অস্থায়ী, বাচ্চাকে ভর্তি করিয়ে দিল। ছোট্টো ফারিসের মুসলিম নার্সারিতে যাওয়া শুরু হলো।

"আমি আসলেই বুঝি না কী জন্য শেষ পর্যন্ত আমি ওকে সেখানে ভর্তি করিয়ে আসলাম। হয়তো আমি ভেবেছিলাম আমার বাচ্চাটা অন্তত ঐ দুষ্টু বাচ্চাগুলোর সঙ্গে থাকবে না, তাদের সাথে থাকবে যারা ধার্মিক এবং শান্ত ধরনের। কিন্তু আমি চাইতাম না সে একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বাড়ি ফিরুক। আমি শুধু চাইতাম ওর আচার-আচরণ সুন্দর হোক, সে একটা ভালো ছেলে হোক—এটুকুই।"

সত্যি বলতে ফারিস তার নতুন স্কুলটাকে ভালোবাসতে শুরু করল। সে প্রতিদিন বাড়ি ফিরত মজার মজার গল্প নিয়ে। কিন্তু এর সাথে ইসলামিক নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহারও থাকত, এমন কিছু থাকত যেগুলো গ্রহণ করার জন্য হাযার পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না।

"যখনই সে কোনো ব্যাপারে আমাকে বলত যে এটা করা ইসলামে অনুমোদিত না, আমি তাকে বলতাম, 'ফারিস, এই মানুষগুলো আমাদের জীবনযাপনের ধরণ ঠিক করে দেবে না। আমরা এরকমই, আর তুমি সেখানে পড়তে যাও, এটুকুই, ব্যস।' কিন্তু একদিন আমি তাকে কুরআন পড়তে শুনলাম, খুব সুন্দর লাগছিল শুনতে। একদিন সে বাড়ী ফিরে আমাকে ইবরাহিম (আ.) এর ঘটনা বলল, তাকে যখন আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয়, আল্লাহ আগুনকে তার জন্য ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন। ফারিস বাড়িতে একটা আর্টওয়ার্ক নিয়ে আসে যেখানে তার এই গল্পটি লিখে নিয়ে যাওয়ার কথা। ওটা ছিল খুবই সুন্দর। সে আমাকে ঘটনাটি বলছিল, সেটি তাকে স্পর্শ করে গিয়েছে, সাথে আমাকেও।"

এরপর হাযার জানার চেষ্টা শুরু করল তার ছেলে স্কুলে আর কী কী শেখে।

সে ফারিসের প্রধান শিক্ষিকা আর তার বাচ্চাদের সাথেও সময় কাটানো শুরু করল, তারা ছিল তার বাচ্চার খেলার সঙ্গী। দ্রুত সে মসজিদে শুক্রবারের বক্তৃতা শুনতে যাওয়া শুরু করল, সে খেয়াল রাখত ঐদিন যেন তার কোনো কাজ না থাকে।

"ঐ বক্তৃতাগুলো প্রত্যেকটাই আমার কাছে দৈববাণী ছিল, আমি এটাকে আমার সপ্তাহের কাজ বানিয়ে ফেললাম। আমি একটা লিনেন কোট আর শিফনের স্কার্ফ পরে যেতাম সেখানে, ফিরে আসতাম যখন, ভেতরটা খুব পরিপূর্ণ লাগত। আমি একটু নির্জন জায়গায় গাড়ি রাখতাম, কেউ যেন আমাকে দেখে না ফেলে এভাবে আবার চলে আসতাম। আমার জন্য খুব কঠিন সময় ছিল যখন আমি এই পোশাকের ভেতর একধরনের শান্তি খুঁজে পেতে শুরু করলাম। মনে হতো আমার নিজের ভেতরটা দুইধরণের ব্যক্তিসত্তায় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, দুটো পরিচয়ে, আমি যেন দুইরকমের জীবন-যাপন করছি। আমি দুটো জীবনই পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম, দেখব

কোনটা বেশি ভালো এবং প্রশান্তির। অবশেষে আমার কাছে পুরনো জীবনের চেয়ে আমার নতুন জীবনটাকেই বেশি ফলপ্রসূ মনে হলো। ভেতরে দানা বেঁধে উঠা গুটিপোকা আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিল।"

উম্মে তারিকের সাথে ইসলামের সাক্ষাৎ হয় চার্চে চার্চে সত্যিকার প্রার্থনার ঈশ্বর খুঁজতে গিয়ে। আরো বেশি ধার্মিক হতে গিয়ে সে বিভিন্ন চার্চ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার ঝুলি বানিয়ে ফেলল।

"আমাকে পেন্তেকোস্টদের গীর্জার সন্ধান দেওয়া হয়েছিল। আমি সেখানে গিয়েছিলাম, তাদের গাওয়া গান বেশ আকর্ষণীয় লাগল। হ্যাঁ, আসলেই। কিন্তু এরপরই আমার মনে হলো তারা আসলে ঈশ্বরের উপাসনা করে না। যিশু কীভাবে প্রার্থনা করতেন? যিশু কার কাছে প্রার্থনা করতেন? এই মানুষগুলো যিশুর কাছে চাইছে, ঈশ্বরের কাছে নয়। কিন্তু যিশু তো সবসময় ঈশ্বরের কাছে চাইতেন কারণ বাইবেলেই আছে, "পিতার প্রতি"। তো আমার মনে হলো এটা সঠিক না। আমি আসলে কখনোই খ্রিস্টধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইনি, আমি অন্যান্য চার্চের কার্যক্রম দেখার কথা ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা সত্য আছে, কিন্তু সেটা আমি কীভাবে খুঁজে পাব?"

তার ছেলে এবং ছেলের বউ ততদিনে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে,

"আমার ছেলে মুসলিম হওয়ার পর আমি হতাশ হয়ে যাই কারণ আমি কখনো ইসলাম সম্পর্কে শুনিইনি। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভূত লাগে, আমি কখনো এই ব্যাপারে শুনিনি, এটা নিশ্চয়ই নতুন কিছু।"

তাই আমি ওদের বলতাম, "আমার মনে হয় না সত্যটা তোমাদের কাছে আছে, এটা খ্রিস্টধর্মের মধ্যেই আছে। শুধুমাত্র ঠিকঠাক চার্চটা খুঁজে বের করতে হবে।" আমার ছেলে বলত, "মা, আমাদের মধ্যে কেউ একজন ভুল পথে আছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, এবং সেটা অবশ্যই আমি না।"

"এবং আমি ওর সাথে প্রায়ই রাগ করলেও ভেতরে ভেতরে জ্বলছিলাম এটা জানার জন্য, সত্যটা আসলে কার কাছে আছে? ছেলে একদিন বার্নাবাস বই নিয়ে বাড়ি ফিরল, তারপর ঘটনা বদলে গেল আমার জন্য। আমি উদারমনে বইটা পড়লাম, সেখানে লেখা ছিল যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি, এবং সত্যি বলতে সেখান থেকে স্রষ্টা আমাকে সত্যি পথ দেখানো শুরু করলেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, ভাবতে শুরু করলাম। আমার মনে হলো, ঈশ্বর তো সবকিছুই করতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর একজন নবিকে এমন পীড়াদায়ক মৃত্যু দেবেন? আমি বইটা পড়তে থাকলাম, ওটুকু আমার জন্য ছিল। আল্লাহ আমার মনের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিলেন—আমি বিশ্বাস করলাম।"

মেইয়ের সাথে ইসলামের পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের মাধ্যমে। বছরশেষের ছুটিতে তাদের অনেকেই মুসলিম হয়েছিল। ক্যাম্পাসে ফিরে বন্ধুদের সাথে দেখা হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করল যে সে এই ব্যাপারে আগ্রহী কি না।

"আমি বলেছিলাম, 'আমি এধরনের ধর্মে আগ্রহী না। এটা আমার জন্য না।' স্কুলে ইসলামের ব্যাপারে আমি কিছু কিছু শিখেছিলাম—পাঁচটি স্তম্ভ, এধরনের ব্যাপার। কিন্তু এছাড়া এ ব্যাপারে কিছুই আমার মনে ছিল না। এরপর ওরা জিজ্ঞেস করল আমার কোনো ধর্ম আছে কি না, আমার ধর্ম কোনটা। আমি ওদের বললাম যে আমার একটা ধর্ম ছিল কিন্তু এটার কোনো নাম ছিল না। তো ওরা জিজ্ঞেস করল কী ছিল সেটা।"

আমি বললাম, আমি একজন স্রষ্টায় বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা জানি না তিনি দেখতে কেমন। তাঁর কোনো সাদা দাঁড়ি অথবা সাদা চুল অথবা এরকম কিছ নেই। তোমার যখনই প্রয়োজন তখনই তিনি তোমাকে শুনেন। তুমি যা-ই চাও না কেন, তা করার ক্ষমতা তাঁর আছে।"

ঐ সময়ে আমার পিঠে ব্যথা ছিল এবং সেজন্য আমি ইয়োগা করছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল আমার পিঠের জন্য চন্দ্রাসন সবচেয়ে ভালো। বন্ধুগুলো বলল, তুমি জানো? মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় এই আসনে যায়।

-না! আসলেই?

'তো আমার বন্ধু বলল সম্ভবত আমার ধর্ম অনেকটা ইসলামের মতোই। আমি তাকে এসব ফালতু কথা বলতে মানা করলাম। কিন্তু আমরা ইসলাম নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম, আমি কথাগুলো অনুভব করতে শুরু করলাম। আমরা সারা রাত, সারা দিন ইসলাম নিয়ে কথা বললাম। কিন্তু তারপরও আমার মনে হচ্ছিল ইসলাম আমার জন্য না কারণ আমার নিজেকে মুসলিম মুসলিম লাগত না। একদিন একজন আমাকে কিছু প্রশ্ন লেখা একটা কাগজ দিল—আপনি কি একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন? (হ্যাঁ) আপনি কি ফেরেশতাগণে বিশ্বাস করেন? (হ্যাঁ) আপনি কি নবিগণে বিশ্বাস করেন? (হ্যাঁ) একদম শেষে লেখা ছিল, যদি সবগুলো উত্তরই হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনি একজন মুসলিম।"

আমি খাবি খাচ্ছিলাম, 'আহ! আমি একজন মুসলিম। ও মাই গড, আমি একজন মুসলিম হতে পারি না। আমার মা-বাবা আমাকে মেরেই ফেলবে!' কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, হঠাৎ আমার মনে হলো, এটা আমার মা-বাবার ব্যাপার না, এটা আমার স্রষ্টার ব্যাপার।"

ইসলামের সাথে প্রথম পরিচয়ের পর সবাই এটাকে সাথে সাথে গ্রহণ করে নিতে বা স্বাগত জানাতে পারে না। টিনএজার জামিলার জীবনে ইসলামের প্রবেশ ছিল

অনেকটা অনধিকার প্রবেশের মতো। তার ভীষণ ভালোবাসার ভাই একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে ইসলামের কথা বলল।

> "ইসলামের ব্যাপারে জেনে আমার ভাইয়ের পা পিছলে গিয়েছিল। অবশ্যই তারা ভাবছিল যে ও বদ্ধ পাগলের প্রলাপ বকছে।
>
> সে সময় আমিও স্রোতের সাথে যাই কারণ আমার ভাই ছিল আমার কাছে অনেক কিছু। সে ছিল আমার পথপ্রদর্শক—আমার জীবনের সবকিছু। জীবনের সবকিছুতে আমি তার কথা মেনে চলেছি। কিন্তু এটা এমন কিছু ছিল যা আমার কাছে স্বস্তিদায়ক মনে হচ্ছিল না, এটা আমার আমাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলছিল।"

জামিলার বয়স অল্প, সে তখন দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, ভেতরটা ছিন্নভিন্ন, সে এখন কী করবে? ভাই তার কাছে যা আশা করে, তা পূরণ করবে নাকি যেমনভাবে জীবন চলছিল, সেভাবেই চলতে থাকবে।

"ছুটির দিনে সে যখন বাড়িতে থাকত, আমি দুই চরিত্রে অভিনয় করতাম। মনে হতো সেখানে যেন দুজন মানুষ আছে—জামিলা আর জ্যানে।"

কিন্তু এরকম খুব বেশিদিন টিকল না। মায়ের সামনে একদিন হিজাব পরা অবস্থায় মুখোমুখি লেগে গেল জামিলার, সে বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

"ও"র জন্যই করেছে এই কাজ!

কয়েকটা ব্যতিক্রম বাদে, একজন মুসলিম পুরুষের সাথে সম্পর্ক থাকাবস্থায় যদি একজন নারী ইসলাম গ্রহণ করে, ধরে নেওয়া হয় সে এটা ঐ পুরুষের জন্যই করেছে—তাকে খুশি করতে, তাকে ধরে রাখতে। যাই হোক, আমি আবিষ্কার করলাম যে এই ধারণা আসলে সত্য থেকে বহুদূরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাথের মানুষটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করলেও নারীরা আসলে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বাধীনভাবে এই ব্যাপারে জেনে নেয়, পড়াশুনা করে নেয়।

ক্লেয়ারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন গ্যারেথের দেখা হয়, গ্যারেথ তাকে জানায় যে সে একজন মুসলিম, যদিও ইসলামের অনেক কিছুই সে মেনে চলে না। কিন্তু এক বছর গ্রীষ্মের ছুটি শেষে, "পুরো ছুটি জুড়ে সে নেশা করেছে এবং এটাই তাকে ইসলাম সম্পর্কে আরেকটু জানাশোনার দিকে ঠেলে দেয়। ওকে দেখে মনে হয় ওর চিন্তাভাবনা অনেক গভীরে বদলে গেছে। আমরা একসাথে হলেই এসব আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুরু করি। ধীরে ধীরে সে ইসলাম মানা শুরু করল। দ্বীন নিয়ে সে আমাকে মাঝে মাঝে বলত কিন্তু আমি পাত্তা দিতাম না। ধর্ম নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবেছি এবং আমার মনে হয়েছে সেগুলো আমার অনেক ঊর্ধ্বে বা আমি সেগুলোর অনেক ঊর্ধ্বে। আমি মনে করতাম, তো কী হয়েছে? তুমি যা বিশ্বাস করতে চাও করো কিন্তু এসব নিয়ে আগানোর দরকার কী? সে আমাকে বই পড়তে উৎসাহিত করত কিন্তু আমি কখনোই পড়তাম না। আমার মনে হতো আমি একজন ক্যাথলিক এবং সেটাই

আমার জন্য ভালো। এটা ভেবে যে আমি খুব সান্ত্বনা পেতাম তা না, কিন্তু আমি এটাই। আমি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হতে চাইতাম না।

কিন্তু গ্যারেথ তাকে ইসলামের ব্যাপারে বলে যেতেই থাকল। ক্লেয়ারের নিজের বিশ্বাস নিয়েই কথা বলতে উৎসাহিত করত, নিজের ইসলামিক বিশ্বাস নিয়ে বলত।

"সত্যি বলতে আমি বুঝতে পারছিলাম ইসলাম সত্য কিন্তু এর নিয়মকানুন মেনে নিতে পারছিলাম না।"

গ্যারেথের বাড়িতে যখন সে প্রথমবার বেড়াতে গেল, গ্যারেথ তার বোনের সাথে জ্যানেকে একটি মেয়ের সাথে দেখা করতে পাঠাল, সে ছিল একজন নতুন মুসলিম। কিন্তু সেটা হয়ে দাঁড়ায় ভয়ানক। ট্রেনে করে ব্রিস্টলে ফেরার সময় জ্যানে পইপই করে গ্যারেথকে বলে দেয়, "দেখো, আমি মুসলিম না, আমি মুসলিম হচ্ছিও না। এটা তোমাকে বুঝতে হবে এবং আমি এই নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাই না।"

"সে আচ্ছা বলল। চুপ হয়ে থাকল এই নিয়ে, প্রায় ছ'সপ্তাহ।"

এই ব্যাপারে আবার কথা উঠার আগে ক্লেয়ার ইসলাম ও মুসলিম হওয়া নিয়ে ভাবছিল।

> "কিছু ব্যাপার ঘটল, যেগুলোর কারণে আমি আমার নিজের জীবনযাপনের ধরণ নিয়ে ভাবা শুরু করলাম, যে জীবন আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ক্লাবে যাওয়া, নেশা করা আমার আর ভালো লাগছে না কিন্তু এই নিয়ে আমি কাউকে কিছু বললাম না। সব আমার ভেতরেই রাখলাম। হয়তো আমার মনে হচ্ছিল গ্যারেথের সব কথা মেনে নেওয়া হবে একটা যুদ্ধে হেরে যাওয়ার মতো—আমার ভেতরে তখনও একগুঁয়েমি রয়ে গিয়েছিল। আমার কেল্টিক শেকড় ছিল সেটা, কোনো সন্দেহ নেই! সে সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ের দোকানে কাজ করতাম আর বই পড়তাম, গ্যারেথ অনেক আগে আমাকে যে বইগুলো দিয়েছিল, সেগুলো। এক রাতে, আমার সব বন্ধু রুম থেকে চলে যাওয়ার পর আমি আর গ্যারেথ সামনে রুমে বসে ছিলাম। সে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয় তুমি এখন মুসলিম হওয়ার জন্য প্রস্তুত?
>
> এবং মজার ব্যাপার হলো আমি প্রস্তুত ছিলাম। আমি শাহাদাহ পাঠ করলাম—বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিলাম। আমি বলতে পারব না কেন, কিন্তু আল্লাহ আমার মনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। আমি এখন একজন মুসলিম।"

উম্মে মুহাম্মাদও তার সাথের ছেলেটির দ্বারাই ইসলাম সম্পর্কে প্রথম জানতে পারে—আব্দুর রহিম, তার সন্তানের বাবা।

> "আমি জানতাম যে ইসলাম কিছু একটা ব্যাপার যেটা নিয়ে আব্দুর রহিম আগ্রহী। সে মাঝে মাঝে এই ব্যাপারে কথা বলত। কিন্তু আমি কখনোই বুঝিনি সে এই ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস। এরপর এক শনিবার সকালের বাজার শেষে ফুরফুরে মেজাজে আমি

বড় রাস্তা ধরে হেঁটে আসছিলাম, সে আসছিল উল্টো দিক থেকে। বলল সে মসজিদ থেকে আসছে এবং সে শাহাদাহ পড়ে নিয়েছে। আমি বললাম, ও আচ্ছা, তুমি এটা বিশ্বাস করো। মুসলিম হওয়ার পর সে আমাকে একটি কুরআন কিনে দিল।

উম্মে মুহাম্মাদ যতই ইসলাম সম্বন্ধে জানছিল, ততই বুঝতে পারছিল যে এটাই সত্য। কিন্তু সে ছিল নিজের পার্টি করা জীবনধরণ ছেড়ে দিতে নারাজ। তাই কিছুই করল না এ বিষয়ে। যাই হোক, তার ছেলে মুহাম্মাদের জন্মের পর তার বাবা ইসলামকে পুরোপুরি মেনে চলতে চাইল, সে উম্মে মুহাম্মাদকে ইসলাম নিয়ে অনেক বলা শুরু করল, তাকে দেখাল কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়।

"আমি তখনো আগ্রহী ছিলাম কিন্তু পরিবর্তন আনতে ভয় পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম ইসলাম মানলে সামনে অনেক বাধ্যবাধকতা আসবে আর আমি ভীত ছিলাম ওগুলো আমি মানতে পারব না ভেবে। আমার ভয়ের আরেকটা কারণ ছিল আমার মতো কেউ থাকবে না, সবাই আমার চেয়ে বড় হবে, বাংলা, আরবি অথবা উর্দুতে কথা বলবে। আমি সত্যিই এই পরিবর্তনটাকে ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি সালাত আদায় করা শুরু করলাম। 'দ্য মেসেজ' ভিডিওটাও দেখলাম। ওখানে ইসলামের শুরুর দিকের ঘটনাগুলো ছিল। আমি কুরআন এবং হাদিসে যা পড়েছি, এর সাথে আরো অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমার বাচ্চাটার জন্মের দুই মাস পর আব্দুর রহিম চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সে মসজিদে গিয়ে থাকবে। আমরা যেভাবে থাকছিলাম সে ওভাবে থাকতে চায়নি, তাই আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। আমি তখন বিধ্বস্ত, কারণ আমি ওকে ভালোবাসতাম কিন্তু বুঝতে পারছিলাম সে এমন করেছিল কারণ আমি বদলানোর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সে তা-ও আসত, মুহাম্মাদকে দেখে যেত কিন্তু আমার সাথে থাকত না বা আমাকে সময় দিত না, কারণ আমরা বিবাহিত ছিলাম না। সে সতর্ক হচ্ছিল যে সে একজন মুসলিম এবং এর চেয়ে বড় তার কাছে আর কিছুই ছিল না।"

এরপর উম্মে মুহাম্মাদের সাথে ক'জন মুসলিম তরুণীর পরিচয় হয়, তারা ছিল নানাবর্ণের, নানান পরিবেশের। তারা উম্মে মুহাম্মাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং তাদের সাথে আরবি ক্লাসে আসার আমন্ত্রণ জানায়। ক'দিন পর সে তার ঐ বছরের জন্মদিনের জন্য জামা কিনতে বেরোয়। মুহাম্মাদের বাবা যে দোকানে কাজ করত, সে দোকানে একজন মুসলিম লোকের সাথে তার দেখা হয়। সেই লোক মুহাম্মাদের মা'কে চিনতে পেরে খুব অবাক হয় এবং আব্দুর রহিম তাদের দুজনকে ছেড়ে চলে এসেছে জানতে পেরে একটু অখুশিও হয়। সে উম্মে মুহাম্মাদকে ইসলাম নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করে এবং তার স্বচ্ছন্দ উত্তর শুনে অবাক হয়। সে তাকে নিচে গিয়ে মসজিদে মুসলিম ভাইদের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেয়। "তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি ইসলাম ও আল্লাহ সম্পর্কে কী জানি। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এসব সত্যি বলে বিশ্বাস করেন?"

"আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি। তারপর তারা বলল, তাহলে আর কীসের জন্য অপেক্ষা?"

"তখন আমি ভাবি, আমি আসলে কীসের জন্য অপেক্ষা করছি? সেজেগুজে রাস্তায় বেরোনো ছাড়া আর কিছুই আমাকে বাধা দিচ্ছে না। তো তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কি মুসলিম হওয়ার জন্য প্রস্তুত কি না।"

"আমি ভাবলাম, আমি এখনই কেন শাহাদাহ পড়ে ফেলছি না? পড়ে ফেললাম।"

আলিয়াহর সাথে আহমাদের দেখা এমন একটা সময়ে, যখন আলিয়াহ ক্যারিয়ারে খুব সফল, কিন্তু তার সামাজিক জীবন বিধ্বস্ত। সম্পর্কের শুরুতেই আহমাদের ইসলাম গ্রহণ ছিল একটা পরীক্ষা আর ইসলামের সাথে তাদের তিক্ত-মধুর পরিচয়। আহমাদ আলিয়াহর ছেলে জামিলকে নিয়ে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু প্রায় চার ঘণ্টা দেরী করে ফিরে আসে। দুশ্চিন্তায় আলিয়াহ প্রায় অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল।

"সে বাড়ি ফিরল চেহারায় একটা চওড়া হাসি নিয়ে, আমার এখনো মনে পড়ে, ওকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।"

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ছিলে তুমি? আমি চিন্তা করছিলাম।"

"সে উত্তর দিল, 'আমি মুসলিম হয়ে গেছি।' ঠিক এভাবেই। পার্কে এক ভাইয়ের সাথে তার দেখা হয়, সেই লোক তাকে ইসলাম সম্পর্কে বলে। আহমাদ তার কথা এত বেশি বিশ্বাস করে ফেলে যে মসজিদে চলে যায় ঐ লোকের সাথে, গিয়ে শাহাদাহ পড়ে ফেলে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ফেটে পড়ছিলাম আবেগে।

"তুমি মুসলিম হয়ে গেছ মানে? কী বলছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'তুমি দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে, আর এখন বলছ তুমি মুসলিম।'" আমি চিৎকার করে কাঁদছিলাম।

"সে আমাকে একটা রেকর্ড শুনতে বলছিল, এটা শোনো, এটা শোনো। এরপর সে কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দিল। শুনে আমার মনে হচ্ছিল অদ্ভুত এশিয়ান গান যেন। সে তখন উত্তেজিত, ইসলাম ছাড়া আর কিছু নিয়েই কথা বলছে না। মনে হচ্ছিল যেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গত ছয় মাস উধাও হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল ওর সাথে আমার আর কোনো মিল নেই।"

"আমি তাকে বললাম, এসবে কাজ হবে না।"

"পরদিন সকালে সে মসজিদে গেল সালাত আদায় করতে। এরপর থেকে সে যত ইসলামিক কাজকর্ম করছিল, সবই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছিল, একটার চেয়ে আরেকটা বেশি অদ্ভুত। যেন ওকে কেউ অপহরণ করে মহাকাশযানে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর এমন অদ্ভুত করে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল আমি ভিন্ন একটা মানুষকে দেখছি। সে মসজিদে মিশে গেল, প্রায় সবসময় সেখানে থাকত, সেখানে

ভাইদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছিল। বাড়ি ফিরে সে ওগুলো আমাকে শোনাত কিন্তু আমি চিৎকার করে কাঁদতে চাইতাম। তারপর সে বলতে শুরু করল অমুক কাজ তমুক কাজ সে আর করতে পারবে না কারণ সেগুলো...... এখানে সে হারাম শব্দটা ব্যবহার করছিল। আমি ওকে আর বুঝতে পারছিলাম না। সে আমাকে ওসব স্কার্ট পরতে মানা করা শুরু করল, যে আমি ওরকম কাপড়-চোপড় পরতে পারব না। আমি সেগুলো মানছিলাম না। আমার মনে পড়ে আমি ব্যাগ গুছিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলাম, আমি এসব করতে পারব না। আমি এসবের জন্য প্রস্তুত না। তুমি মুসলিম হয়ে যেতে পারো না, আর আমাকেও তোমার মতো হতে বলতে পারো না।"

"আমি একটা কালো মেয়েকে চিনতাম। সে তার মুখ ঢেকে রাখত, আমার কাছে তাকে দেখতে তামাশার মতো লাগত। আমরা একসাথে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে মজা নিতাম কারণ সে-ই ছিল আমার চেনা একমাত্র মানুষ যে অরকম পোশাক পরত। আমি ভাবতাম, তুমি আশা করো আমি এরকম হয়ে যাব? কোনোভাবেই সম্ভব না!"

"কিন্তু ও আমাকে চলে না যাওয়ার জন্য বোঝাল, আমরা অনেক্ষণ কথা বললাম। আমাকে মসজিদে যেতে বলল। একটা স্কার্ফ কিনে দিল আমাকে, বলল ঐ জায়গার সম্মান রক্ষার জন্য হলেও আমার এটা পরে সেখানে যাওয়া উচিত। মনে পড়ে, আমি স্কার্ফটা মাথায় দিয়ে চিবুকের নিচে হাত দিয়ে ধরে রেখে সেখানে গেলাম। একজন মেয়ে আমাকে বলল, আপনি এটা পিন দিয়ে আটকাচ্ছেন না কেন? সহজ তো। এই বলে সে আমার স্কার্ফটা পিন দিয়ে আটকে দিল। তারপর ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কি মুসলিম কি না; বললাম, না। এরপর আমরা কথা বলা শুরু করলাম। এবং এরপর আমি মুসলিমদের অনেক কার্যক্রমেই যাওয়া শুরু করলাম কারণ প্রায়দিনই কিছু না কিছু নিয়ে আলোচনা বা অন্যকিছু থাকত।"

"এরপর একদিন আমরা স্থানীয় একটা স্কুলে ইসলামের উপর আলোচনা শুনতে গেলাম। ওটা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। সেদিন আমি অনেক বোনের সাথে কথা বলি, আমার বেশ ভালো লাগছিল, সবাই যেন আমাকে সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছিল। ফিরে আসার জন্য যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন একজন মেয়ের সাথে কথা বলি, আর তার সাথে আমার কথা শেষ হয় এই দিয়ে, আমার ধারণা আমি একজন মুসলিম হতে চাই।"

"তারও কয়েকদিন পর মসজিদে আমি বলি, আমি এখন শাহাদাহ পড়তে চাই। তারা আমাকে উপরের তলায় নিয়ে গেল, আমি শাহাদাহ পড়লাম। সব বোন খুব খুশি ছিল, যেন এক বিশাল পার্টি।"

আমরা যেটা দেখলাম, মাঝে মাঝে একজন পুরুষ একজন নারীর ইসলাম গ্রহণ করার পেছনের প্রভাবক হতে পারে। কিন্তু এমন একজন নারী পাওয়া দুর্লভ, যে দ্বীন নিয়ে পড়াশুনা করেনি, এই নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়েনি এবং নিজের জন্য সেটা গ্রহণ করে নেয়নি।

মগজধোলাই ও তিরস্কার

একটা ব্যাপার আছে, যা অনেক নারীর ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে মিলে যায়, সেটি হলো—ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন করা, জানা এবং পড়াশুনা করা। এই তথ্যটা অনেকের জন্যই, বিশেষ করে আমাদের বাবা-মায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা ভাবেন এই তরুণ নওমুসলিমদের হয়তো মগজধোলাই করা হয়েছে এবং জোর করে হুমকি দিয়ে শাহাদাহ পড়ানো হয়েছে। অধিকাংশ নারীই আগে ইসলামি বিশ্বাসের ভেতর-বাহির নিয়ে পড়াশুনা করে; অনেকেই ভেতর থেকে বুঝতে পারে যে এই দ্বীনই সত্য।

আব্দুর রহিম যখন মুসলিম হয়েছিল, উম্মে মুহাম্মাদ তখনো জীবন নিজের মতো করে উপভোগ করছিল—পার্টি করা, আমোদ-ফুর্তি, সাজ-গোজ, যখন-তখন বাইরে যাওয়া-আসা। প্রথমবার কুরআন পড়া তাকে বিশ্বাসের একটুও কাছে আনেনি। সে এই ব্যাপারে মনোযোগ দিতে শুরু করে যখন তাকে একটি হাদিসের বই এনে দেওয়া হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী আছে সে বইয়ে।

"সে হাদিসের বইটি আমাকে স্পর্শ করে গিয়েছিল। দ্বীনের বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে পড়াশুনা আমাকে ভাবায়, হুম, ব্যাপারগুলোকে সত্যি বলেই মনে হচ্ছে, আমি এগুলো মানতে পারি।"

"এবং তারপর আমি পুরো কুরআন পড়ি, স্রষ্টার একত্ববাদের ব্যাপারটি আমাকে আকৃষ্ট করে, যিশুর ঘটনাও, কীভাবে তিনি বড় হয়েছেন এবং তাকে যে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি, তা। এরপর আমাকে বার্নাবাসের বইটি দেওয়া হয়, সেটিও আমাকে একইভাবে টানে। এর পর আরও বেশকিছু বই পড়ার পর আমি ভেতরে অনুভব করতে শুরু করি, ইসলামই সত্য ধর্ম।"

আব্দুর রহিম তাকে একটি বই কেনার জন্য উৎসাহ দেয়, সে তখন নবিদের ব্যাপারে পড়তে শুরু করে, শেষনবি মুহাম্মাদ (সা.) ব্যাপারেও। সমস্ত কিছু তার কাছে চমৎকার লাগে, সে প্রায়ই স্থানীয় বইয়ের দোকানে যাওয়া শুরু করে, আরো কী আছে জানতে।

উম্মে তারিকের সব সন্দেহও দূর হয়ে যায় 'গসপেল অফ বারনাবাস' পড়ে। ক্লেয়ার হচ্ছে আরেকজন, যে ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা করেছে, গোপনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ের দোকানে কাজ করার সময়। সে গ্যারেথকে জানতে দিতে চায়নি যে অবশেষে সে-ও দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছে।

আর জামিলার ব্যাপারে যেটা হয়েছিল, সে দ্বীনের ব্যাপারে জানতে নিজে থেকেই আগ্রহী হয় এবং বুঝতে পারে যে তার পক্ষে দ্বীন মেনে চলা সম্ভব, তখনই সে সামনে এগোয়। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তার ভাই তাকে পশ্চিম লন্ডনের দুজন সম্মানিত ব্যক্তি আসিয়াহ ও সিরাজের কাছে নিয়ে যায়। তখনকার সময়ের ব্যাপারে সে

বলে, "আমার ধারণা তখন আমি খুবই অদ্ভুত আচরণ করছিলাম যে কেউই আমাকে বুঝতে পারছিল না। আমাকে কিছুই বলা যাচ্ছিল না, বিশেষ করে দ্বীনের ব্যাপারে—আমি খুব একগুঁয়ে হয়ে গিয়েছিলাম এ ব্যাপারে। কেউ আমাকে সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারছিল না, এ ব্যাপারে তোমার ভাবনাটা কী? অথবা, ইসলাম এরকম বলে, তুমি কী ভাবো এই নিয়ে? কথাবার্তা এ পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারত না। আমি রুম থেকে বেরিয়ে চলে আসতাম।"

"কিন্তু কিছু কৌশলী ব্যাপার ছিল, যা আমাকে স্পর্শ করছিল, ইসলামের ব্যাপারে বুঝাচ্ছিল এবং নরম করছিল। আসিয়াহর কথাবার্তা, আচরণ, আমার সাথে সে যেভাবে কথা বলত, তার বাচ্চাদের সাথে যেভাবে আচরণ করত, অন্যদের সাথেও।"

জামিলা কাউকে না জানিয়ে হাসপাতালে সিরাজের সাথে দেখা করতে যাওয়া শুরু করল। তখনই সে আসলে নিজের ব্যাপারে এবং নিজের জীবন নিয়ে ঠিকঠাক ভাবা শুরু করেছিল।

"সে আমাকে একটা কথা বলেছিল—হয়তো শুনতে আজব লাগতে পারে, গুরুত্বপুর্ণ না-ও হতে পারে, কিন্তু সেটিই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এখন কী চাইছো?

উত্তরে বলেছিলাম, এমন না যে আমি একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি না এবং মুহাম্মাদকে শেষ নবি হিসেবে মানি না। কিন্তু বাকীসব কাজ আমার দ্বারা সম্ভব না। আমি মাথায় ওসব দিতে পারব না, এসব আমাকে দিয়ে হবে না, আমি এসব করতে চাই না। আমি আমার স্বাধীনতা চাই। আমি আমার মনমতো করতে চাই।

শুনতে শুনতে সে বিছানায় শোয়া থেকে উঠে বসল, অক্সিজেন মাস্কটা ঠিক করে নিল। তখন সে খুবই অসুস্থ ছিল, করুণ অবস্থা।

সে বলতে শুরু করল, আমার দিকে তাকাও। মৃত্যু আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি হয়তো এখন তোমার সাথে কথা বলছি, কিন্তু কাল কথা না-ও বলতে পারি......।

নিজের বন্ধু এবং পথপ্রদর্শককে মৃত্যুর কাছাকাছি দেখাটা জামিলার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সে যতই এসব নিয়ে ভাবছিল, ততই আর সবকিছু, যা তাকে আটকে রেখেছিল, ধূসর হতে লাগল। মাঝে মাঝে বলা হয়, মৃত্যু কাউকে জীবনের ব্যাপারে নতুন দর্শন দিয়ে যায়—জামিলার সাথে ঠিক এটাই হয়েছিল।

"সেখান থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি সবকিছুকে এরকম এলোমেলো ফেলে রাখতে পারি না, এসবের জন্য আমার সময় নেই। এটাই আমাকে আঘাত করল। এবং এবার সত্যি সত্যি আমাকেই আঘাত করল—এতদিন আমি আমার ভাইয়ের জন্য এসব করছিলাম, কিন্তু এবার আমি সব নিজের জন্য অনুভব করলাম আর এটাই পার্থক্য গড়ে দিল। নিজে থেকে ব্যাপারগুলো বোঝা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যখন অন্য কেউ তোমাকে এসব বোঝাবে, তখন তোমার মনে হতে পারে

তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জোর করা হচ্ছে। এবং এইখানেই আল্লাহ্ পথ দেখান— এবং যখন আল্লাহ্ পথ দেখান, তখন আর কিছুই লাগে না। এরপরের দিন ছিল ঈদ (মুসলিমদের উৎসব), আমি সালাত আদায় করা শুরু করলাম। পুরোপুরি পর্দা করলাম, জিলবাব, নিকাব পরলাম—যেন হঠাৎ করে ডুব দিলাম। আমার মনে হচ্ছিল নষ্ট করার জন্য একটুও সময় নেই। আমার বিশ্বাস আর প্রত্যয় ছিল দৃঢ়, আকাশের সমান উঁচু। এবং আমি খুশি, আমি খুশি এজন্য যে আমি যদি পুরোপুরি সেরকম থাকতে না-ও পারি, অন্তত এটুকু জানব জীবনে একবার হলেও আমি আকাশসম দৃঢ়তা ধারণ করতে পেরেছিলাম। এটা আমার ভাগ্যে ছিল এবং আমি এজন্য আনন্দিত।"

পশ্চিমা নারীদের ইসলাম গ্রহণের গল্পগুলো মজবুত, কারণ তারা অনেক মানুষের ধারণার বিপরীতে হাঁটে। পশ্চিমা জীবনধারা এবং বিশ্বাস ইসলাম বা অন্য কোনো বিশ্বাস থেকে বহু বহু দূরে। তারা অবাক হয় কী এমন জিনিস, যার জন্য এই পশ্চিমা নারীরা নিজেদের জীবনের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কিছু বাধ্যবাধকতা আর নিয়মের মধ্যে ঢুকে যায়। আমি বিশ্বাস করি এই গল্পগুলো আমাদেরই। এগুলো আমাদের ইতিহাসের অংশ; পশ্চিমে বাস করা একজন মুসলিম হিসেবে, নারী হিসেবে, মানুষ হিসেবে এই গল্পগুলো প্রত্যেকের।

আমার সংগ্রহ করা গল্পগুলোর কিছু আমি পড়েছি; পড়ার সময় এগুলোকে মুল্যবান মনে হয়েছে বারবার, কারণ এই গল্পগুলো বিশ্বব্যাপী ইসলামের আবেদনের গল্প। বৈচিত্র্যে ভরা নানান পরিবেশের, নানান অভিজ্ঞতার এই বোনদের গল্প দেখায়— ইসলাম যেকোনো জায়গায়, যেকোনো মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এই নারীদের কাউকেই নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা যায় না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব কথা আছে। তাদের কেউ ছিল গোঁড়া নারীবাদী, আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী, কেউ ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী, কেউ গানপাগল, রকস্টার, কেউ ডিসকোকন্যা, কেউ নিমগ্ন হয়ে চার্চে যাওয়া মেয়ে, ডিজাইনার, খেলোয়াড়, মডেল, গায়িকা, চাকরিজীবী, মাস্টার্সে পড়ুয়া, প্রথাগত মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, নাস্তিক—সব রকমের পরিবেশ থেকে বিভিন্ন বয়সের মানুষ।

এবং সবচেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে, ইসলাম তাদের প্রত্যেকের কাছেই পৌঁছুতে পেরেছে, তাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছে, প্রত্যেকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করে কথা বলেছে; তারা যেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল—সে উত্তরগুলো তাদের দিয়েছে এবং আজীবনের জন্য জীবন বদলে দিয়েছে।

❀

একজন নওমুসলিম—আনন্দগুলো

দেখা, শোনা, ভাবা—সব মিলিয়ে আমার ইসলামগ্রহণের ব্যাপারটা খুব অনুভূতিপ্রবণ ছিল। মুসলিম হওয়ার পুরো ব্যাপারটিকেই আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। প্রথম সূর্যরশ্মির সাথে সালাত আদায় করা, সূর্যাস্তের সাথে খাবারের প্রথম লোকমা, সালাতের দিকে ডাকার সুমধুর সুর, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দেওয়া—সবকিছুই আমার ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল। এই বইয়ে আপনি আরো যেসব নারীদের ব্যাপারে জানবেন, তারা প্রত্যেকেই মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ইসলাম নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করেছে। কিন্তু আমি তা করিনি। এখন আমি যা জানি, তার অধিকাংশই আমার মুসলিম হওয়ার পর জানা। আর এই জানার পথটি ছিল সত্যিকারের জ্ঞানান্বেষণের পথ।

নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, ধনী-গরীব—সবাইকে এক করার যে শক্তিশালী বিশ্বাস ইসলাম ধারণ করে—এটিই বিভিন্ন পথের নারীদের একত্রিত করেছে। কেউ খুঁজছিল, কেউ খুঁজছিল না, কিন্তু দিনশেষে একটি অপরিহার্য ব্যাপার ছিল—একটি অনস্বীকার্য সত্য ছিল। সেটি কেউ এড়াতে পারেনি, আত্মসমর্পণ করেছে আল্লাহর কাছে।

এটা হচ্ছে ইসলামি ধর্মবিশ্বাস, যা বোঝা খুব জরুরি। আশা করছি নিচের কিছু কথা সেটি বুঝতে সাহায্য করবে।

ইসলাম—মৌলিক ব্যাপারগুলো

মুসলিমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং তারই ইবাদাত করে। আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা—মূসা, ইবরাহিম, ঈসা এবং অন্য সব নবির সৃষ্টিকর্তা তিনি। কুরআনে সৃষ্টিকর্তার নাম 'আল্লাহ' বলা হয়েছে। ১৪০০ বছর আগে নবি মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি এই বই পাঠানো হয় যেখানে মানুষকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করার কথা বলা হয়েছে। এটিই হচ্ছে ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি, তাওহিদ, খাঁটি, বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ।

ইসলামি জীবনযাপন শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাতকে ঘিরেই আবর্তিত হয়, আর কাউকে না। এখানে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই, কোনো শক্তিধর পাদ্রী নেই, কোনো ধর্মযাজক নেই, সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে চাওয়ার ব্যাপার নেই, সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো দেবতা নেই, আলোচনার জন্য কোনো পূর্বপুরুষ নেই। প্রতিটি ইবাদাত পরস্পরের

সাথে সম্পর্কযুক্ত আর এই সবই একমাত্র প্রভু আল্লাহর জন্য। ইবাদাত শুধুমাত্র সালাত আদায়, রোজা রাখা, দান-সদকা করা এবং কুরআন পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত—দৈনন্দিন কাজ যেমন খাওয়া, পান করা, ঘুমানো; ব্যক্তিগত আচরণ, বেড়ে ওঠা, বিনোদন, শারীরিক সম্পর্ক; হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার যেমন ভালোবাসা, নির্ভরতা, ভয়, ভক্তি এসবের নির্দেশনাও দেয় ইসলাম।

ইসলামি একত্ববাদের গভীরতা এবং ব্যাপকতা আমাকে মুগ্ধ করে। এরকম অনন্যভাবে এক সৃষ্টিকর্তার উপাসনার কথা অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসে ভাবাই যায় না। আমার কাছে সবচেয়ে মানানসই লাগে এটি যে—আমি যদি পরীক্ষায় পাশ করতে চাই, একটা চাকরি পেতে চাই, একজন স্বামী পেতে চাই—সবকিছুর জন্য অনেকজনের কাছে ধর্না দিয়ে সময় নষ্ট না করে আমি একজনের কাছেই চাইব।

সীমাবদ্ধ, বস্তুবাদী এই দুনিয়ায় ইসলাম এমন এক জীবনের দিকে আহ্বান করে, যেটি ঐশ্বরিক, অনন্ত। কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির কারণ বলে দিয়েছেন-

> "আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সূরাহ আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

হয়রান হয়ে খুঁজতে থাকা প্রশ্নের উত্তর আমি এখানেই পেয়েছি—এই জীবনের উদ্দেশ্য কী? আমি যে ধারণা করতাম, বস্তুবাদী প্রতিযোগিতায় ইঁদুরের দৌড়ের বাইরে জীবনের কিছু একটা আছে—এই আয়াতে আমি সেটির নিশ্চয়তাই পেয়েছি। এর মানে ছিল আমি সারাজীবনই পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, সমাজ কী বলে, তা নিয়ে কাটিয়ে দেব না। এর মানে ছিল, প্রতিটি দিনেরই একটি অর্থ আছে, প্রতিটি দিনই সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ। প্রতিটি হাসি, প্রতিটি দান, প্রতিটি ভালো কাজ জমা হচ্ছে, আমার রবের ইবাদাত হিসেবে—এটিই আমাকে তৈরী করার পেছনের উদ্দেশ্য।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরব উপদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি থাকতেন মক্কায়, আরবের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধ শহরে। মক্কা কা'বারও শহর, ইবরাহিম (আ.) এক আল্লাহর ইবাদাতের জন্য এটি তৈরী করেছিলেন। ঐ সময়ে আরবরা অনেক মূর্তির পুজা করত, কা'বায় তখন অনেক মূর্তি। মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য মানুষের কাছে আল-আমিন নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে একজন নবি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল যাতে তিনি মানুষকে আবার সেই এক আল্লাহর আরাধনার দিকে আহ্বান করেন। এই আহ্বানের কাজটি তিনি তাঁর শহর মক্কা থেকেই শুরু করেন। মুহাম্মাদের পরিবারের অনেকেই এবং বাইরের কয়েকজন তাঁর এই ধর্মমত স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে নেয়; কিন্তু মক্কার অধিকাংশ লোকই তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে প্রভাবশালী লোকেরা তাঁদের পূর্বপুরুষের মূর্তিপূজার এই নিন্দা একদম মানেনি। শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের মক্কা থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা প্রথমে আবিসিনিয়ায় যায়, সেখানকার খ্রিস্টান রাজা নাজাশীর কাছে আশ্রয় চায় এবং

তার পর যায় ইয়াসরিব নামক একটি শহরে। এই শহরেই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে—আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাত, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে কুরআনে দিকনির্দেশনা আসে।

'দ্য মেসেজ' ফিল্মটিও আমার উপরে গভীর প্রভাব ফেলে। এখানে তাঁকে না দেখিয়েই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) সময়কার বর্ণনা ও ঘটনার মধ্যে যে চরিত্রগুলোর কথা এসেছে, এই ফিল্মটির মাধ্যমে আমি যেন তাঁদের খুব কাছ থেকে বুঝতে পারছিলাম। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার কাছে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে মূর্ত হচ্ছিল; তাঁরা যখন যন্ত্রনা ভোগ করছিল, আমি তাঁদের জন্য কেঁদেছিলাম। পূর্বপুরুষের মূর্তিপূজা ত্যাগ করার জন্য প্রথমদিককার মুসলিমরা অনেক নির্যাতন সহ্য করেছিল। তাঁদের সহিষ্ণুতা আমাকে আর আমার বন্ধুকে মানসিক জোর দেয়। নতুন ধর্মবিশ্বাসের কারণে আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলাম, সেগুলো মোকাবেলায় দৃঢ় হতে পারি।

আমি একদম প্রথমে যেসব বিষয়ে জেনেছিলাম, ইসলামের পাঁচটি খুঁটির কথা তার মধ্যে একটি। স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষায় বেশিরভাগ বাচ্চাও প্রথমদিকে এটিই শেখে। এগুলো হলো—শাহাদাহ (বিশ্বাসের সাক্ষ্য), সালাত, যাকাত (নিজের সম্পদ থেকে বাধ্যতামূলক দেয় কিছু অংশ), সাওম (রামাদান মাসে রোজা রাখা) এবং হজ্ব (মক্কায় তীর্থযাত্রা)।

মুসলিম বিশ্বাস, ঈমানও ছয়টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আছে—আল্লাহতে বিশ্বাস করা, তাঁর ফেরেশতাগণে বিশ্বাস করা, তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস করা (তাওরাত, বাইবেল, ইঞ্জিল এবং কুরআনে বর্ণিত সব নবিদের উপর), তাঁর কিতাবগুলোয় বিশ্বাস করা (পূর্বোল্লিখিত বইগুলোর সত্যিকার রূপ), শেষদিবসে (পুনরুত্থানের দিন) বিশ্বাস করা এবং ক্বদরে (ভালো এবং খারাপ ভাগ্য) বিশ্বাস করা।

আমি আর আমার বন্ধুরা ইসলামিক লেকচার শুনতে যেতাম, ইসলামি পাঠচক্রে যেতাম, বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম। দিনদিন বুঝতে পারছিলাম আমাদের গ্রহণ করে নেওয়া দ্বীন কত বিশাল! যদিও এই বিশ্বাসগুলো খুব সাধারণ, আমাদের কাছে ইসলামের ভেতর-বাহির এক বিশাল জ্ঞানের সমুদ্র হয়ে দেখা দিল। আমরা সোজা সেই সাগরে ডুব দিলাম।

"শুরুর দিনগুলোর একটি ভীষণ ভালো ব্যাপার ছিল যে আমরা যা শিখছি, যা জানছি, তা বুঝে বুঝে মানতে পারছিলাম। আমাদের খ্রিস্টান পরিবার থেকে সবসময়ই বলা হয়েছে, এটা করো, ওটা করো। কিন্তু সেগুলোর কোনো মানে আমরা খুঁজে পাইনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলামের মানে আমি খুঁজে পেয়েছি। এটা শুধু একটি ধর্মই না, এটা জীবনে চলার একটি দিকনির্দেশনাও।

—আলিয়াহ

একজন নওমুসলিম

একজন নওমুসলিমের কাছে কিছু স্মৃতি থাকে, যেগুলো তার খুব প্রিয়—শাহাদাহ পড়া, সাক্ষ্য দেওয়া, তাওহিদ (ইসলামিক একত্ববাদ) নিয়ে পড়াশুনা করা, সালাত আদায়ের স্বাদ পাওয়া, রোজা রাখার অভিজ্ঞত, নতুন পোশাক হিজাবে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া, একটি নতুন সমাজের সাথে মিশে যাওয়া, জীবনের নতুন মোড় সবই। প্রতিদিন ইসলামকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া ছিল রোমাঞ্চকর। আমাদের কথা, কাজে যেন সবসময়ই প্রকাশ পাচ্ছিল—এই যে, আমরা মুসলিম, আমাদের কাছে সেরা বিশ্বাসটি আছে—দ্বীন, এবং আমরা দুনিয়াতে সবার চেয়ে উপরে!

দিনগুলো ছিল সুখে, আনন্দে, জয়োল্লাসে ভরা।

শাহাদাহ

আমাদের ইসলামি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ অংশ ছিল এই শাহাদাহ এবং এখনো তা-ই আছে। কিছু শব্দ, ১৪০০ বছর আগে থেকে মুসলিমরা যা উচ্চারণ করে আসছে এবং যা ইসলামে আমাদের পূর্ণ আত্মসমর্পণের নিশ্চয়তা দেয়।

শাহাদাহকে কালিমাও বলা হয়, এটি ইসলামের প্রথম খুঁটি। এই হলো শাহাদাহ—

আশ-হাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আনা মুহাম্মাদ আর-রাসূলুল্লাহ।

এই বাক্যে দুটি অংশ আছে, একটি নেতিবাচক, আরেকটি ইতিবাচক। 'লা ইলাহা' (ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই) বলার দ্বারা একজন মুসলিম অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা বা অন্য কিছু যেমন পাথর, গাছ, মূর্তি অথবা সাধু-সন্ন্যাসী না থাকার ঘোষণা দেয়। 'ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া) দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহকেই ইবাদাতের যোগ্য বলে মেনে নেওয়া হয়।

আমি যেহেতু জন্ম থেকেই মুসলিম, তাই ভাবিনি যে আমাকেও আলাদা করে শাহাদাহ পড়তে হবে। আমার অজ্ঞসময় আর জানার সময়গুলোয় পার্থক্য করতে—

> *"কিছু ব্যাপারে আমার মনে হয়, আহা যদি আমিও আলাদা করে শাহাদাহ দিয়ে শুরু করতে পারতাম! কিন্তু সেটা না করলেও আমি একটা লম্বা সময় পার করেছি এই নিয়ে ভেবে ভেবে। কারণ সঠিক ভিত্তি ছাড়া সামনে এগুনো সত্যিই কঠিন।"*
>
> *—সারা*

শাহাদাহর সাথে কিছু শর্ত আছে, যা মেনে চললেই ব্যাপারটা যৌক্তিক হয়। এর প্রথমটি হলো, জ্ঞান—আল-ইলম। পরেরটি হলো একনিষ্ঠতা—আল-ইখলাস। তৃতীয়টি হলো, সত্যিবাদিতা—আস-সিদক্ব। চতুর্থটি নিশ্চিত বিশ্বাস—আল-ইয়াক্বিন। পঞ্চম হলো, ভালোবাসা—আল-মাহাব্বাহ। ষষ্ঠ আত্মসমর্পণ—আল-ইনক্বিয়াদ। সপ্তম হলো , মেনে নেওয়া—আল-কবুল।

শাহাদাহ এর সাথে জড়িত এই ব্যাপারগুলোর সাথে মিশে থাকা অনুভূতি-আবেগকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এটি উচ্চারণ করে আপনি মুহাম্মাদ (সা.) এর উম্মাহর অংশ হয়ে যান, ইসলামের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসেন। এখন আপনি একটি জনগোষ্ঠীর অংশ। না, কোনো নির্দিষ্ট দেশসীমায় জন্মানোর জন্য না, আপনি এই জনগোষ্ঠীর অংশ কারণ আপনি আর তারা সবাই একই বিশ্বাস ধারণ করেন।

এই শাহাদাহর সাথে অনেকের অনেক ধরনের অনুভূতি জড়িয়ে থাকে—উত্তেজনা, মুক্তি, অপেক্ষা, আনন্দ।

> *"শাহাদাহ পড়ার পর বলা হয়, আপনি এখন একটা নবজাতকের মতো, আপনার কোনো পাপ নেই। তখন নিজেকে ভিন্ন কেউ মনে হয়। মনে হয় আমাকে দেখতেও বুঝি অন্যরকম দেখাচ্ছে।"*
>
> *—উম্মে সাফওয়ান*

শাহাদাহ পড়া কারো জন্য খুব আবেগঘন একটি মুহূর্ত, আবার কেউ হয়তো দ্বীনের ব্যাপারে আরো সামনে এগুনোর আগে, আরো বুঝদার হওয়ার আগে শাহাদাহ পড়ার সময় এর ব্যাপকতা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। আমি মনে করি মুসলিম হওয়ার প্রথম বছরে আমি নিজেও সেটি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি; সাতটি শর্ত ঠিকঠাক পূরণ করতে পারিইনি, যখন প্রথমবার উচ্চারণ করেছিলাম। কিন্তু, পড়তে পড়তে, প্রশ্ন করতে করতে এই শব্দগুলোর গভীরতা বুঝতে শুরু করি, বুঝতে শুরু করি আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরা কেমন করে প্রভাব ফেলে। আমার আশপাশের বন্ধুবান্ধব আমার কাছে কী চায় আর আমার আল্লাহ্ কী চান, এই নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরী হলেই সেটি মিটে যেত। আমি ভাবতাম, ওরা কী বলছে সেটি দিয়ে আমি কেন আমার কাজ বিচার করব, যখন আমি জানি আমি শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি? ওদের কাছে গ্রহণীয় হওয়াটা কি আমার কাছে আল্লাহর খুশির চেয়ে বেশি জরুরি? আমি যেহেতু এই শাহাদাহকে জীবনের সব ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা শুরু করেছিলাম, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার জানা ছিল।

শাহাদাহ বা কালিমার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদ আর-রাসূলুল্লাহ' এর মানে হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) কে আল্লাহর নবি এবং রাসূল হিসেবে মেনে নেয়, তাঁকে অনুসরণ করে এবং তাঁর কথা মেনে চলে। একজন মুসলিমের উচিত অন্য কোনো মানুষের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালোবাসা। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর চরিত্র, আচরণ সম্পর্কে জানার আগে এই ব্যাপারটি আমি ঠিক অনুভব করতে পারছিলাম না। যখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানি, আমার ধারণা তখন থেকে আমার মন তাঁর ব্যাপারে গলে যেতে শুরু করে—মুহাম্মাদ, একজন ঘরোয়া মানুষ। ১৯৯৯ এ বিয়ে করার আগে আমি একটি রেকর্ড শুনেছিলাম, যেখানে বলা হচ্ছিল তিনি তাঁর পরিবারের মানুষদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন। শুনে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম— দরদভরা বিনয়, দয়া, আপন করে নেওয়া, রসিকতা, ভদ্রতা এসব জেনে ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর

সামান্য ছিটেফোঁটাওয়ালা কাউকে যদি বিয়ে করতে পারতাম! আমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছে যে বিষয়টি, তিনি একজন গতানুগতিক সাধারণ মুসলিম পুরুষের চেয়ে কতটা ভিন্নরকম! যেন ভিন্ন মেরুতে বাস করা কেউ, এই ব্যাপারটি ভেবে আমি শান্তি পেয়েছি। আমি জানি, একদিন আমি আমার ছেলেকে শেখাব কীভাবে আমাদের রাসূল (সা.) এর মতো হতে হয়, কীভাবে ঘরের ভেতর আচরণ করতে হয়, যাতে সে একজন সত্যিকারের মুসলিম পুরুষ হতে পারে। এবং এসব শিখিয়ে গর্ববোধ করব।

কুরআনকে আবিষ্কার করা

কুরআনের পর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহিহ আল বুখারি'তে বলা হয়েছে, নবি মুহাম্মাদ (সা.) এর বয়স যখন চল্লিশ, তখন থেকে তিনি স্বপ্নের মধ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা পেতে শুরু করেন, যা পরে সত্যি হতো। সেই সময়েই, তিনি একা থাকতে পছন্দ করা শুরু করেন, প্রায়ই দিনের পর দিন ধরে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য হেরা গুহায় চলে যেতেন।

একদিন তিনি যখন গুহায় একা, ফেরেশতা জিবরিল (আ.) তাঁর কাছে আসেন। এই একই ফেরেশতাকে আল্লাহ মূসা (আ.) ও মারিয়াম (আ.) এর কাছেও পাঠিয়েছিলেন।

তিনি এসে বললেন, 'পড়ুন'।

মুহাম্মাদ (সা.) জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বেদুইনদের মাঝে, তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না।

উত্তর বললেন, 'আমি তো জানি না কীভাবে পড়তে হয়'।

এরপর ফেরেশতা তাঁকে অনেক জোরে চেপে ধরেন যে তিনি তা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পর ফেরেশতা আবার তাঁকে বললেন, 'পড়ুন'।

তিনি আবারও বললেন, 'আমি জানি না কীভাবে পড়তে হয়'।

ফেরেশতা তাঁকে আবারো চেপে ধরে।

তৃতীয়বার পড়তে বলার পর মুহাম্মাদ (সা.) জিজ্ঞেস করেন, 'কী পড়ব?'

শেষবারের মতো জিবরিল (আ.) তাঁকে চেপে ধরেন, তখন তিনি পড়েন,

পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।
পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু।

ফেরেশতা চলে গেলেন, রাসূল (সা.) এর কাছে রেখে গেলেন কুরআনের প্রথম আয়াতগুলো। ইসলামের দাওয়াত শুরু হলো।

মুসলিম হওয়ার আগে আমি যখন প্রথমবার কুরআন পড়ি, আমি আসলে এর কিছুই বুঝিনি। আগে যেহেতু খ্রিস্টানও ছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না বাইবেলের সাথে এর পার্থক্য কোথায়। বরং কুরআনের কথার প্রতি একটা দাম্ভিকতা নিয়ে পড়ছিলাম। এর কিছু অংশ প্রথম প্রথম গুরুত্বই দেইনি, ভেবেছি বাইবেলের মতো এটিও কোনো মানুষের লেখা আর সময়, সমাজের প্রয়োজনে একেও মনমতো বদলে ফেলা হয়েছে।

যখন কুরআনের পবিত্র ঐশ্বরিক উৎসের ব্যাপারে জানি, তখন থেকে আমার ইসলাম মজবুত হতে শুরু করে। এর আগ পর্যন্ত আমি কিছু মানতাম, কিছু মানতাম না। আমার নিজের মতটাই বেশি প্রাধান্য পেত। ইসলামের ব্যাপারে সামান্যতম জানা ব্যক্তিও বুঝবে, এরকম করাটা কোনো কাজের কথা নয়।

কিন্তু যতই আমি কুরআন নিয়ে জানছিলাম, ততই মুগ্ধ, প্রভাবিত হচ্ছিলাম। আরো বেশি জানার চেষ্টা করছিলাম। জিবরিল (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) এর কাছে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, মূর্তিপূজক আরবরা তাতে বিস্মিত হয়। সে সময়কার মানুষের মনে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আলাদা ভালোবাসা ছিল, আর কুরআন ছিল তারই এক বিস্ময়কর উদাহরণ। কিন্তু নবি (সা.) তো জন্মেছিলেন মরুভূমিতে, বড় হয়েছেন সেখানে; লিখতে বা পড়তে জানেন না। পড়াশুনা না জানা এই ব্যক্তিটি কেমন করে এরকম অসাধারণ কিছু রচনা করবেন? তখনকার সময়ের কোনো শিক্ষক বা পন্ডিত ব্যক্তির কাছে পড়াশুনাও করেননি তিনি। ইহুদি আর খ্রিস্টানদের ঘটনাই বা কীভাবে জানবেন তিনি? বিজ্ঞান নিয়েও তাঁর পড়াশুনা ছিল না। ভ্রূণবিদ্যা কিংবা ভূগোলের বিস্তারিত তিনি কীভাবে জানবেন? অথবা মহাকাশের তথ্য? তাঁর কাছে কোনো ক্রিস্টাল বল ছিল না—তিনি অতীত কেমন করে বলবেন আর ভবিষ্যতের কথাও বা কীভাবে বলে দেবেন? গোত্রের মানুষেরা যে তাঁকে পাগল বলত, তিনি কি আসলেও তা-ই ছিলেন? কিন্তু আল্লাহ যখন সমস্ত মানবজাতিকে কুরআনের মতো কিছু একটা রচনা করতে বলেন, এখানেই প্রমাণিত হয় যে কুরআন শুধু এবং শুধুমাত্র তাঁরই পক্ষ থেকে এসেছে। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল কুরআনের মতো কিছু রচনা করা, পরবর্তীতে বললেন দশটি আয়াত রচনা করা আর সবশেষে বলা হলো কুরআনের মতো অন্তত একটি আয়াত রচনা করে দেখাতে। কেউই পারেনি।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কুরআনের বাণী সংরক্ষিত হয়ে আসছে মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে, অর্থাৎ অনেক মানুষের কাছ থেকে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, এতে করে এই বাণীতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত আসে যে আল্লাহ নিজেই তাঁর বাণীকে কোনো ধরনের বিকৃতি বা জালিয়াতি থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন-

> "সে যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা।" (সূরাহ ৬৯:৪৪-৪৬)

ফেরেশতা জিবরিল (আ.) রাসূল (সা.) এর কাছে প্রায় তেইশ বছর ধরে এই বাণী নিয়ে এসেছেন। কোনো আয়াত নাযিলের পর মুহাম্মাদ (সা.) তা তাঁর সাথীদের পড়ে শুনাতেন, শেখাতেন; তাঁরা তা মুখস্থ করে ফেলতেন, অন্যদের শেখাতেন আর লিখে রাখতেন। প্রথমদিকে লেখা হতো কাপড়, পাতা বা হাতের কাছে সহজে যা পাওয়া যেত তার উপরই। জীবনের শেষদিকে রাসূল (সা.) পুরো রামাদান মাস কাটাতেন জিবরিল (আ.) সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে। তাঁর বিশ্বস্ত সাথীদের একজন, যায়েদ বিন সাবিত সাথে থাকতেন এবং তিনিও মাঝে মাঝে তিলাওয়াত করতেন। হিজরত অর্থাৎ মদিনায় অভিবাসনের ২৪-২৫ বছর পর খলিফা উসমান (রা.) যখন পুরো কুরআনকে একত্রিত করতে চাইলেন, তখন যায়েদ বিন সাবিতই প্রত্যেকটা আয়াত যাচাই করেন, ধারাবাহিকতাও।

কুরআন যে এখন পর্যন্ত অবিকৃত আছে, এসব কারণেই। তুরস্কের এক জাদুঘরে কুরআনের যেই প্রাচীন কপিটি আছে, আজকের দিনে আপনি কোনো বইয়ের দোকান থেকে কুরআনের কোনো কপি কিনলে ঠিক তেমনটিই পাবেন।

আমাদের মতো নওমুসলিমদের জন্য এটা ছিল ভীষণ গর্বের ব্যাপার যে এখন পর্যন্ত কুরআন অপরিবর্তিত এবং অবিকৃত। আমরা যেসব বিকৃতি দেখে বড় হয়েছি, তেমন না। এটি আমাদের আশ্বস্ত করত, বিশ্বাসকে দৃঢ়ও করত।

আমরা অনেকেই কুরআনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন নতুন মুসলিম হওয়ার আনন্দ সম্পর্কে ক্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম আর জানতে চাইলাম দ্বীনের কোন ব্যাপারগুলো তার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে, সে নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিল, "কুরআন"। আমার পড়া সবচেয়ে চমৎকার জিনিস এটি। আমি অনেক শেক্সপিয়ের পড়েছি, সাহিত্য, কবিতাও, কিন্তু যখন কুরআন পড়লাম, এটা ছিল একদম ভিন্নকিছু।

কুরআন তার বাণী, শব্দ, অর্থ আর তিলাওয়াতের সুর দিয়ে লাখ লাখ হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে। মুসলিমদের কাছে কুরআনের তিলাওয়াত সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামের শুরু থেকে, দুনিয়ার নানা প্রান্তে। কোনো কালি বা কাগজ যদি না-ও থাকে, তা-ও কুরআন বিশ্বাসীদের অন্তরে থেকে যাবে। এটাই পৃথিবীর একমাত্র বই যা হাজারো মানুষ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করে রেখেছে। ঐ সময়ে শুরুর ছোট্টো একটা আয়াত মুখস্থ করাও আমার কাছে ছিল বিশাল আনন্দের ব্যাপার।

গিনিতে থাকাকালীন সময়ে আমি তিনটি আয়াত মুখস্থ করেছিলাম। আসার পর আরও কিছু আয়াত মুখস্থ করার আগ্রহ ছিল। সব নওমুসলিমদের মতো আমিও কুরআনের শেষ থেকে শুরু করেছিলাম, একদম শেষ পারা, ত্রিশতম পারার ছোট ছোট আয়াত দিয়ে। আমার সেইদিনগুলোর কথা মনে পড়ে, ছোট সবুজ বইটা থেকে একটা একটা করে আয়াত পড়তাম, একেকটা শব্দ বারবার করে আওড়াতাম যাতে মুখস্ত হয় আর আমি সালাতে পড়তে পারি। অন্যেরা যখন ওয়াকম্যানে কান লাগিয়ে রাখত কিংবা বেস্টসেলিং উপন্যাসে মনোযোগী, আমি তখন তিলাওয়াতে মগ্ন, কুরআনের ছন্দে

আমার হৃদয় খুঁজে পাচ্ছে এক গভীর প্রশান্তি। একদিন আমি লন্ডনের সবচেয়ে বড় ইসলামিক বইয়ের দোকানগুলোর একটিতে বই, রেকর্ড ও অন্যান্য ইসলামিক জিনিসপত্র দেখছিলাম। জায়নামাজ, মিসওয়াক, আতর পছন্দ করতে করতে বাজতে থাকা রেকর্ড থেকে কিছু কথা কানে এসে লাগল। নবি (সা.) এর জীবন নিয়ে ছিল রেকর্ডটা। রাসূল (সা.) এর জীবনের শেষ বক্তৃতার কথাগুলো আমার ভেতরটাকে নাড়া দিয়ে গেল—মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, নারী নিরাপত্তা ও অধিকার, জাতিগত সমতা, আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকা—এসব ব্যাপার সারাটা দিন আমার মাথায় চলল। চোখ বেয়ে পানি পড়ছিল, আমি দৌড়ে গেলাম ঐ রেকর্ডটা কেনার জন্য টাকা আনতে। বুঝতে পারলাম, এটাই বিশ্বাসের সৌন্দর্য আর আমি এখন তা অনুভব করছি। ভাবলাম, যদি আমরা এই কথাগুলোকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারতাম, তাহলে সবকিছু কতোই না সুন্দর হতো! ইসলামের কার্যকরীতা বুঝতে পারার সেই অনুভুতি আমাকে দির্ঘ সময় ঘিরে রাখল।

রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ

নবি (সা.) এর কথা, কাজ ও সম্মতির ব্যাপারগুলোকে বলা হয় সুন্নাহ। এসব নিয়মনীতি মুসলিমদের মানতে হয়। হাদিসের মাধ্যমে আমরা এগুলো সম্বন্ধে জানতে পারি।

দ্বীনের ব্যাপারে আমার ভালোবাসা অনেকখানি বেড়ে যায় হাদিসের পেছনে থাকা বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানা শুরু করে। এক গ্রীষ্মে মসজিদে সাত দিনের একটি সেমিনার হলো, সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইসলামি জ্ঞানে বিজ্ঞ খুব ভালো কয়েকজন ছাত্র আসে। দুনিয়ার নানা ভেজাল থেকে মুক্ত হয়ে আমরা ক'দিন সেখানে ইসলাম নিয়ে অনেককিছু জানলাম। এর মধ্যে একটি বিষয় ছিল হাদিসের বিজ্ঞান। আর তারা খুব ভালোভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

সেখান থেকেই জানতে পারলাম, হাদিসগুলো রাসূল (সা.) এর সাথীরা মনে রাখতেন আর তাঁরাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার ব্যাপারটি ধারাবাহিক, কার পর কে বর্ণনা করেছেন তা নামকরণ করা আছে এবং প্রত্যেকেই পরিচিত। যেমন- একজন হাদিস বর্ণনাকারী এভাবে বলবেন যে, আমি অমুকের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি তমুকের কাছ থেকে, তিনি আবু বকর (রা.) এর কাছ থেকে এবং তিনি রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে শুনেছেন। নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নে হাদিসকে কয়েকটি স্তরে ফেলা হয়- নির্ভরযোগ্য (সহিহ), মোটামুটি (হাসান), দুর্বল (যঈফ) হাদিস অথবা জাল হাদিস (মাওদু)। শুদ্ধি পরীক্ষার এই ব্যাপারটিতে আমি প্রথমে বেশ মুগ্ধ হই। বোঝাতে পারবনা প্রথম এই সম্বন্ধে জেনে আমি কতটা নিশ্চিন্ত আর রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল এই ব্যাপারে একটি কবিতা লিখে ফেলি। জানলাম, হাদিস বর্ণনাকারীর নামের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ ইসনাদে যদি একজনের নামও জানা না থাকে তাহলে সেটি আর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। হাদিস

সহিহ না হওয়ার আরও কিছু কারণ আছে—ইসনাদে অবিশ্বস্ত ব্যক্তির নাম থাকা, বর্ণনাকারীর নামের সাথে সময় এবং স্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া, রাসূল (সা.) এর বাণীতে এমন কোনো শব্দ থাকা যা তাঁর বৈশিষ্ট্যের সাথে যায় না অথবা দ্বীনের সাথে যায় না। অর্থাৎ, সন্দেহের সৃষ্টি করে এমন কিছু যদি থাকে, তাহলে সেই হাদিসটি আর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না, বরং সেটি দুর্বল বা জাল শ্রেনীতে পড়ে যায়, বিশেষ করে হাদিস বর্ণনাকারীর কেউ একজন যদি নিজের জীবনে মিথ্যেবাদী বলে পরিচিত হয়ে থাকে।

অতীতে, বর্তমানের হাদিস গবেষকদের হাদিস সংরক্ষণের এই কঠোর নিয়ম আমাকে মুগ্ধ করে। যারা এ ব্যাপারে জানে না, তাদের কাছে হয়তো এই নিয়ম অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু এটিই ইসলামি জ্ঞানের গভীরতা, আর আমরা যা দেখেছিলাম তাতে প্রভাবিত ছিলাম। ইসলামি পড়াশুনার এই পদ্ধতি আমাদের আত্মবিশ্বাস আর বিশ্বাসের দৃঢ়তা অনেক বাড়িয়ে দেয়।

আমার কাছে ইসলামের সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায় কারণ ইসনাদের এই ব্যাপারটায় আমি বেশ সতর্ক ছিলাম। মুসলিমদের জন্য এটা অনন্য। এ-ও বুঝতে পারি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আমরা যেসব সহিহ হাদিস পেয়েছি, তা আমাদের খুব গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। আমরা প্রায়ই এসব ব্যাপারে কথা বলতাম।

> *"হাদিস পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগছে, ইসলাম আর সাহাবিদের ব্যাপারে অনেক কিছুই আমি জানতাম না। আর রাসূল (সা.) তাঁর বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সাথে যে ব্যবহার করতেন, তা চমৎকার, হৃদয়স্পর্শী। অনেক ইতিহাস আছে সেখানে।"*
>
> *—ক্লেয়ার।*

ইবাদাতের দিনগুলো

নতুন মুসলিম হওয়ার সেই দিনগুলোয় আমরা বিভিন্নরকম ইবাদাত করতাম। এর মধ্যে একটি ছিল সালাত আদায়—ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। কুরআনে মুসলিমদের প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে-

> "নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (সূরাহ ৪:১০৩)

গিনিতে থাকতেই আমি সালাত আদায় করা শুরু করেছিলাম। ওখানে দিনের কাজকর্ম হতো মুয়াজ্জিনের ডাক অনুসারে। আযান শোনামাত্র ব্যস্ত রাস্তা ধরে মসজিদে চলে যাওয়া। কোনাক্রিতে জায়গায় জায়গায় মসজিদ ছিল, যেকোনো জায়গায় গাড়ি থামিয়ে হিজাব পরে সালাত আদায়ের জন্য যাওয়া যেত।

> *"একবার টাইমস স্কয়ারে দেখি একজন মুসলিম লোক এসব হইচইয়ের মাঝেই দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। দেখার মতো দৃশ্য ছিল, আমাকে ছুঁয়ে যায় সেটি।"*
>
> *— সারা।*

লন্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে সালাতের সময় হলে আমরা স্টুডেন্ট প্রেয়ার রুমে বা ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো সংগঠনের রুমে চলে যেতাম, অথবা কোনো খালি ক্লাসরুম খুঁজে নিতাম। সেখানে কোট গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করে নিতাম। জোহরের সালাত আদায় করাটা কষ্টকর ছিল, বিশেষ করে শীতকালে, তখন জোহরের দুই ঘন্টার মধ্যেই আসর, আর ঐ সময়টায় প্রায়ই কোনো ক্লাস বা টিউটোরিয়াল থাকত। পাঁচবার সালাত আদায়ের সময় মানিয়ে নিতে একটু কষ্টই হতো কিন্তু আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা সময় আমি নিয়মিত সালাত আদায় করা শুরু করলাম, প্রতিদিন যে নতুন সূরাহগুলো শিখছিলাম সেগুলো আগ্রহ নিয়ে সালাতে পড়তাম। শারিফা নামে একটি মেয়েকে চিনতাম, নতুন মুসলিম, দ্বীন সম্পর্কে তখনো তেমন কিছু জানত না। সে একদিন বলল, আমি সত্যিই জানতে চাইতাম কীভাবে আরবিতে সালাত আদায় করতে হয়, আর সালাত আদায়ের জন্য কীভাবে ওযু করতে হয়। এখনো ব্যাপারটা আমার জন্য আনন্দের। আমি যখন সালাত আদায় করি মনে হয় এরকম কখনো করিনি। অনেক প্রশান্তি আসে মনে, যেন মাথা থেকে সব ঝামেলা চলে গিয়েছে।

কারো কারো জন্য সালাতই ছিল প্রথম ব্যাপার যা তাদের হৃদয়ে গাঁথে, ইসলামের দিকে তাদের আরো এগিয়ে নিয়ে যায়।

যেমন একদিন ক্লেয়ার আমাকে তার দুর্দশার গল্প বলল, সে কীভাবে সালাত আদায় শুরু করেছিল আর কেন করেছিল—

> "আমার বোনের সমাবর্তনের অনুষ্ঠানে আমরা ক'জন বন্ধু মিলে একটা নেশার ট্যাবলেট খাই। আমি কাঁপতে শুরু করলাম, ভীষণ গরম লাগছিল। অসুস্থ হয়ে পড়ি, মনে হচ্ছিল মাথাটা ফেটে যাবে, ভেতর থেকে মগজ বেরিয়ে আসবে। আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করছিলাম, বলছিলাম, "প্লিজ এগুলো ঠিক করে দাও, ঠিক করে দাও...... আল্লাহ; আজকের মতো বাঁচিয়ে দিলে আমি আর কখনো এমন করব না। এরপর আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাসায় ফিরে আসি। সারা রাত অসুস্থ ছিলাম। পরদিন ভোরে যখন সূর্য উঠছিল, আমি সারা রুমে খুঁজে মাথা ঢাকার জন্য কিছু একটা বের করে সালাত আদায় করলাম। এরপর থেকে প্রতিদিন শুরু করলাম। হয়তো আমি দেরীতে শুরু করেছি, কিন্তু যখন একবার শুরু করি, তখন আর ছাড়িনি।"

সারার ক্ষেত্রে আবার সালাত আদায় শুরু করতে সময় লেগেছিল—

> "সালাতের সাথে আমি খুব একটা টান অনুভব করতাম না। কারণ আমি জানতাম এটা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু বুঝে উঠার আগেই হঠাৎ সালাতকে ভালোবাসা শুরু করলাম, মনে হতে লাগল সালাতটা আমার দরকার। মনে পড়ে কোথাও ঘুরতে গেলে মুসলিমদের থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তাম, ইসলামি জীবনযাপন থেকেও। কিন্তু সালাত ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতাম। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনের মতো ছিল সালাত, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের একমাত্র উপায়।"

পশ্চিম আফ্রিকার স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় অন্যদের সাথে সিয়াম রাখতে রাখতে ইসলামের জন্য আমার ভালোবাসা তৈরী হয়। লন্ডনে আমার প্রথম সিয়াম ছিল অসাধারণ, যদিও গিনির চেয়ে ভিন্ন। সত্যি বলতে, ঐ সময়ে আমি কোনাক্রিতে আমার দিনগুলোর একটা টান অনুভব করছিলাম। তবে যা-ই হোক, লন্ডনের সিয়ামের একটা ভিন্ন আবেদন আছে—সান্দ্রা, হানা, আমি আর অন্য বন্ধুরা সবাই একসাথে সিয়াম রাখতাম। দিনের বেলা আমাদের ক্লাস, টিউটোরিয়াল থাকত, খুব একটা বুঝতাম না, কিন্তু আসরের সালাতের পর ব্যস্ততা শেষ। আমরা তখন ইফতারের ঘণ্টা আর মিনিট হিসাব করতে থাকতাম। ইফতার হলো সিয়াম ভাঙার জন্য সূর্যাস্তের সময় খাবার খাওয়া। ঐ সময়ে ইফতার হতো বেলা চারটায়। আমরা স্টুডেন্ট প্রেয়ার রুমে চলে যেতাম, ওখানে খেজুর, পানি সরবরাহ করা হতো। আহ! সারাদিনের উপবাসের পর প্রথম মিষ্টি কিছু দিয়ে সিয়াম ভাঙা—স্বর্গীয়। সারাদিনের পিপাসার পর সেই ঠান্ডা পানি—অমৃত!

ঐ সময়ে আমি সিয়ামের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করি—খাবার ও পানি থেকে দূরে থাকার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন, যেখানে আমার সামনেই ক্যাম্পাসের অন্যরা বেকড পটেটো বা টুনা স্যান্ডউইচ খেয়ে বেড়াচ্ছে। এটা আমাকে শিখিয়েছিল যে, সবাই প্রতিদিন খাবার পায় না, এটা আমাকে প্রতিদিনকার খাবারের জন্য কৃতজ্ঞ হতে শিখিয়েছিল, আর শিখিয়েছিল ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করতে। বিনয় শেখানোর এক অসাধারণ উপায়! নিজের চেয়ে কম ভাগ্যবানদের অনুভব করা আর খাবার যে স্রষ্টার এক কৃপা, তা শেখানো! আমি সেগুলো বুঝতে পারতাম। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাত আদায় করতে যাওয়ার সময় অন্যরাও বলত যে তারা একটা প্রশান্তি অনুভব করছে।

> *"আমি এই পুরো ব্যাপারটার সাথেই একাত্ম হতে পারতাম। আমার ধারণা বেশকিছু সময় ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থাকার অনুভূতিটা আমাদের দরকার ছিল যাতে করে যাদের নেই তাদের আমরা অনুভব করতে পারি। আর নিজেদের যে বেশি আছে, তা মূল্যায়ন করতে পারি।"*
>
> *—সারা।*

এরপর আমরা মাগরিবের সালাত আদায় করতে যেতাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় সালাতের মধ্যে এটি একটি কারণ এই সালাতে জোরে তিলাওয়াত করা হতো। ওখানে কিছু মেয়ে ছিল যারা খুব সুন্দর করে তিলাওয়াত করতে পারত, মগ্ন হয়ে যেতাম শুনতে শুনতে। আরেকটা সিয়াম পালন করতে পারার কৃতজ্ঞতায় চোখ ভিজে আসত। সালাতের পর খাওয়া হতো। অনেক ছাত্রীই খাবার নিয়ে চলে আসত। প্রায়ই রীতিমতো একটা ভোজ শেষ করে উঠতাম আমরা। অন্যান্য দিন মেইন রাস্তার ধারে চিকেনের দোকানগুলোয় চলে যেতাম। ঐ রাস্তার ধারে এরকম অনেকগুলো দোকান,

আর একই ফ্র্যাঞ্চাইজির। আমরা গিয়ে এক বাক্স চিকেন ফ্রাই কিনে নিয়ে আসতাম, ক্যাম্পাসে ফিরে খাওয়ার জন্য।

মাঝে মাঝে সবাই মিলে সান্দ্রার ঘরে চলে যেতাম। ও খুব মজা করে রান্না করত, ক্যারিবিয়ান স্টাইলে। কিন্তু সবচেয়ে ভালো ইফতার হতো রাজধানীর মসজিদে, ওখানে বিছিয়ে খাবার দেওয়া হতো। বিভিন্ন মসজিদে ঘুরে ইফতার করার খুব ভালো একটা ব্যাপার ছিল এই যে, বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের সাথে দেখা হতো—পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মরক্কো, আলজেরিয়া, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড। বিভিন্ন দেশের মেয়েদের মুসলিম হওয়ার বিভিন্ন রকম গল্প শুনতে আমি কখনো ক্লান্ত হতাম না, প্রতিটা গল্প শোনার পর আমার বিশ্বাস দশগুণ বেড়ে যেত। একাত্ম হয়ে যাওয়ার জন্য সব মুসলিমের কাছেই রামাদান বিশেষ কিছু, কিন্তু প্রথম রামাদানের অনুভূতিই অন্যরকম।

সারা আমাকে এ ব্যাপারে বলেছিল—

> "রামাদান আমার ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল। অন্ধকার থাকতে থাকতেই ঘুম থেকে উঠে যাওয়া, অন্যরা সবাই যখন ঘুমাচ্ছে, তখন নিয়ম করে জেগে উঠা আর খাবার খাওয়া। তুমি জানো যে সারাটাদিন এক অন্য আমেজে কাটবে, তোমার সাথে বিশ্বের সব মুসলিমেরই এক অনুভূতি, একটা শান্ত সংহতি।"

আরেকটা আনন্দের ব্যাপার ছিল আরবি শেখা। অনেকের জন্য এটাই ছিল প্রথম কোনো ভিনদেশী ভাষা শেখা। যেহেতু কুরআন আরবিতেই এসেছে আর ইসলাম গবেষকরাও আরবিতেই বেশিরভাগ কাজ করেছেন, সেহেতু মুসলিম ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু এই আরবিই। এজন্য অনেক নতুন মুসলিমই আরবি শিখতে আগ্রহী যাতে ইসলামের উপর পড়াশুনাটা তারা মূল ভাষাতেই করতে পারেন, দুর্বোধ্য অনুবাদের উপর যেন নির্ভর করতে না হয়—যেটা মূল লেখার ঘ্রাণ প্রায়ই দিতে পারেনা।

বিশ্বাসের চিহ্ন

হিজাব খুব গুরুত্বপুর্ণ কারণ এর মাধ্যমেই আমরা নিজেদের মুসলিম নারী হিসেবে দেখতে পেয়েছি। কারণ নিজেকে আবৃত করা একটা বিধান আর ইবাদাতও। আমি অসংখ্য মেয়ের সাথে কথা বলেছি যারা নিজেদের দ্বীন, ঈমান, আধ্যাত্মিকতা মাপেন এই হিজাব দিয়ে।

> *"আমার সবসময়ই মনে হতো যে হিজাব পরা মেয়েরা সুন্দর। আমি তাদের সত্যিই সম্মান করতাম আর কবে ওদের মতো হবো ভাবতাম!"*
>
> *—নাদিয়া।*

লন্ডনে এসে শাহাদাহ পড়ার পর পূর্ব লন্ডনের কমিউনিটি কলেজে রিসিপশনিস্ট ও তত্ত্বাবধায়কের কাজ পাই। এই কাজটা আমার জন্য খুবই উপযোগী ছিল কারণ সময় ছিল সন্ধ্যায়, আমার ক্লাস তখন শেষ হয়ে যেত আর এই চাকরিতে মানুষের সাথে

যোগাযোগ বেশি, যেটা আমি খুবই উপভোগ করি। ঐ এলাকায় অনেক জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ থাকায় মানুষজন বেশ উদারমনের, কাজের সময়ে সালাত আদায় করা বা হিজাব পরা নিয়ে সমস্যা হয়নি কখনো। সাথে হাতে কিছু টাকাও আসত। ঐ এলাকার পরিবেশ আমি খুব উপভোগ করতাম। নিউহ্যাম জায়গাটায় নানান ধরনের মানুষ—ইংরেজ, আফ্রিকান, এশিয়ান, ক্যারিবিয়ান আর অন্যান্য অধিবাসীরা মিলে এক অন্যরকম সংমিশ্রণ হতো রাস্তাঘাট, বাজারে। আমার হিজাব পরিবর্তিত হচ্ছিল—রঙ্গিন থেকে ছোটো আকৃতির, সেখান থেকে লম্বা হিজাব, গাউনের মতো আবায়া, তারপর জিলবাব (বেশ বড়সড় একটা কাপড় যাকে বোরকাও বলে), নিকাব। কিন্তু আমার বসেরা এই নিয়ে কিছুই বলেনি, সমর্থন দিয়ে গেছে আমাকে।

হিজাব ছিল আমার পরিচয়ের মতো, একটা নতুন কিছু যা আমরা অনুভব করছি, পরীক্ষা করে দেখছি, নিজের করে নিচ্ছি। ঐ সময় আমি কাপড় নিয়ে বেশ বাছাবাছি করতাম, প্রথমে মোটা, শক্ত কাপড় খুঁজছিলাম, এরপরে হালকা নরম কাপড় দিয়ে হিজাব বানিয়ে নিই, ওটাই সবচেয়ে ভালো ছিল।

গ্রিন স্ট্রিটের দোকানগুলো কাপড়ের জন্য আমার পছন্দের জায়গা হয়ে দাঁড়ায়। ওখানে অনেক রকমের কাপড় পাওয়া যেত আর দামটাও ঠিকঠাক।

আমরা অনেকেই হিজাব পরার পর পুরনো আমাদের সাথে নিজেদের পার্থক্যটা বুঝতে পারতাম। একটা আত্মিক জানাশোনা আর মুসলিম হিসেবে মজবুত পরিচয় এই হিজাব।

> *"আমি যখন হিজাব পরে বাসা থেকে বের হতাম, মনে হতো, আল্লাহর কাছে আমাকে সুন্দর লাগছে। সুন্দর লাগত। নিরাপদ লাগতো। মনে হতো কেউ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে না আর।"*
>
> *—নাদিয়া।*

পথের সঙ্গীসাথীরা

> *"মসজিদে তুমি সবসময়ই কাউকে না কাউকে পাবে যে একটা সূরাহ শিখতে তোমাকে সাহায্য করবে, অথবা একটা দুআ শিখতে। সবাই সবাইকে দ্বীন শিখতে সাহায্য করছে। পরিবেশটা খুবই অনুকূল কারণ সবাই সেই একই পথের যাত্রী।"*
>
> *—উম্মে মুহাম্মাদ।*

শাহাদাহ্ পড়ার পর আমার একটা বন্ধুদল হয়ে গিয়েছিল যারা ছিল হয় নতুন মুসলিম অথবা ফিরে আসা মুসলিম। এদের মধ্যে সান্দ্রা ছিল নতুন মুসলিম আর ওর বন্ধু হানাহ ছিল ফিরে আসা মুসলিম, ও মিশরীয়। আমরা সবাই একসাথে আনন্দ করে এই একই পথে হেঁটেছি। ঐ সময়ে আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই, ক্লাসের সময়গুলো ছাড়া প্রায় সারাটাদিনই আমাদের একসাথে কাটত। প্রায় সন্ধ্যায় আমি আমার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সান্দ্রার ওখানে চলে যেতাম। খুব মনে আছে। আমি বেল

দিতাম, সান্দ্রা জানত ওটা আমিই, সে দরজা খুলে দিত, আমি ঢুকে পড়তাম। লম্বা স্কার্ট, ঢোলা শার্ট আর হিজাব পরা সান্দ্রা দরজার সামনে দাঁড়াত, মুখে চওড়া হাসি, "আসসালামু আলাইকুম, পিচ্চি!"

আমিও ওর মতো করেই দাঁড়িয়ে উত্তর দিতাম, "ওয়া আলাইকুমুস সালাম, বাচ্চা"।

"সব ঠিকঠাক?" ও জিজ্ঞেস করত, উত্তর দিতাম, আলহামদুলিল্লাহ, সব ঠিক।

এরপর আমরা নিজেদের জোনে ঢুকে যেতাম। জোন ছিল আমাদের নিজস্ব জায়গা যেখানে সবচাইতে মজার খাবার খেতাম আর সেই খাবার আমাদের নিজেদের বানাতে হতো, সান্দ্রাই বানাত। খেতে খেতে ডুবে যেতাম গল্পে, ইসলাম নিয়ে আলোচনায়। কথায় কথায় সময় ভুলে যেতাম, মাঝে মাঝে ভোর হয়ে যেত, ফজর পড়ে গোছগাছ করা বিছানায় চলে যেতাম, যেন ভুলেই যাই সকাল দশটায় আমাদের আবার বেরুতে হবে।

ছুটির দিনগুলোয়ও আমরা একসাথেই থাকতাম, লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ইসলামি আলোচনা শুনতাম, রামাদানে একসাথে বিভিন্ন মসজিদে তারাবি পড়তাম। তারাবি হলো রামাদানের রাতে আদায় করা দীর্ঘ সালাত। দ্বীনের দিকে আমরা ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছিল, সাথে শুরু হলো একজন আরেকজনকে হিজাব পরতে উৎসাহিত করা, কোন কাপড়টা দিয়ে আবায়া বানালে হালকা, আরামদায়ক হবে সেই নিয়ে আলোচনা। আমরা সবকিছু নিয়ে কথা বলতাম—আমাদের অতীত, পরিবার, হিজাব, কুরআন, রাসসূল মুহাম্মাদ (সা.), আর যা যা তখন আমাদের মনে আসত। সেই ঘনিষ্ঠতা, একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন করে জন্ম নেওয়ার অনুভূতি ছিল তীব্র। ঐ সময়ে মনে হতো আমাদের জীবন একটা বৃত্ত, দ্বীন হলো সেই বৃত্তের কেন্দ্র আর একে কেন্দ্র করেই বাকী সব ঘুরছে। শুধু যারা এই বৃত্তের ভেতরে আছে তারাই বুঝবে কী হচ্ছে সেখানে।

> *"তোমার মনে হবে তুমি কিছু একটার অংশ, তুমি একটা বিশাল উম্মাহ, মুসলিম জাতির অংশ আর এখানে তোমার নিজস্ব একটা জায়গা আছে। আর তোমরা একসাথে আছো এর চেয়েও বড় কিছুর জন্য, সেটা হলো আল্লাহর আরাধনা। সবাই মিলে এই কাজটাই করছো।"*
>
> *—সাফওয়া*

ক্লেয়ার আর আলিয়াহর মতো কেউ কেউ তাদের জীবনসঙ্গীদের সাথে এই দ্বীনের দিকে এসেছিল আর এটা তাদের সম্পর্ককে এক নতুন গভীরতা দেয়। নতুন মুসলিম হওয়ার পর আলিয়াহকে আহমাদের সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিল—"ঐ সময়ে সম্পর্ক ভালো ছিল। পেছনে তাকালে বুঝতে পারি ওটাই ছিল আমাদের বিয়ের পর কাটানো সেরা সময়। আমরা খুশি ছিলাম, আত্মতৃপ্তি

ছিল আমাদের। সম্পর্কটা খুব কাছাকাছি ছিল, আমরা অনেক কথা বলতাম নিজেদের মধ্যে।"

ক্লেয়ার গ্যারেথের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বলেছিল—

> "নিজেদের ফ্ল্যাট ছিল শুধুই আমাদের জায়গা। অন্য বন্ধুরা কী ভাবে তার কোনো প্রভাব এর উপর ছিল না। আমাদের ইসলামি পরিচয়, সম্পর্ক এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠছিল। একটা তাক ছিল ইসলামি বইয়ের, একটা জায়গা ছিল সালাত আদায়ের। আমরা একসাথে অনেক কিছু শিখেছি আর আরো অনেক কিছু শেখার জন্য আমরা রীতিমতো ক্ষুধার্ত ছিলাম। আমরা একসাথে বসে অনেক পড়তাম, সহিহ বুখারি অথবা চল্লিশ হাদিস। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতাম। এসব ছিল চমৎকার!

আমরা বিভিন্নরকম পরিবেশে থাকতাম। প্রচুর নতুন মুসলিম ছিল সেখানে। মাঝে মাঝে এমন কিছু মানুষের দেখা পেতাম, যারা চলে যাওয়ার পরও মনে ছাপ রয়ে যেত।

মুসলিম হিসেবে জামিলা তার সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তিত্বের কথা বলেছিল—

> "একজন নতুন মুসলিম হিসেবে আসিয়াহ ও সিরাজের বাসায় থাকার সময়টা সেরা ছিল আমার জন্য। ঐ বাসাটা সকাল, দুপুর, রাতে দ্বীন দিয়ে পূর্ণ ছিল। দিনের বেলায় অনেক দ্বীনী ভাই ও বোনেরা থাকত, আর ছিল কুরআন। প্রচুর খাবার ছিল, যেটা ভালো লাগে নিয়ে খেয়ে নাও, সত্যিকারের উদার খোলামেলা একটা বাড়ি। এর উদ্দেশ্যই ছিল ইসলাম ছড়িয়ে দেওয়া ও শেখানো। ওখানে পরিচয় হওয়া এমন অনেকের সাথে এখনো আমার পরিচয় আছে। ওখানকার মানুষদের সবসময়ই অন্যদের জন্য সময় থাকত, তাদের সব সময়ই যেন অন্যদের। ওদের মতো দ্বিতীয় মানুষ আমি আর দেখিনি। আমার বাবা-মায়ের মতো ছিল, যেন আমার নতুন পরিবার।"

উম্মে মুহাম্মাদও আসিয়াহ-সিরাজের কথা মনে করে। তারা দুজনই পরপর ইন্তেকাল করেন, অন্য মানুষগুলোর উপর এর প্রভাবটা উম্মে মুহাম্মাদ আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিল—

> "আসিয়াহর মৃত্যুতে সবার উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। প্রত্যেকের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল তার জন্য, কমপক্ষে নয় মাস ধরে। পরিচিত সমাজে এটাই ছিল প্রথম মৃত্যু, আর এই প্রথম মৃত্যুটা এমন কারো যাকে আমরা সবাই চিনি, ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। এক বছর পর তার স্বামীর মৃত্যু ছিল আরেকটা ঝড়। একজন মুসলিমের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি ছিল আমাদের প্রথম মৃত্যুকে দেখা—পরকাল শুরু হয়ে যাচ্ছে, তা দেখা।"

আমি আরো অনেক মেয়েকে আসিয়াহর কথা বলতে শুনেছি যে কিনা তাদের পড়াশুনায় সাহায্য করত, নতুন মুসলিম হিসেবে চিন্তাচেতনায় হাল ধরত। তারা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে আসিয়াহর কথা বলত।

আমার চাকরিতে বিভিন্ন রকমের মানুষের সাথে দেখা হতো কারণ তারা নানান জায়গা থেকে এখানে আসত ইংরেজি শিখতে। এতরকমের মানুষের সাথে মিশতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম আর ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন মুসলিমের সাথে মেশাকে গুরুত্বও দিতাম। পাকিস্তানি, বাঙালি, আলজেরিয়ান, সোমালি, আলবেনিয়ান, পশ্চিম আফ্রিকান যাদের সাথে দেখা হতো, শাহাদাহ পাঠ করার পর তাদের সাথে একটা আত্মার টান অনুভব করতাম। মনে পড়ে আমাকে যতবারই কেউ জিজ্ঞেস করত আমি মুসলিম কি না, আমার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিত হয়ে হ্যাঁ বলতে খুব ভালো লাগত। বলতেই হবে, তারা প্রত্যেকে উষ্ণ স্বাগতম জানাত, ইসলামি পদ্ধতিতে স্বাগত জানাতে ভালো লাগত খুব-

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক আর রহমত ও বরকত।

আমরা শুধু নিজেদের জাতি, বয়স, শ্রেণি বা একই মানসিকতার মানুষের সাথে মিশিনি, বরং সব মুসলিমের সাথেই মিশেছি, নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেছি; এতে করে কোনো ধরনের বিভাজন থেকে সরে আসা গেছে আর অনেক বিপত্তিও এড়ানো গেছে।

আলিয়াহ ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করে—"সবার আচরণই ছিল অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ আর কাউকেই আমার নকল বা মুখোশ পরা মনে হয়নি। তুমি একজন মুসলিম, তুমি যা বিশ্বাস করো, ওরাও তা-ই বিশ্বাস করে। ম্যালকম এক্স মুভিটায় তিনি যখন সবার সাথে ওমরাহ করতে যান, তখন তারা কারা এ ব্যাপারটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমার কাছেও তখন এরকমই লাগত। যখনই তাদের সাথে দেখা হবে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরবে। আর ইসলামে আসার আগে এমনটা তুমি কোথাও পেতে না।"

> *"আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল চমৎকার! অনেক বোন, তাদের বয়স কম—চাইনিজ, কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, এশিয়ান সবরকমের। আমি সত্যিই মুগ্ধ হতাম। সবাই-ই নতুন দ্বীনের পথে এসেছে আর অনেক উৎফুল্ল। এই পুরো অভিজ্ঞতায় আমি অভিভূত।"*
>
> *—রাবিয়া*

যেখানে ইসলাম গ্রহণের আগে আমি অন্যজাতির বা বর্ণের মানুষের সাথে বলতে গেলে মিশতামই না, সেখানে এখন আরব, এশিয়ান, শ্বেতাঙ্গ সবার সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশছি। অন্যরাও তা-ই করত। কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে আমার আগের অনেক ধারণা ছুঁড়ে ফেললাম, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিয়েতে যে কঠোর বিরোধিতা করতাম, তা-ও।

প্রায়ই আমি ভিন্নবর্ণ ও জাতির মধ্যে যে বিয়েগুলো দেখেছি, সেগুলো ছিল বিস্ময়ে ভরা। আমরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতাম কে সবচেয়ে অন্যরকম বিয়ে

দেখেছে—হয়তো নাইজেরিয়ান আর মিশরীয়, আইরিশ এবং আরব, আলজেরিয়ান এবং জ্যামাইকান, সোমালি ও পাকিস্তানি অথবা চাইনিজ এবং ঘানাইয়ান। কিন্তু এসবের বাইরেও অনেক অনেক ভিন্ন সংস্কৃতির মাঝে বিয়ে ছিল, যেগুলোর নামও হয়তো আমরা দিতে পারি না।

এই মুসলিম সমাজের অংশ হওয়া ছিল আমাদের অভিজ্ঞতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কখনো কখনো এর চেয়েও বেশি কারণ আমাদের পরিবার ও বন্ধুরা আমাদের এই নতুন জীবনধারা মেনে নেয়নি, বুঝেওনি। এই একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর হয় নতুন পরিবারের উষ্ণতায়—আমাদের নতুন মুসলিম পরিবার।

সম্পূর্ণ নতুন এক উত্তেজনা

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সবসময়, সব জায়গায় মানবজাতি জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজেছেই। আনন্দোল্লাস ও বস্তুগত ভোগের এই দুনিয়ায় কারো যদি সব স্বপ্ন, সব ইচ্ছা পূরণ হয়ও, তা-ও সবসময়ই একটা প্রশ্ন কুঁড়ে কুঁড়ে খায়, বিরক্ত করেই—এই কি সব? মনে হয় যেন মানুষের মনের চাহিদা এত বেশি আর গভীর যে কোনো আনন্দই একে পূর্ণ করতে পারে না। সে কারণেই, মাঝে মাঝে সব পাওয়া মানুষটাও রাতের আঁধারে একা একা কাঁদে, একটা ট্যাবলেটে শান্তি খুঁজে, অথবা এক বোতল মসৃণ সাদা পাউডারে, নিজের ভেতরে অর্থপূর্ণ, সত্যিকারের কিছু খুঁজে পাওয়ার তৃষ্ণা মেটাতে কিছু খোঁজে।

> *"আল্লাহর ইবাদাত করতে গিয়ে মনে হলো এটা তো তা-ই, যা আমি খুঁজছিলাম। মনে হলো আমি একটা ঠিকানা খুঁজে পেলাম যেখানে আগে আমার কোনো ঠিকানা ছিল না। দ্বীনে আসার আগে আমার নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিল না। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর আমার এত বিষণ্ণ লাগত, অবিশ্বাস্য!"*
>
> *—আজিজা।*

কিন্তু আমরা এমন কিছু খুঁজে পাই যেটা আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের অর্থ খুঁজে দেয়, যেটা আমাদের জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখায়। আমরা অনেকেই সমাজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দিত ছিলাম।

এই সমাজের নিয়ন্ত্রক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা শক্ত অবস্থানে দাঁড়াই, বলি, না, আমার জীবন আমি তোমাদের আদেশ, নিয়মনীতি মেনে চালাব না। তোমাদের আনন্দ-বেদনায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলব না। তোমাদের ফ্যাশনে আমি কাপড় পরব না। আমি একজন মুসলিম আর আমি আল্লাহর ইবাদাত করি, ভোগ ম্যাগাজিন বা সানদে টাইমসের না।

সারা আমাকে বলছিল—"আমি যখন প্রথম ঢেকে চলা শুরু করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মেয়ে বন্ধু আমাকে বলে, এই যে তুমি এভাবে চলা শুরু করেছ, এজন্য আমি তোমাকে কতটা সম্মান করি বলে বোঝাতে পারব না। আমার ধারণা সে আমাদের

দেখেছে যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণী হিসেবে, যাদের সামনে অনেক সম্ভাবনা। অথচ এর মধ্যেই আমরা পুরো উল্টোদিকে মোড় নিয়েছি, বলেছি, আমরা এসব চাই না।"

> *"আমার মনে হয়, এই যে সমাজ যা চাইছে তা তুমি করছ না, অন্যরা যা করছে তা অন্যরা করছে বলেই দেখাদেখি তুমিও করছ না, ব্যাপারটা ভালো। বিশেষ করে এই বয়স ষোলোতে, কলেজে যাওয়া, সেখানে অন্যদের দেখাদেখি সব না করা, সবাই যা পরে, তা না পরা, বরং দ্বীন যা বলে, তা করা—আমার ভেতরটাকে সত্যিকারের নাড়া দিয়েছে।"*
>
> *—বেগম*

আমাদের অনেকের কাছেই শাহাদাহ পড়ার পরের দিনগুলো ছিল জীবনের সেরা দিন। সবকিছু ছিল নতুন আর উত্তেজনায় পূর্ণ। অনেক কিছু শেখার, দেখার, বোঝার ছিল। যেন জীবনের বাকী সময়টুকু ধরে এক মহাকাব্যিক যাত্রা শুরু। আমাদের আশাবাদী তরুণ মনে মোটেও কখনো হতাশা, মনভাঙা, নিরাশা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়নি। যেন জৌলুশে, সম্পদে ভরা এক গুহার দরজা খুলে গিয়েছে, আমরা গুহার বিস্ময় দেখে আনন্দিত হতে অনেক আগ্রহী, আর আমরা তা হয়েছি, আমাদের সর্বস্ব দিয়ে, দেহ আত্মা, মন।

একজন নওমুসলিম—সমস্যা এবং সমাধান

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" (সূরাহ আনকাবুত ২৯:০২)

ইসলামে আসা একটা ইতিবাচক ও উৎসাহজনক ব্যাপার। সেইসাথে উৎফুল্ল হওয়ার মতোও। আগের অধ্যায়গুলোতে আপনি যেমনটা দেখেছেন, জীবন আবার নতুন করে শুরু হয়, একজন নতুন মানুষের জীবনের মতো, যে সবে বুঝেছে ব্যাপারগুলো কী আসলে। অনেক কিছু শেখার বাকী আছে, আর ইসলামে আসা অধিকাংশের মতো যদি আপনি হোন, তাহলে যে বিশ্বাসকে আপনি আলিঙ্গন করে নিয়েছেন, সেই দ্বীনকে আরো জানতে আপনি ভীষণ আগ্রহী। আর এই জানার সাথে সাথে জীবনের নতুন সব পথ আবিষ্কার হয়—নতুন বন্ধু, নতুন জামা, নতুন শখ, নতুন লক্ষ্য এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কারো জন্য এই পরিবর্তনের পথটা মসৃণ। তবে অধিকাংশের উপরেই মুসলিম হওয়ার পরপর নেমে আসে নানা ঝামেলা। যেন আপনার পুরো পৃথিবীটাই উল্টেপাল্টে যায়। জীবন যেমন ছিল, তেমন আর থাকে না। নতুন মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, নৈতিকতা তৈরী হয়, আর এগুলোর সাথে মানিয়ে নেওয়াটা কষ্টকর।

পারিবারিক মূল্যবোধ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন নতুন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হয় তার পরিবারের প্রতিক্রিয়া। আর এই প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হওয়া একটি দুর্লভ ব্যাপার। যখন আমি হিজাব পরতাম, তখন একবার আমার ফুপির সাথে কথা বলছিলাম—আমার জীবনযাপনে যেসব পরিবর্তন এনেছি, তা নিয়ে। ঐ সময় আমি আর শূকরের মাংস খেতাম না, অ্যালকোহল পান করতাম না, ক্লাবেও যেতাম না। আমার নিজের মতো করে সালাত আদায়ও শুরু করেছি, একটা টাওয়ারের তেরোতলার অন্ধকার বসার ঘরে, একা। তখন পর্যন্ত আমার আধ্যাত্মিক আত্মা সবে উন্নতি করছে। স্রষ্টা, যাকে আমি ঐ সময় সবচেয়ে শক্তিমান বলে ভাবতাম, তাঁর সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখার একটা প্রয়োজন অনুভব করতাম। আমার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট ছিল, আমি জীবনকে পরিচ্ছন্ন করা শুরু করেছি। আমি তখনো কোনো একটা বিশ্বাসের উপর দৃঢ় হওয়ার কথা ভাবছিলাম না, এমনকি ইসলামের উপরও না। যদিও ঐ সময় মুসলিমদের জীবনযাপনের ধরণ আমার ভালো লাগছিল কারণ এটি আত্মনিয়ন্ত্রণের

উপর গুরুত্ব দেয়, তবুও আমি একেবারে মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম না। ফুপির নিজস্ব কিছু ধ্যানধারণা ছিল আর তিনি কিছুটা নাস্তিক ধরনের ছিলেন, তবে তিনি শুনে গেলেন আমার কথা। কিন্তু এক পারিবারিক আড্ডায় বাবা যখন শুনলেন আমি ইসলামের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি, আমাকে ফোন করলেন অত দূর থেকে, বুঝতে পারছিলাম তিনি বেশ হতাশ হয়েছেন। আমি নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছিলাম কেন কাউকে কিছু বলতে গেলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল যে কোনো না কোনোভাবে এই খবর তার কাছে যাবেই, যদিও আমার দাদীমা খবরটায় খানিকটা পরিবর্তন এনেই বলেছিলেন।

আমি কী করছি, বাবা সেটা শুনতেও চাইলেন না, “আমি কী শুনলাম, তুমি নাকি মুসলিম হয়ে যাচ্ছ?” আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম, বললাম আমি আসলে মুসলিম হতে চাই না, শুধু মুসলিমদের কিছু কাজকর্ম করছি আর কী। তবে এটা স্বীকার করতেই হলো যে, এসব আমার ভালো লাগছে, আমি নিরাপদবোধ করছি। কিন্তু বাবা সেভাবে দেখলেন না ব্যাপারটা। একজন স্ব-ঘোষিত নাস্তিক হিসেবে বাবা হয়তো চাননি আমি কোনো ধর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ি। বললেন যে তিনি ভেবেছিলেন তিনি আমাকে এর চেয়েও ভালো উপায়ে বড় করেছেন, একজন স্বাধীন, তেজস্বী নারী হিসেবে। সেখানে কিনা আমি আমার এই তেজ এক কাল্পনিক ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে বিলিয়ে দিচ্ছি। বাবার গলা ধরে আসছিল বলতে বলতে, এখনো সেদিনের কথা মনে পড়লে তার সেদিনের কষ্টের কথা ভেবে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

আমি বাবাকে বোঝাতে চাইছিলাম—বাবা, ব্যাপারটা মোটেও এমন না যে আমি জেহোভার সাক্ষী ধরনের কিছু হয়ে যাচ্ছি।

বলার প্রয়োজন হয় না যে এসব শুনে তিনি শান্তি পাননি। বাবার কাছে ব্যাপারটা এমন ছিল যেন কেউ তার মুখে থাপ্পড় দিয়েছে, একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সামনে রেখে আমি অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছি, আমাকে নিয়ে তার আশা-ভরসা শেষ করে দিচ্ছি, তার পছন্দের ব্যাপারগুলোকে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। এগুলো তাকে অবশ্যই কষ্ট দিচ্ছিল, ঠিক যেমন করে আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম বাবাকে হতাশ করে।

তবে বাবার এই প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ইয়াসমিন আমাকে তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিল—

প্রথমে আমার পরিবার ভাবে আমি মজা করছি। বলত, “ওহ, ও শুধু কিছু কাজকর্ম করছে আর কী, পরের সপ্তাহ থেকে ঠিক হয়ে যাবে।” এরপর বলল, “তোমার কত বড় সাহস তুমি ধর্ম বদলাও?” এরপর শুরু হলো আমার ঢিলেঢালা জামাকাপড় নিয়ে ব্যঙ্গ করা মন্তব্য—আমাকে দেখতে আলুথালু ধরনের লাগে। ঈশ্বর হৃদয়ের ব্যাপার, জামাকাপড়ের না। আমি তখন আবায়াহ পরতাম না, তবে আসলেই বড়সড় ঢিলা

জামা পরতাম। আমার ভাইয়ের কথা মনে পড়ে, সে-ও মুসলিম হয়েছিল। ও আমাকে বলে, মা বলেছে ঘরের মধ্যে আর কোনো মুসলিম তিনি চান না।

তো আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। আমার বয়স তখন উনিশ।

> *"দ্বীনে আসার আগে কোনো এক ভাবে আমার জীবন পরিবর্তিত হতে শুরু করে। আমি ধূমপান করা ছেড়ে দেই। মদ খাওয়া ছেড়ে দেই, মাতলামি করা ছেড়ে দেই ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার জীবন অন্য কোনো দিকে মোড় নিচ্ছিল কিন্তু ইসলামকে জানার আগে বুঝতেও পারছিলাম না মোড়টা আসলে কোন দিকে নিচ্ছিল। আমি ভাবি, আল্লাহই আসলে আমাকে প্রস্তুত করছিলেন।"*
>
> *—আজিজা*

আমার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা ছিল হঠাৎ আসা ঝড়ের মতো। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সময় আর অর্থের চক্করে বাসার সাথে যোগাযোগ হতো না খুব একটা। বাহির থেকে আসা একজন শিক্ষার্থীর জন্য লন্ডনে খুব একটা স্বাধীনতা নেই। ফলে বাসার কেউ আমার চিন্তাধারা বদলে যাওয়া অথবা অভিজ্ঞতাগুলো সম্বন্ধে জানত না, যেগুলো আমাকে ইসলামের দিকে আগ্রহী করে তুলেছিল। ধারাবাহিক পরিবর্তনটা তারা দেখেনি। আর যে পরিবারে একইসাথে ইহুদি (খালা এবং তার পরিবার), খ্রিস্টান (আমার স্কটিশ পূর্বপুরুষেরা), আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী ধর্মের অনুসারী (জুলু পরিবার) এবং একজন নাস্তিক (আমার বাবা) থাকে, সেখানে ধর্ম পছন্দের কোনো বিষয় না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর সে কারণেই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি কেন আমি নিজের জীবনযাত্রা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি এখন কী বিশ্বাস করি, আমি খুশি কি না। এই নিয়ে কখনোই কোনো আলোচনা হয়নি। তবে অবশ্যই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে—ইসলামে নারীর অবস্থান, পর্দা করা, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন। কিন্তু কখনোই ওসব বিষয় নিয়ে কথা হতো না যেগুলো আমাকে ইসলামের দিকে ধাবিত করেছে, যে বিশ্বাসগুলোকে আমি ধারণ করতাম, তা নিয়েও না। হয়তো আমার পরিবারের জন্য একটা মুসলিম মেয়ের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ওটাই ছিল একমাত্র উপায়, যে মেয়েটার এখনকার রূপ তাদের দেখা রূপ থেকে একদম আলাদা। যদিও সময়ের সাথে সাথে তাদের ভালোবাসা ও স্বীকৃতি প্রথমদিককার ধাক্কা, সন্দেহকে ছাপিয়ে যায়। পরিবর্তনের ঐ সময়টায় আমার প্রায়ই খুব অপমানিত লাগত, মনে হতো আমাকে ভুল বুঝছে।

মেই যখন তার বাবাকে জানায় যে সে মুসলিম হয়ে গেছে, তিনি পুরো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। সে বলছিল,

"শাহাদাহ পড়ার এক বছর পর্যন্ত আমি বাসায় বলিনি যে আমি মুসলিম হয়ে গেছি। যদিও আমি তখন হিজাব পরতাম না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসায় ফেরার পর মা-বাবা বুঝতে পারতেন কিছু একটা বদলে গেছে। একদিন বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ভালো আছ? কোনো সমস্যা হয়েছে? তোমাকে এত মনমরা দেখায় কেন?

বললাম—কিছু হয়নি, আমার মন খারাপ না। আমি ঠিক আছি।

বাবা বললেন—না, আমাকে বল। তোমার কিছু একটা বলার আছে, কিছু একটা বদলেছে।

তো আমি বলে দিলাম—আমি মুসলিম হয়েছি।

বাবা পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না—খুব দুঃখ পান, হতাশ হয়ে পড়েন।

কিন্তু আমার শান্তি লাগছিল। আমি বাবা-মা'কে মিথ্যা বলতে পছন্দ করতাম না—অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম তাই। কিন্তু এখন আমি ঠিকঠাক। আমি বলে দিয়েছি। আমি জানতাম আমার যা করা উচিত, তা-ই করেছি। আমি জানতাম আমি যদি শাহাদাহ না পড়তাম, যদি মুসলিম না হতাম, তাহলে সবকিছু আরো খারাপ হতো। মা-বাবার চেয়ে আল্লাহর অগ্রাধিকার। আমি বদলাতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। স্রষ্টা আমার অন্তরে ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। এই বিশ্বাস সরিয়ে নেওয়া মানে আমার জানটাই নিয়ে নেওয়া।”

আমি জানতে চেয়েছিলাম এরপর বাসায় তার অবস্থা কী হলো।

“বাসায় তখন হুলুস্থুল, দুঃস্বপ্নের মতো। তারা জানত যে আমি সালাত আদায় করি। বাবা এখানটাতেই ঝামেলা করলেন। আমার হিজাবটা ব্যাগে রেখেছিলাম, বাবা সেটা পেয়ে যান। নিয়ে ময়লায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসেন।”

ঐ সময়ে তার বাবা-মা নিজেদের ব্যবসা বিক্রি করে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে চান। যেখানে কেউ তাদের চিনে না। যাতে করে কোনো ধরনের লজ্জায় না পড়েই সে ইসলাম ছেড়ে দিতে পারে। তারা মেইকে টাকাপয়সা, ভালোবাসা দিতে চান, অথবা সে যা চায় তা-ই।

“কিন্তু আমি ওসবের কিছুই স্পর্শ করতাম না কারণ জানতাম ওগুলো হলো ঘুষ। আমি সালাত আদায় করতে পারছিলাম না, ইসলাম অনুশীলন করতে পারছিলাম না; অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি ভালো ছিলাম না, খুব অস্বস্তিকর লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়। আমি মা'কে বলি যে আমাকে চলে যেতে হবে। মা রাজী হন। আমার ব্যাগ গোছানো শেষ, ভাই স্টেশনে দিয়ে আসে। এটুকুই। আমি চলে আসি। দিনটা খুবই কষ্টের ছিল। চলে আসার আগে বাবা আমাকে বলে, 'তুমি কি ভাবছ তোমার কোনো বাচ্চা হলে আমরা তোমাকে গ্রহণ করে নেব? না, আমি তোমাকে গ্রহণ করব না, বাচ্চা নিয়ে আসলেও না।' ঐ কথা আমি কখনো ভুলব না।”

তবে মা আর বোনের প্রতিক্রিয়া বাবার চেয়ে ভিন্ন ছিল। রেজিস্ট্রার অফিসে বিয়ে করার সময় ছোটবোন আমাকে দেখতে এসে চমকে যায়, আমার পরিবর্তন দেখে, মূলত আমার পোশাক আশাক দেখে। সে যা দেখত, কোথায় আমার সেই চিকন করা ভ্রু,

মেকআপ, মসৃণ চুল, ছোটখাটো পোশাক? সে আমার পায়ের দিকে তাকায়, চমকে যায় পা-ঢাকা জুতা, সাথে সাদা মোজা দেখে।

'ইশ' বলে সে, জিম্বাবুয়েতে প্রচলিত অবিশ্বাসের এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ দিয়ে বলে— "তুমি তো দেখছি এখন সমস্ত নিয়মই ভেঙে ফেলেছ।"

কিন্তু ও নিজে থেকে কিছু ধারণা করে নেয়নি, আমাকে জিজ্ঞেস করে সবকিছুর ব্যাপারে। আমি খুশি খুশি মনে উত্তর দিচ্ছিলাম, অন্য সব নওমুসলিমদের মতো আশা করছিলাম সে-ও ইসলামের সত্য সৌন্দর্য বুঝবে, ইসলাম গ্রহণ করার কথা ভাববে। আমার মনে হয় সব নতুন মুসলিমদের জন্যই সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে দ্বীনের প্রতি তাদের পরিবারের অবজ্ঞা, অমত, ঘৃণা সহ্য করা। বাসাটা এক যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে যায়। কথা মেনে চলা কঠিন হয়ে যায়।

আমার মনে হয়, মা ভীষণ খুশি হয়েছিলেন এই ভেবে যে আমি স্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছি। হয়তো চার্চে ফিরে গিয়ে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, স্রষ্টাবিহীন একটা পরিবেশে বড় হয়েও আমি স্রষ্টা খুঁজে নিয়েছি, বাকী জীবন তাঁর আরাধনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বাসার অন্য সবার চেয়ে তিনিই আমার এ পরিবর্তনের আধ্যাত্মিক দিকটা বোঝেন।

কিন্তু মুসলিম নারীরাই তো পারিবারিক চাপ থেকে মুক্ত না। আমার পরিচিতি নারীরা অনেকেই তাদের জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম ইসলামকে এর সত্যিকারের রূপে পালন করতে চেয়েছে, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে। আমি প্রায়ই অবাক হতাম যে যারা আমার আফ্রিকার সংস্কৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধা নিয়ে বড় হয়েছে, তারাই এশিয়ার বাঙালি, পাকিস্তানি মুসলিমদের পেয়ে নিজের সংস্কৃতিকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। এটা তখনই হলো যখন বুঝলাম যে সংস্কৃতিকেই যখন কেউ ধর্ম বলে মেনে নেয়, এখানটায় ধর্ম ঢুকিয়ে দিতে চায়, তখন কিছু বিকারগ্রস্থ আচরণ করে মানুষ, যেমন জোরপূর্বক বিয়ে, অনার কিলিং (সম্মান রক্ষার্থে হত্যা), মেয়েদের খতনা। এগুলো সবই ইসলামের নাম ব্যবহার করে করা হয়।

> *"আমি যখন ছোট, বারো বছর বয়স, তখন অনেক কষ্ট হতো কারণ আশপাশে তেমন কোনো মুসলিম ছিল না। সে কারণে যখন আমরা সত্যিকারের ইসলাম মানা শুরু করি, তখন সমাজ, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের উপর হতাশ হয়ে পড়ি। তাদের কাছে মনে হতো আমরা যেন নতুন কোনো ধর্ম আবিষ্কার করেছি।"*
>
> *— বেগম*

অনেক সমাজেই ধর্ম আর সংস্কৃতির মাঝের রেখাটা খুব অস্পষ্ট। একারণেই তৈরী হয় কিছু সাংস্কৃতিক আচার, যেগুলো শুধু একটা লিঙ্গ, একটা শ্রেণি, একটা অর্থনৈতিক অবিস্থানকেই সুবিধা দেয়। আর এইসব আচার পালন করতে গিয়ে সত্যিকারের ইসলামি নিয়মনীতিই বিকিয়ে দিতে হয়। একবারের কথা আমি কখনোই ভুলব না।

এক বাঙালি মেয়ের বিয়ের মেহেদীরাত উৎসবের দাওয়াত পেয়েছিলাম। বাঙালি সংস্কৃতিতে এটা একটা বিশাল উৎসব যেখানে রাতেরবেলা পরিবারের ছেলে মেয়ে সবাই একসাথে হয়, খায়, গল্প করে, কনেকে শুভেচ্ছা জানায়। মেহেদী দেওয়াটা খুব ছোট অগুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, আমার যা মনে হলো আর কী! কনে মেয়েটি নানারকম আচরণ করছে, কখনো বোন-বান্ধবীদের সাথে হেসে গড়িয়ে পড়িছে, কারো সাথে আবার বিমর্ষ হচ্ছে, ঠোঁট ফুলাচ্ছে, চোখে পানি আসছে। আমরা তাকে শান্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিলাম। সে ব্যস্ত বিশাল লাল শাড়ি টেনেটুনে ঢেকে রাখতে কারণ তা না হলে 'মা বকবে'। আমি হতভম্ব হয়ে যাই যখন শুনি তার বিয়েটা মরহুম বাবার বন্ধুর ছেলের সাথে, অনেক আগে থেকেই ঠিক করা। তাকে সে চেনে না, বিয়ে করতেও চায় না। আমি কল্পনা করতে পারছিলাম না বিয়ের রাতে দৃশ্যটা কেমন হবে। একা, এমন এক পুরুষের সাথে, যাকে সে চায় না, হয়তো পছন্দও করে না। হয়তো যাকে সে ভালোবাসে কিন্তু কখনো পাবে না তার জন্য চেয়ে থাকা। বিয়েটা যে পারিবারিকভাবে আয়োজন করা এজন্য আমি বিরক্ত না। আমার পরিচিত অনেক মেয়ের বিয়েই পারিবারিকভাবে হয়েছে। বরং আমি বিরক্ত হয়েছি এজন্য যে ইসলামিভাবে যে অধিকারগুলো তার প্রাপ্য—ছেলের সাথে দেখা করা, কথা বলা; ছেলেকে দেখে, কথা বলে ভালো না লাগলে প্রত্যাখ্যান করা অথবা কোনো কারণ ছাড়াই হ্যাঁ বা না বলা—এগুলো তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির আড়ালে। আমার মন প্রায় ভেঙে গেল। কিন্তু আমি কী আশা করেছিলাম? মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে উঠার পরও তার মা-বাবা বিশ্বাসীর জীবন যাপন করেনি। মেহেদী দিয়ে দেওয়ার জন্য আমার একজন কমবয়েসী সহকারী ছিল, সাদিয়া। ওর সাথে আমি কীভাবে কথা বলছি, সম্পর্ক রক্ষা করছি, সালাম দিচ্ছি, কথায় কথায় আল্লাহর কথা বলছি, কীভাবে পর্দা করছি এসব দেখে বিয়ের কনে মেয়েটি তারিফ না করে পারেনি।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাটি শেষ হয় পুলিশ ডাকার মধ্য দিয়ে, এক ছেলে একজন মা ও বোনকে অপমান করেছিল তাই। গতানুগতিক সংস্কৃতির ব্যাপারে আমার অভিযোগ দানা বেঁধেই থাকল, শুধু উত্তর পেয়েছিল, ওগুলো অলঙ্ঘনীয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পশ্চিমেও একই অবস্থা। যারা এসব চিরাচরিত নিয়ম ভাঙে অথবা বদলাতে চায়, কিছু গুরুতর ব্যাপারে এ কারণে তাদের প্রাণ হারাতে হয়।

বদলে যাওয়া এক জীবনযাপন

তরুণ বয়সে মুসলিম হওয়া অনেক ক্ষেত্রেই তোমাকে সামাজিকভাবে হেয় করবে, যদি তুমি ইসলামি শরিয়াহ মেনে চলতে চাও। মানে হলো তোমার অমুসলিম বন্ধুরা যখন পার্টি, বার বা ক্লাবে যাওয়ার প্রস্তুতি নিবে, তোমাকে সবসময়ই একথা বলতে হবে যে, আজ থাক, পরে যাবোনে। এমনকি আপাত দৃষ্টিতে দোষ নেই মনে হয় এমন জায়গা যেমন রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়ার সময়ও অলঙ্ঘনীয় কিছু বিধান তোমার সামনে

আসবে। সেখানে কি ছেলে মেয়ে একসাথে থাকবে? খাবারে কি অ্যালকোহল দেবে? মাংসটা কি হালাল হবে? অনেক গান চলবে? সবাই নাচানাচি শুরু করবে? হিজাব পরা আমাকে কি অদ্ভূত দেখাবে? আমি কি আমার দ্বীনের সাথে আপোষ করব ওখানে?

এই প্রশ্নগুলো সবসময় তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে, যেকোনো সামাজিক উৎসবে। বিশেষ করে যেগুলোয় অমুসলিম পরিবার বা বন্ধুবান্ধব থাকে।

আমার মনে পড়ে, ফ্ল্যাটের পরিচিত ইফুয়ার সাথে একবার তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেই আত্মীয়ের সন্তান হয়েছে, এ উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব। আমি ভীষণ বিব্রতকর, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। বিকেল হয়ে গিয়েছিল, আসরের সময়। মানুষের ভরা বাড়িটায় একটা কোণা খুঁজে আমার জায়নামাজ বিছিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। রুকুতে যাওয়ার সময় টের পেলাম পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, আমি শক্ত হয়ে যাই। বুঝতে পারি পেছনের সিঁড়িতে কেউ আছে, বিব্রত আমার চেহারা লাল হয়ে যায়। এরপর সালাতে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। তাছাড়া হিজাব পরার কারণে অন্যরা আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন আমি মাত্র অন্য কোনো গ্রহ থেকে নামলাম। আমি ছিলাম ওখানকার সবচেয়ে অসামাজিক ব্যক্তি যে কোনো মজা করছে না, যে সবচেয়ে আলাদা।

> *"আমি লক্ষ্য করছিলাম যে মানুষজন আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কারণ আমি আর তাদের মতো করে কথা বলছি না, কারণ তারা যা করছে তা আর করছি না, কারণ আমি আর তাদের মতো নেই। কারণ আমি দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করছি। আমি ওদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে যাচ্ছিলাম।"*
>
> *— সাদিকা*

শেষপর্যন্ত অমুসলিম বন্ধুদের সাথে বাইরে যাওয়া দুর্লভ এক দৃশ্য হয়ে দাঁড়াল। আমি বরং সান্দ্রার রান্নাঘরেই বেশি সময় কাটানো শুরু করলাম। ওখানে আমার মতো অনেকেই ছিল, যারা হয় ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা ইসলামে ফিরে এসেছে। একারণে কিছু দ্বন্দ্বও বাঁধল, পুরনো বন্ধুরা ভাবতে লাগল আমি বদলে যাচ্ছি, ওদের থেকে দূরে সরে আসছি। কিন্তু আমি কী-ই বা করতে পারতাম? আমি আমার দ্বীনের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে চাইছিলাম, যে দ্বীন আমার চোখ খুলে দিচ্ছিল।

অনেক বিষয় বাকী ছিল বিতর্ক করার, জানতে চাওয়ার অনেক প্রশ্ন ছিল, অনেক আচরণ নিয়ে ভাববার বাকী ছিল, আর আমি এসব নিয়েই মগ্ন ছিলাম।

> *"আমি যখন দ্বীনে আসি, খুব সচেতনভাবে যে তা অনুশীলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এমন না। বরং এমন ছিল যেন আমি একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠি আর আমার মন বদলে যায়। আমি কিছুই খুঁজছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ আমাকে পথ দেখানোর জন্য খুঁজে নিয়েছেন। ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটায় আমি একা হয়ে পড়ি কারণ সবার সাথে*

যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হচ্ছিল। আমার পরিবার সবদিক থেকেই আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় আর বন্ধুরা সব ছিল অমুসলিম। আমি যেন আরেকবার জন্ম নিয়েছিলাম, কিন্তু সবকিছু একটা ক্ষত থেকে শুরু করতে হচ্ছিল আবার। একটা নতুন সমাজ খোঁজা, নতুন বন্ধু খোঁজা। আমার কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম শুধুই আল্লাহর জন্য, আর কিচ্ছু না।"

— *গা'নিয়াহ*

সারাকে একটা দ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছিল যে সে আসলে কোনটা বেছে নেবে—দ্বীন নাকি বাস্কেটবল খেলা। এটা তার খুবই পছন্দের কাজ ছিল।

সে বলছিল—

"খেলা ছিল এমন একটা ব্যাপার যেটা ছাড়ার কথা আমি কখনো ভাবতেও পারতাম না। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আমি বাস্কেটবল খেলছি আর এটা আমার জীবনের অনেক বড় একটা অংশ। এজন্য আমি সুস্থ থাকতাম, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতাম। খেলার সামাজিক দিকটাও উপভোগ করতাম। জীবন থেকে একে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবিওনি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, ঐ আবেগ কেটে গেছে, এর জায়গায় বরং অন্যকিছু এসেছে। আমি এখন হাঁটি, পার্কে, মাঠে, সবজায়গায়।

আমি যতই দ্বীন বুঝছিলাম, সবকিছুকে মূল্যায়ন করতে শিখছিলাম—বৃষ্টি, আকাশ, গাছ, সবুজের নানা ধরণ, আল্লাহ আমাদের যা যা দিয়েছেন, সব।"

এসবের বাইরেও এই ফিরে আসা মানুষগুলোর বন্ধুবান্ধব আরো অনেক কিছুই সন্দেহ করে। তাদের সাথে ভালো-খারাপ সময়ে থাকা মানুষটা, একসাথে উত্তেজনায় টানটান স্টান্টবাজি করা মানুষটা, পাগলামি করা, উল্টাপাল্টা মেকআপ করা মানুষটাই তো সে। এই মেয়েটাই তো একঘরে তাদের সাথে একই বিছানায় ঘুমিয়েছে, রাতেরবেলা ঘুরে বেড়িয়েছে, আকাম ঢাকতে তাদের মা-বাবার কাছে মিথ্যা বলেছে, বাসায় লুকিয়ে নাইটক্লাবে গিয়েছে, ধার করা হাইহিল জুতো নেচেছে! আর সে এখন একজন মুসলিম? পর্দা করছে? মদ খাচ্ছে না, আড্ডা দিচ্ছে না, ছেলেদের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না? সে কি আসলেই এতটা বদলে যেতে পারে? আর সে কীসের বা কার দিকেই বা বদলাচ্ছে?

"পর্দা করা শুরুর পর খেলার এক বান্ধবীর সাথে একদিন বসে গল্প করছিলাম। আমার পাশেই থাকে সে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে উঠল, তুমি তো আগের মতোই আছো! সেই আগের মতো করেই হাসাচ্ছ! সে খুবই অবাক হয়েছিল।"

— *সারা*

নিজের বন্ধুর কাছে অবজ্ঞার পাত্র হওয়াটা অপমানজনক। কিন্তু পূর্বপরিচিত একটা মানুষকে তুমি তোমার নতুন জীবনের সম্মান ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কীভাবেই বা বোঝাবে, যখন সে তোমার দিকে করুণার চোখে তাকিয়ে হয়তো ভাবছে, আহারে

বেচারী, তাকিয়ে দেখো ওর অবস্থাটা। কেন সে এভাবে সরে গেল, নিজেকে ছুঁড়ে ফেলল?

> *"আমার খুবই বিষণ্ণ লাগত যখন ছোটবেলার জায়গার কারো সাথে দেখা হতো। ওরা আমার দিকে ভালোমতো তাকিয়ে দেখে বলত, কী! তুমি! তুমি মুসলিম হয়েছ, তুমি?"*
>
> *—জুবাইদা*

একবার এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে স্কুলের পুরনো এক বান্ধবীর সাথে দেখা হলো, পূর্ব লন্ডনের টিউব স্টেশনে। ঐ দিনের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। স্কুলে ও আর আমি একসাথে পার্টি করে বেড়াতাম। ও লেভেল দেওয়ার পর আর দেখা হয়নি ওর সাথে। সেদিন আমি বেশ ভোরে উঠেছিলাম। ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, মুখে কোনো মেকআপ নেই, বিশাল কালো হিজাব, আবায়াহ—অনেক বছর পর আমাকে এভাবে দেখাটা ওর কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার। ওর কাছে আমি এরকম না। আমি চাইনি জিম্বাবুয়েতে আমার পুরনো বন্ধুদের কাছে এ খবর পৌঁছে যাক যে আমি এখন এমন অদ্ভুত, বেখাপ্পা। যে আমাকে ওরা চেনে, তার চেয়ে এই আমি অনেক আলাদা। হয়তো এটা আমার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা যে আমি নিজেকে নিয়ে এমন ভাবছি, কিন্তু এত বছর আগের কারো সাথে দেখা করতে ইচ্ছাও করছিল না। আর যেখানে তুমি জানো যে তুমি যা করছ, তা সঠিক, তোমার বিশ্বাসটা সত্যি, সেখানে এরকম অবজ্ঞার পাত্র হওয়া, নাক সিটকানোর বস্তু হওয়ার মতো অনুভূতি আর কিছুতে হয় না। আমি যত মানুষকে চিনি, সবাইকে গিয়ে গিয়ে যে বলব, ব্যাখ্যা করব, কীভাবে অথবা কেন আমি ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, এমন কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং আমি পেছনের দিকে চলে আসি। যাদের কোনো ব্যাখ্যা দিতে হয় না, যারা বিচারকাজ বসায় না, তাদের সাথে থাকতেই সবচেয়ে বেশি শান্তি লাগত।

ক্লেয়ার বলছিল যে নিন্দা, সমালোচনার ভয়ে সে কীভাবে ধীরে ধীরে বন্ধুদের থেকে দূরে সরে এসেছে। কারণ এসবের চাপে শাহাদাহর উপর টিকে থাকতে নিজের সামর্থ্য নিয়ে সে সন্দিহান ছিল।

> "বন্ধুদের সাথে আমি সত্যিই কোনো যোগাযোগ করতাম না। ওরা হয়তো ভাবত যে আমি গ্যারেথের জন্য মুসলিম হয়েছি কারণ একমাত্র সে-ই আমাকে ইসলামের কথা বলত। আমার জন্য সবাইকে বলে বোঝানো কঠিন ছিল যে হ্যাঁ, হয়তো কিছুটা ওর জন্য কিন্তু কখনোই শুধু ওর জন্য আমি মুসলিম হইনি। ব্যাপারটা কখনোই এমন না। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে ওরা আমাকে নিয়ে কী ভাববে। সবার সাথে নিজের পার্থক্যটাকে অনুমোদন করতে ভয় পাচ্ছিলাম, যদি আমি নিজেই টিকে থাকতে না পারি! নিশ্চিত সত্যকে গ্রহণ করে নিতে নিজের সামর্থ্য নিয়েই আমার সন্দেহ ছিল। সব বন্ধু থেকে আমি অনেক দূরে সরে আসি। আমি ওদের এ নিয়ে তেমন কিছু

বলিওনি কারণ আমার মনে হয়েছিল এভাবেই হওয়া উচিত সব। আমার মনে হয় না অন্য কোনো উপায়ে আমি এসব করতে পারতাম।"

আমি আর অন্য বোনেরা, যাদের সাথে কথা বলেছি, যে আরেকটা ব্যাপার নিয়ে সমস্যায় পড়তাম তা হলো ফ্রি-মিক্সিং। এই শব্দ দিয়ে মুসলিমরা এমন একটা পরিস্থিতেকে বোঝায় যেখানে অনাত্মীয় ছেলে-মেয়ে অবাধ চলাফেরা, মেলামেশা করে। পরিবারের মধ্যে বিবাহিতরা অথবা এমন আত্মীয় যাদের বিয়ে করা যায় না, তাদের সম্পর্ক উন্মুক্ত। এইসব সম্পর্কের কথা কুরআনে সূরাহ নিসায় স্পষ্ট করে বলা আছে-

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকণ্যা; ভগিনীকণ্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকরী, দয়ালু।" (সূরাহ নিসা ৪:২৩)

এর মানে হলো একজন মুসলিম নারীর জন্য তার বাবা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদি মানুষের সামনে পর্দা করা বা হিজাব পর অত্যাবশ্যক না। এসব মানুষ, যাদের মাহরাম বলা হয়, তাদের সামনে সে তার সাধারণ পোশাকে, মেকআপে, সুগন্ধি লাগিয়ে যেতে পারবে; বন্ধুত্বপূর্ণ, স্বস্তির সম্পর্ক রাখতে পারবে।

অনাত্মীয় ছেলে-মেয়ের মাঝে সম্পর্কটা কিছু নীতিমালা দিয়ে আবদ্ধ—হিজাব পরা, দৃষ্টি নিচু রাখা (ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্যই যদিও কুরআনে ছেলেদেরকে একথা আগে বলা হয়েছে), নির্জনে একসাথে না থাকা, শারীরিকভাবে কোনো স্পর্শ না করা এবং যোগাযোগের প্রয়োজন হলে শ্রদ্ধাশীল থেকে ন্যূনতম কথা বলা। আমাদের জীবনে ব্যবসায়িক লেনদেন, পড়াশুনা, বাজারঘাট ইত্যাদি প্রয়োজনে এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেকারণে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি এই যোগাযোগটা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে। অনেক অমুসলিম, এমনকি কিছু মুসলিমও ছেলে ও মেয়ের সম্পর্কের এই সীমারেখাকে অস্বাভাবিক মনে করে, বোঝে না।

এই জায়গায় এটা মনে রাখা উপকারী যে আমরা মুসলিমরা এমন কিছু নৈতিক নিয়মকানুন মেনে চলি যা এই সমাজের চেয়ে আলাদা, যে সমাজে আমরা বসবাস করি। এটাই নৈতিকতা যার কথা কুরআনে বলা হয়েছে, এখান থেকে সরে যাওয়ার সর্বোচ্চ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। ইসলাম মেনে চলা একজন মুসলিমের কাছে এটা জঘন্য ব্যাপার, এজন্যই যেকোনো বিনিমিয়ে এসব এড়িয়ে চলা উচিত।

আমি তোমাকে একটা দৃশ্য কল্পনা করতে বলি—ছেলে-মেয়ে একসাথে রাতেরবেলা বের হয়েছে। মেয়েরা আকর্ষণীয় পোশাক পরা, পায়ে নাচানাচির জুতা। অ্যালকোহল বেয়ে পড়ছে, ছেলেরা নিজেদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, নিজেকে উপস্থাপন করতে আগ্রহী। তাদের দেখা হলে একে অন্যকে আলিঙ্গন করছে, চুমু খাচ্ছে। হয়তো কোনো একটা আলিঙ্গন স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশিক্ষণ ধরে থাকল, হয়তো মেয়েটার নরম চুল অথবা ছেলেটার আফটারশেভের সুগন্ধের জন্য। কিন্তু এটা কিছুই না, ওরা শুধুই বন্ধু। তাছাড়া প্রত্যেকেরই দীর্ঘদিনের প্রেমিক-প্রেমিকা আছে, যাদের তারা খুব ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

এসব বন্ধুত্বপুর্ণ খুনসুটি সবার মন ভালো রাখে, কিছু কিছু পটানো ধরনের মন্তব্যও থাকে। একজন ঝলমলে হাসিঠাট্টা করা নারীর চারপাশে কিছু পুরুষ থাকে যারা তার সব কথা শুনে। ছেলেগুলো এমন করতে ভালোবাসে, বিশেষ করে একজন ভালো বন্ধু—সে মেয়েটির সাথে তর্কবিতর্ক করতে ভালোবাসে, মেয়েটি তার কাছে চ্যালেঞ্জের মতো। তার প্রেমিকার মতো না, তুলনা করলে প্রেমিকাটিই কম আকর্ষণীয়। এখন তারা দুজন আছে, একসাথে চলছে। অন্যেরা তাদের এই বদলে যাওয়া দেখছে যেন তারা স্ফুলিঙ্গ। প্রেমিকা মেয়েটি বিব্রত লজ্জিত হয়ে নিজের আসনে চলে যাচ্ছে কারণ সে ছেলেটির মনোযোগ নিজের দিকে ধরে রাখতে পারেনি। তার প্রেমিক তার অযোগ্যতা দেখিয়ে দিয়েছে, তার সাথে কথা বলার সময় কখনো চোখে সেই স্ফুলিঙ্গ ছিল না। এমন করেই সন্ধ্যা কেটে যেতে থাকে—প্রত্যেকেই অন্য কারো সাথে, মস্তিষ্কের অ্যালকোহলের নেশা, নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে। রাতের শেষে কী হবে? এই "ভালো বন্ধু"রা কি একসাথে বাড়ি ফিরবে? প্রেমিকাটি কি বাড়ি ফেরার পথে কাঁদবে? অন্য এক মেয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ থেকে আলো হারিয়ে ফেলায় রাগ হবে? প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য? প্রেমিক ছেলেটি কি তাকে কটুকথা বলে থাপ্পড় দিয়ে বসবে? অসঙ্গত আচরণ করার জন্য তার উপর রেগে যাবে? অথবা কিছুই হয়তো হবে না, সাধারণ থাকবে সব। হয়তো এটা অন্যসব রাতের মতোই একটা রাত হবে। অথবা হবে না।

এটা শুধু একটা দৃশ্য আর অনেকের কাছেই এটা ভিন্নলিঙ্গের মাঝে স্বাভাবিক, নির্দোষ একটা মেলামেশা। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই ছেলে ও মেয়ে একসাথে থাকলে যৌন উত্তেজনার একটা বীজ বপিত হয়। শেকড় গজানোর আগেই কিছু বীজ মারা যায়, কিছু বীজ মারা যাওয়ার আগে উঁকি দিয়ে যায়, আর কিছু পূর্ণ হয়ে বিকশিত হয়।

মিডিয়া এই সবকিছু খুব ভালোমতো জানে। অসংখ্য সিনেমা, উপন্যাস, গান, কবিতায় ব্যভিচারের বিষয়বস্তু নানাভাবে দেখানো হয়, বোঝানো হয়। আমার বরং মনে হয় এভাবে বলা ভালো যে, এসব ভাষা এবং ব্যভিচারের কল্পিতচিত্র এই সমাজেরই অংশ, আমরা তা পছন্দ করি আর না-ই করি। জনপ্রিয় মিডিয়া না এসব নিন্দা করে, না এসবের বিরুদ্ধে কিছু বলে। বরং একে আরো আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে, যারা

এসব করে, তাদেরও—কে কার সাথে এসব করছে, কে কার মন ভাঙল, লম্পটগুলো, ডন জুয়ান। স্পষ্ট করে বললে ক্রমাগত ব্যভিচারী ছাড়া এরা আর কী? নারীদের এত যে মোহনীয় বর্ণনা, এ থেকেই বোঝা যায় সমাজ কোনদিকে কাজ করে, লিঙ্গসমতার এই যুগেও।

কিন্তু মুসলিমদের কাছে ব্যভিচারের এই চিত্র আকর্ষণীয় না মোটেও। এটা একটা গুরুতর পাপ। যা কিছু এই দিকে ঠেলে দেয় তা সবই এড়িয়ে চলতে হয়, নিষিদ্ধ করতে হয়—এর মধ্যে আছে ফ্রি মিক্সিংও।

কিন্তু একজন নতুন মুসলিম, যে সারাজীবন ধরে ফ্রি মিক্সিংয়ে অভ্যস্ত, সে কীভাবে হঠাৎ করে তার প্রাক্তন প্রেমিক আর ছেলেবন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সাথে মানিয়ে নেবে? এই ফ্রি মিক্সিংয়ের ব্যাপারটি যে আমার জন্য খুব একটা কঠিন ছিল না তার কারণ কিন্তু এই না যে আমার খুব কাছের ছেলেবন্ধু ছিল না। বরং কঠিন ছিল না এজন্য যে, আমি এর পেছনের কারণটা ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। কারণ আমি নিজের চোখে এই স্বাধীন সঙ্গের পরিণতি দেখেছি, সবচেয়ে ভালো বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এক মেয়ের মানসিক যন্ত্রণা ভাগাভাগি করেছি, এক প্লেটোনিক বন্ধুর হঠাৎ প্রেমে পড়ে যাওয়ার অশান্তি দেখেছি। সেকারণেই এসব পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থাটিকে আমি স্বাগত জানাই।

তবে সবার জন্য এটা সহজ ছিল না।

ইয়াসমিন বলছিল, "এটা কঠিন ছিল, আমার বেশিরভাগ বন্ধুই ছিল ছেলে। আমি যখন দূরে সরে আসতে চাইছি আর ওরা তখনও সম্পর্ক ধরে রাখতে চাইছে, তখন কঠিন ছিল, ওদের সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। মেয়েদের সাথে ওদের সংস্পর্শ থেকে সরে আসতে পারায় আমি আনন্দিত।"

সুয়াদের জন্ম এক সোমালি মুসলিম পরিবারে। ওর জন্য এই ফ্রি মিক্সিং আর পারিবারিক চাপের জন্য দ্বীন মেনে চলা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ও আমাকে বলছিল,

> "আমি আমার মুসলিম ছেলে বন্ধুদের বলতে পারছিলাম না যে, আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে পারব না, এটা নিষেধ। আমি ছেলে-মেয়ে সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলাম, যারা আমাকে একটু হলেও প্রভাবিত করতে পারে এমন সবার সাথে। আমি ওদেরকে আর ফোন দিলাম না, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। কিন্তু আমি তো আমার বোনের সাথে বিচ্ছিন্ন হতে পারছিলাম না, যেই বোন আমার সাথে একই বাসায় থাকে। সে ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল, 'তুমি তো চরমপন্থী। আমি বুঝি না কেন তোমার এমন করা লাগছে।' পরিবারের বাইরে যারা, তাদের কাছ থেকে দূরে সরা যায়, কিন্তু যখন মানুষগুলো বোন বা অন্য আত্মীয়, যারা সবসময় লেগেই আছে, তখন দূরে সরা যায় না।"

আর কেউ কেউ ছিল, যাদের প্রেমিক বা সঙ্গী অমুসলিম। দ্বীনে আসার পর তাদের সাথে বোঝাপড়া করতে হয়েছিল সেই মেয়েদের। কারো প্রেম হয়তো সেই হাইস্কুল থেকে, কেউ হয়তো অনেক বছর ধরে বিবাহিত, কিন্তু মুসলিম হওয়া মানে হলো খুব কঠিন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া। মুসলিম নারী কেবল মুসলিম পুরুষকেই বিয়ে করতে পারে। কুরআনে যেমনটা বলা হয়েছে-

> "মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ মুমতাহিনা, ৬০:১০)

তারা পাপের মধ্যে বসবাস করতে চায়নি, এই আইনের অর্থ হলো খুব কার্যকরীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—জীবনসঙ্গী নাকি ইসলাম—কাকে সে বেছে নেবে? সাধারণ কিন্তু কঠিন সিদ্ধান্ত—কারণ দ্বীন সবার আগে।

এই সিদ্ধান্তটি অসম্ভব মনে হতে পারে, বিশেষ করে যদি তাদের সম্পর্কটা ভালো হয়। কিন্তু এটা বোঝার একটা উপায় আছে—মনে করো তুমি একজন অ্যালকোহলিক অথবা ধূমপায়ী, সিদ্ধান্ত নিলে এগুলো ছেড়ে দেবে। কিন্তু তোমার সঙ্গী, সে মদ খেয়েই যাচ্ছে অথবা ধূমপান করেই যাচ্ছে। এখনও তোমার শিরা-উপশিরা দিয়ে যে নেশা প্রবাহিত হয়, এখনো তোমাকে আহ্বান করে, জীবন থেকে তা তুমি কীভাবে সরাবে যেখানে তুমি যে মানুষটাকে ভালোবাসো, যার সাথে থাকো সে এসবেই ডুবে থাকে? এসব ছেড়ে দেওয়া আর সম্পর্ক রক্ষা করা, দুটো একসাথে প্রায় অসম্ভব। ইসলামের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই। একজন নতুন মুসলিম হিসেবে তুমি ইসলাম মেনে জীবন যাপন করতে চাও, ফজরের জন্য ঘুম থেকে যখন উঠো তখন থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু একজন অমুসলিম জীবনসঙ্গী থাকা মানে প্রতিনিয়ত সেই পুরনো জীবনের মুখোমুখি হওয়া, সেই জীবনেরই প্রভাবে থাকা—অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা, ফ্রি মিক্সিং, মদ্যপান, নেশা করা অথবা একটা বেকন স্যান্ডউইচের ঘ্রাণই হয়তো—এগুলোই ফিতনা। এই দৃঢ় সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়ে অনেক নারীই সঙ্গীকে বিদায় জানায়।

আমি উম্মে সাফওয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, পাঁচ বছরের পুরনো প্রেমিককে না দেখে সে কীভাবে থাকত,

"এটুকুই বলতে পারি যে আল্লাহই শক্তি দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়েছিল যে আমি একজন অবিশ্বাসীর সাথে থাকতে পারি না। যদি থাকি, তাহলে আমার দ্বীনে আসার মানেটা কী দাঁড়াল? আমি আগে যা করতাম, এখনো তা-ই করছি, শুধু নামে বলছি যে আমি মুসলিম—মজা করছিলাম নিজের সাথেই।"

উম্মে সাফওয়ানের প্রেমিক খুবই আগ্রহী হয়েছিল এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে যা বলতে গেলে তার প্রেমিকাকে চুরিই করে নিয়ে গেল। সে মসজিদে যায় এ সম্পর্কে জানতে। পরে সে-ও মুসলিম হয়ে যায়, সাথে তার মা ও বোনও। এখন সে আর উম্মে সাফওয়ান বিবাহিত, তাদের চারজন সন্তান।

নতুন এক বেশভূষা

এই বইয়ের জন্য আমি যে মেয়েদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের এবং আমার অভিজ্ঞতা বলে, একজন মুসলিম নারীর জন্য হিজাব হলো সবচেয়ে কঠিন ব্যাপারগুলোর মধ্যে একটি। এটার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে পড়ে—নিজেকে তুমি কীভাবে দেখছ, অন্যরা তোমাকে কীভাবে দেখছে এবং ফলস্বরূপ তোমার সাথে তারা কেমন ব্যবহার করছে। আমি এবং অনেকের কাছেই হিজাবটা স্বাভাবিকভাবে জায়গা করে নিয়েছিল যদিও আমি শুরু করেছিলাম সাধারণ মাথা ঢেকে রাখা দিয়ে, সেখান থেকে পুরোপুরি ঢেকে চলা পর্যন্ত চালিয়ে গেছি। কেউ কেউ শুরু করেছিল টুপি পরে, অথবা একটা রুমাল দিয়ে। হালিমা তো শুরু করেছিল মাফলারমতো একটা কিছু দিয়ে,

"তখন ছিল শীতকাল। আমি একটা মাফলার প্যাঁচানো দিয়ে শুরু করি। তোমার মনে পড়ে ঐ মাফলারগুলোর কথা? এরপর ভাবলাম, এখন তো গরম আসা শুরু করেছে, সবসময় মাফলার পরা যাবে না। কোভেন্ট গার্ডেন থেকে একটা হিজাব কিনি, সেটা প্যাঁচানো শুরু করি, ওরকম করেই চলে অনেকদিন। একটা সময় মনে হয়, হ্যাঁ, এখন আমি শুরু করতে পারি।"

আর ইয়াসমিন বলেছিল,

"মাথা ঢেকে রাখা ছিল আমার জন্য চ্যালেঞ্জের মতো। শরীর ঢেকে রাখা? জি না। চুল ঢেকে রাখা? ওহ, আমি এই চুলের জন্য অনেক টাকা খরচ করতাম। ঐ সময়ে চল্লিশ ডলার বেশ বড় অঙ্ক আর আমি সেটা খরচ করতাম চুলটাকে সামান্য ব্লোড্রাই করাতে। আমি চাইতাম মানুষ আমার চুল দেখুক। টুপি পরা শুরু করতে আমার ছয় মাস লেগে যায়। এরপর টুপি থেকে যাই হিজাবে।"

হিজাবকে গ্রহণ করে নিতে বেশ কিছু আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম, স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণের ধর্ম, আর এই বিনয়টুকু বিশ্বাসীর বাহ্যিক রূপেই প্রকাশ পায়। হিজাবের উদ্দেশ্যসমূহের একটি হচ্ছে নিজেদের, নিজেদের পোশাক, নিজেদের দেহ প্রদর্শন করে বেড়ানো থেকে বিশ্বাসীদের বিরত রাখা। আর নতুন মুসলিমদের জন্য এটি কঠিনই বটে, বিশেষ করে আলিয়াহর মতো যারা ফ্যাশন আর নিজেদের সুন্দর দেখানোয় ব্যস্ত থাকত। সে অকপটে বলছিল আমাকে,

"হিজাব আমার জন্য সত্যিই কঠিন ছিল কারণ আমি আমার পোশাক-আশাক খুবই ভালোবাসতাম। আমি মসজিদে আসতাম, তারপর আবার আমার অমুসলিম পরিবারে ফিরে যেতাম, তখন হিজাব নিয়ে আমার লজ্জা লাগত। এটা পরলেই আমার খুব গরম লাগত, সবচেয়ে ঠান্ডার দিনেও, যেন সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু একটা সময় আমি একে ভালোবাসতে শুরু করি। কিন্তু এটা খুব সহজ ছিল না, সময় লেগেছে অনেক।"

তো অনেকর জন্যই হিজাব ছিল চ্যালেঞ্জের মতো। যখন নিশরে প্রথম হিজাব দেখেছিলাম, আমার নিজের কাছেই এটা বিচ্ছিরি লেগেছিল। কিন্তু চেষ্টা করবার পর মনে হলো, হ্যাঁ, আমি এটা পরে চলতে পারি। শেষে দেখা গেল এটা পরে আমি গর্ববোধ করছি। অন্য পোশাকগুলো, যেমন আবায়াহ ও জিলবাব, এগুলোর গল্প ভিন্ন। এই ঢিলাঢালা বিশাল কাপড় আর ওভারকোট, যেগুলো পরনের জামার উপরেই পরতে হয়, এগুলো নিয়ে ইয়াসমিনের বলার অনেক কিছু আছে।

"বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, আবায়াহ একটা কুৎসিত পোশাক। আমি ভাবলাম, কী অবস্থা! আমাকে এখন ছোটখাট তার্কিশ দাদিমা ধরনের দেখাবে। না, আমি পারব না। আমি তো ভদ্র, ঢিলাঢালা জামা পরছি, তুমি আমার দেহের আকৃতি দেখতে পারছ না—যতসব ফালতু ব্যাপার। এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এরপর আমি পড়াশুনা শুরু করি আরো। বুঝতে পারি দিনশেষে আমার এটুকুই করার আছে। আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, আমার কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি তো নিজের দেহ দেখিয়ে বেড়ানোর মতো না, তাহলে আলাদা একটা পোশাক পরা আমার কাছে এত সমস্যার ব্যাপার হয়ে গেল কেন? ঠান্ডা থাকলে তো তুমি একটা কোট পরে বের হয়ে যাও। তাহলে সবসময়ই এই কোটটা পরে বের হতে পারবে না?"

পাঁচ-দশ বছর আগে যে আবায়াহর চল ছিল—চওড়া এক গাউন, কাঁধটা চওড়া, কুঁচকানো হাতা—একে আমাদের অনেক কাটছাঁট করে নিতে হয়েছিল। পূর্ব লন্ডনের ইসলামি দোকানগুলোয় এসবই পাওয়া যেত, আমি এগুলো খুবই অপছন্দ করতাম। হাসতে হাসতে ক্লেয়ার এগুলোর ব্যাপারে তার কথা বলছিল—

"উহফ! জঘন্য ছিল ওসব। এটা গায়ে দাও, তুমি খুব ধার্মিক হতে চাচ্ছ, বলছ, 'না, যতটা খারাপ মনে হচ্ছে এগুলো আসলে ততটা খারাপ না'। কিন্তু ওগুলো আসলে তার চেয়েও খারাপ। পেছন দিয়ে আবার দুটো কুচিও আছে। যেন কেউ ভুল করে মাতৃত্বকালীন জামা পরে ফেলেছে।"

আমি হাতজোড় করলাম ওসব আবায়াহ আমি কোনোদিন পরব না। তবে সেসময় আমি পরনের জামার উপর আলাদা কিছু গায়ে দিতে প্রস্তুত। ব্র্যাডফোর্ডের এক বোনের সাথে পরিচয় হয় তখন। তিনি সুন্দর, নিচ দিয়ে ছড়ানো আবায়াহ বানাতে পারতেন, যেগুলো কাঁধটা ওভাবে দেখা যেত না। তার ঐ আবায়াহগুলোকে আমরা

তখন জিলবাব বলতাম। আমার মনে হলো নিজেকে ক্ষ্যাত দেখানো ছাড়াও আরো ঢেকে চলা যায়। আর আমার কখনোই মনে হয়নি নিজেকে পরিচ্ছন্ন, স্মার্ট (শালীন) দেখতে চাওয়ার সাথে আমার বিশ্বাসের ন্যূনতম সংঘর্ষ হয়েছে।

আমি কথা বলেছি এমন কিছু মেয়ের কাছে ঐ সময় হিজাব ছিল এলিয়েনের মতো। হালিমা বলছিল,

"এটা ছিল তখনকার আমার পুরোপুরি বিপরীত, আমার ব্যক্তিত্ব, চলাফেরার। আমি তখন কলেজে, দ্বিতীয় বর্ষে, নিজেকে সবেমাত্র আবিষ্কার করা শুরু করেছি। পরিবার থেকে দূরে এসেছি, আমি নিজেই তখন আলাদা কিছু, সেখানে ঢেকে চলাফেরা করা সেই আমার একদম উল্টো। মাশাআল্লাহ, আমি মাথা ঢাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তারপর সারা শরীর। এলাকায় মানুষা আমাকে যেভাবে দেখত, কলেজেও সেভাবেই। কেউ কেউ বলত, আমরা মসজিদের কাছাকাছি আসতেই আরো কাপড়-চোপড় গায়ে দেই। কিন্তু আমি ওমন করতে পারতাম না, আমার কাছে সেটা ভন্ডামি মনে হতো। আমাকে যেমন দেখতে পাচ্ছ, আমি তেমনই।"

সাবেক রায়োট গার্ল, ক্লেয়ার স্বীকার করছিল—

"হিজাব ছিল আমার জন্য সত্যিই কঠিন, কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক। আমার মনে হয় যদি খুব ভালো পরামর্শ দেওয়ার মতো কাউকে পেতাম, তাহলে উপকার হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পাইনি। অবাধ্যতা করেছি তাই অনেকদিন ধরেই। যখন হিজাব পরা শুরু করি, তখনকার অবস্থা ছিল খুবই উগ্র, ব্যাগি জিনস, ছোটো একটা স্কার্ফ, ধাপে ধাপে আমি এখন হিজাবটাকে ভালোবাসি।"

হিজাব পরা শুরুর আরেকটা দিক হলো অন্যেরা তোমাকে কীভাবে দেখছে। এখানে অন্যেরা বলতে যে আমি শুধু ছেলেদের কথা বলছি না, তা বোঝাই যাচ্ছে। আসলে, হিজাব পরার সবচেয়ে ভালো দিকগুলোর একটি হলো যৌনতাবিষয়ক কোনো বস্তু হিসেবে কেউ তোমার দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু এর বাইরে কিছু মানুষ আছে যারা ভাবে তুমি এমন একজন এলিয়েন, যার কোনো মন নেই, নিজস্বতা নেই। আর সবচেয়ে বেশি ছড়ায় যে ধারণা, তা হলো, তুমি আগে যেমন ছিলে, এখন আর তেমন নেই, অবনতি হয়েছে। পুরোপুরি ইসলামে আসার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সেক্রেটারির (নারী) সাথে আমার বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়, প্রায়ই আমি তার অফিসে গিয়ে গল্প করতাম, হাসাহাসি করতাম। তো যখন আমি আফ্রো-প্রিন্টের মাথা প্যাঁচানোর কাপড়টা বদলে কালো হিজাব পরা শুরু করলাম, সে ওটা নিতেই পারছিল না। আমার এই পরিবর্তন নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রায়ই সে এভাবে শুরু করত, "কিন্তু তুমি তো এমন ছিলে............'। উচ্ছ্বাস, আনন্দে রঙিন জীবনই ছিল তার কাছে সব। আমি আমার পর্দা করার কারণ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, লাভ হলো না। সে বুঝল না। বাইরের আবরণ ভেদ করে সে আমার ভেতরটা দেখতে পেল না, কালো কাপড়ের ভেতরে আত্মবিশ্বাসী, সুখী 'আমি' তার চোখে পড়েনি।

ঐ সময়ে আমার একটা উপলব্ধি হয় যে এই সমাজ আমাদের শুধুই বাইরের রূপ দেখে মোহাচ্ছন্ন হতে শিখিয়েছে। একজন সুন্দর, চিকন, ধনী, মেধাবী, রসিক মানুষকে আমরা খুশিমনে গ্রহণ করে নেই, চেহারা দেখে। কিন্তু পেছনের গল্পটা কী, সেটা নিয়ে ভাবতে আমাদের শেখানো হয়নি। তো আমার সেক্রেটারি বান্ধবীটি যে স্বাধীন-সতেজ নারীরূপটিকে চিনত, তার মৃত্যুতে শোক করতে থাকল, ঐ রূপের পেছনে যে কতটা অহংবোধ, নিরাপত্তাহীনতা, শূন্যতা আর অশান্তি ছিল তা ভাবল না। মানুষের এরকম ভাসা-ভাসা ভুল ধারণার পেছনে আছে জনপ্রিয় তারকাদের ব্যাপারে মোহ। একজন তারকা ব্যক্তি হিসেবে যতই আত্মমুগ্ধ, অহংকারী, অন্তঃসারশূন্য, লোভীই হোক না কেন, আমরা তাদের দেখি নিখুঁত, নির্ভুল হিসেবে, আর এই দেখার পেছনে থাকে প্রচারণা, মুখোশ পরা ছবি। এ সবই করা হয় তাদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে। যতক্ষণ তাদের সুন্দর দেখায়, যতক্ষণ তারা ক্যামেরার সামনে হাসতে পারে, ততক্ষণ সব ঠিকঠাক, দর্শক সন্তুষ্ট। আর আমরা আমাদের সময় নষ্ট করি তাদের নিয়ে কল্পনা করে, তাদের প্রত্যেকটা পোশাকের বর্ণনা পরে, কী পুরস্কার পেল, দামী দামী কী উপহার আদানপ্রদান করল এসব নিয়ে ভেবে। ওদিকে তাদের খারাপ দিন, তালাক, মাত্রাতিরিক্ত নেশা ইত্যাদি নিয়ে মুখ চেপে হাসিও, যেগুলো আসলে দেখায় যে দিনশেষে তারাও সাধারণ মানুষ। তারা হয়তো পৃথিবীটাকে নষ্ট করছে, কিন্তু সুন্দরও দেখাচ্ছে। এই জায়গাটাতেই মুসলিমরা প্রতিযোগিতা করে না। একজন যতই বুদ্ধিমান, মেধাবী, দয়ালু, ভদ্র বা সৎ হোক না কেন, তাকে আংশিকভাবে কেউ দেখে না। এটা করলে সে ক্ষমা পাবে না।

দ্বীন মেনে চলা শুরুর পর থেকে সুয়াদ আবিষ্কার করল যে তার ওজন বেড়ে যাচ্ছে—"ওটা ছিল আমার জীবযাপনের ধরণ বদলে যাওয়া আর সাজগোজের দরকার না লাগার ফলাফল। আমার আর তখন আলাদা ভাব ধরে থাকতে হতো না।"

তার পরিবার অবশ্য তাকে ভুলতে দিত না, "আমার বাসার লোকজন প্রায়ই বলত, 'দ্বীন মানা শুরু করার পর থেকে ও এত ভাবছে না। আবায়াহ তার গায়ে না লাগলেও সে লাগিয়ে নিচ্ছে'।"

এসব তার আত্মসম্মানে বেশ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, সে হিজাব, আবায়াহর উপর বিরক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু কারো কারো জন্য হিজাব সমস্যা না। হিজাব হলো একটা পরিচয়ের প্রতীক, এমন একটা পরিচয়, যাতে নিজেদের সঁপে দিতে তাদের সমস্যা হচ্ছে। গিনি থেকে যখন আমি ফিরে আসি, তখন আমার মাথা ঢাকার সুন্দর ছয় মাস পার হচ্ছিল—আমি ওতে বেশ ভালোভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ওটা আমার চুল ঢেকে রাখছিল, সুন্দর দেখাচ্ছিল (তখনো এই সুন্দর দেখানো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ)। এটা চরমপন্থী না, আমার আফ্রিকান পরিচয়ের সাথে মানিয়ে যায়। সালাত আদায়ের রুমে প্রায়ই যে

নারীদের সাথে আমার দেখা হতো, তারা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা শুরু করল যে আমি কবে থেকে পুরোপুরি হিজাব পরা শুরু করব, তখন আমি কী পরিমাণ অবাক হয়েছিলাম ভাবুন। সত্যি বলতে আমি অপমানিত হয়েছিলাম। কে বলেছে যে ওদের হিজাব আমারটার চেয়ে ভালো? আমি এখন বলে দেব যে আফ্রিকায় আমরা এভাবেই হিজাব পরি, এর বেশি কিছু আমি করছি না আর। তারা তখন দ্বন্দ্বে পড়ে মুচকি হাসত, বুঝে উঠত না আমার এই কালো জাতীয়তাবাদী আচরণে কীভাবে কথা বলবে। কিন্তু আল্লাহ যতটুকু ঢেকে হিজাব পরতে বলেছেন, ততটুকু ঢাকা হিজাব ছিল এলিয়েনের মতো; বিদেশী, নন-আফ্রিকান লাগত। ওটা আমাকে প্রকাশ করত না।

ক্লেয়ারও এভাবেই ভাবত—"আমি হিজাব পরতে চাইনি, খুব বেশিদিন ধরে আমি হিজাব পরিওনি। আগে যা ছিলাম, তা-ই হওয়ার জন্য আমি নিজেকে খুব চাপ দিতাম, কিন্তু আমার আত্মা ওতে সুখ খুঁজে পাচ্ছিল না। আবার একইসাথে আমি নতুন কিছু পুরোপুরি গ্রহণও করতে পারছিলাম না।"

নিজস্ব পরিচয়ের সমস্যাটি ছিল জটিল। 'পুরনো আমি' ছিলো নিশ্চিন্ত, পরিচিত এক সত্তা, আমি তার সাথেই অভ্যস্ত ছিলাম স্বস্তিতে। এখন আমি বদলে যাচ্ছি আর আমার ভেতরেরই একটা অংশ এই বদলে যাওয়াকে বাধা দিচ্ছে। নিজের ভেতরে একটা যুদ্ধ চলছিল, আমি যা জানি তা সঠিক আর আমার প্রবৃত্তি যা করতে বলছিল—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে হ্যাঁ, এরকম কিন্তু প্রতিদিন হতো না, বেশিরভাগ সময়ই ছিল সুন্দর। তবে খারাপ সময়ও ছিল, এমন সময় ছিল যখন সবকিছু খুব বেশি বেশি মনে হতো। মনে হতো যে আদর্শের জন্য যুদ্ধ করছি, তা অনেক উন্নত, আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

নিচের পংক্তিগুলো ঐ সময়ে আমার ভেতরের বিশৃঙ্খলা প্রকাশ করে—

আবৃতাদের এই প্রাঙ্গনে নিজেকে হারিয়ে,
আঁধারে লুকাই কষ্টদের।
জানা নেই কবে থেকে শূন্যতার সাথে এই সখ্যতা,
স্বীকার করতেই হবে,
ঈদের দিন আমার আনন্দ ক্রমাগত কমছিল।
আমি নিজেকে খুঁজে পাই কান্নারত,
কালোয় আবৃতা
কী যেন খুঁজে ফিরি যার জন্য ফিরে আসি।
বিজ্ঞান কী বলে ভুলে যাই, পৃথিবী সমতল;
আমি দেখছি একে মাইলের পর মেইল প্রসারিত হতে
দিন দিন মলিন হওয়া, হাসিদের হারিয়ে যাওয়া।
এই যে লিখছি, নির্লিপ্ত চেহারায়,
ঠোঁট দুটো সামান্য ছড়াতেও এখন খুব কষ্ট হয়;

নিজেকে গড়ে তুলতে কেন এত কষ্ট?
এ কি আমারই পারার ভুল?
যে আমি সহ্যক্ষমতা পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করে দেইনি,
যে আমি নিজেকে অসম্ভবের দিকে ঠেলে দিয়েছি?
আমার এইরকম ভয়ানক লাগে আজকাল,
এমনকি বেগুনি জ্যাকেটটাও এখন আর উজ্জ্বলতা তৈরী করতে পারে না।

কৃতজ্ঞতার ব্যাপার হচ্ছে যে এই খারাপ সময়গুলোর ব্যাপ্তি ছিল খুবই কম, কারণ আমার দ্বীনে আসার আরো সঙ্গী ছিল—সান্দ্রা, হানাহ, আর ছিল নতুন মুসলিম, ফিরে আসা মুসলিমরা, যাদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এর মানে হলো আমরা যেদিকে এগোচ্ছিলাম, যা পেছনে ফেলে আসছিলাম, সব ব্যাপারেই আমাদের সমস্যাগুলো এক ছিল। সেকারণেই আমাদের পারস্পরিক সমর্থন ছিল ব্যাপক। অন্য মেয়েদের আশপাশে সমর্থন দেওয়ার মতো এত মানুষ ছিল না। কেউ হয়তো ইসলামে ফিরে এসেছে, তার আশপাশে এমন সব জন্মগত মুসলিম যারা হয়তো পুরনো প্রেমের ব্যথা বোঝে না, গানের সুর কীভাবে টানে তা বোঝে না। এই ফিরে আসাদের কাছে নতুন জীবনযাপনের সাথে মানিয়ে নেওয়া ছিল এক একলা যুদ্ধ, গোপন যুদ্ধ। আর কারো জন্য বদলে যাওয়ার পদক্ষেপগুলো ছিল খুব দ্রুত, অনেক কিছু খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হচ্ছিল, অনেক কিছু খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে নিতে হচ্ছিল। হালিমার সাথে হয়েছিল এমন—

> "দ্বীনে আসার পর দেখলাম অন্যরা কত ভালোভাবে দ্বীন মানছে। আমার নিজের উপর একটা মানসিক চাপ অনুভব করলাম। আমার নিজেকে কম মনে হচ্ছিল খুব। কারণ ঐ দিনগুলোয় বেশিরভাগ ব্যাপারই ছিল 'তুমি এটা করতে পারবে না', 'ওটা করতে পারবে না', 'এই জামা পরতে পারবে না' এসব। চাপ মনে হতো। মুসলিম হওয়ার তিন মাস পর আমি প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলাম, কারণ মনে হচ্ছিল এই ধর্ম নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমাকে নিয়েই আমার সন্দেহ আছে যে আমি এসব মানতে পারবো কি না। এরপর একজন বলল, 'তুমি এরকম করছ কেন? এরকম করতে হবে না।' আর আমি নিজেকে বললাম, আমি আমার নিজের গতিতে আগাব। নিজেই তো এগিয়ে এসেছি। আমার পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে।"

নতুন এক বিশ্বাস

ইসলাম হচ্ছে দ্বীন, এক জীবনব্যবস্থা কারণ এটা ধর্মের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ এক বিশ্বাস, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আমি এবং আমার বন্ধুরা যখন ইসলামে আসি, তখন আমাদের জীবনযাপন বদলে যায়। কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের বিশ্বাসের ধরণও বদলায়। আগে ধার্মিক ছিল, এমন অনেকের জন্যই এটা ছিল তাওহিদ, অর্থাৎ ইসলামি একত্ববাদের দিকে একধাপ এগিয়ে আসা। অন্যদের কাছে, যেমন আমার কাছে এটি ছিল চাঁদে পা রাখার মতো

ব্যাপার। বছরের পর বছর স্কুলে, ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষার সময় হেসে হেসে মজা করে কাটিয়ে দেওয়া আমার হঠাৎ মানতে হচ্ছিল যে নবিরা আসলেই ছিলেন, কুরআন সত্যিই স্রষ্টার কাছ থেকে এসেছে, কুরআন স্বর্গীয় এবং নির্ভুল; রাসূল (সা.) এর কথা সংরক্ষণ করা হয়েছে আর আমাদের সেগুলো মেনে চলতে হবে।

অদেখা জিনিস, অর্থাৎ গায়েবের ব্যাপারটা গ্রহণ করে নেওয়া আমার জন্য বিশেষভাবে কঠিন ছিল। অনেকদিন যাবত আমি স্বর্গ, নরক, ফেরেশতা অথবা জিন নিয়ে ভাবিনি। এটা ছিল বিশ্বাসের একটা ধাপ, যা তখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল। কোনো ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে না উঠার কারণে নিজের কাজকর্মের জন্য দায়ী হওয়া, স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারটা আমার কাছে ভয়ানক লাগল। নিজের বুদ্ধি আর কুরআন, সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের জন্য আমি বিশ্বাস আনতে পেরেছি। বিশ্বাস করতে পেরেছি যে আধ্যাত্মিকতার অদেখা জগৎ আছে, ফেরেশতারা বাস্তব। একজন স্কলার এভাবে বলেছিলেন যে, কুরআন তাঁর সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতার যৌক্তিক প্রমাণ মানবজাতিকে দেয় এবং এই প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই আমরা সেসব বিষয় গ্রহণ করে নিতে পারি যা প্রমাণ করা যায় না। আমার কাছে ব্যাপারটা এমনই ছিল।

কিন্তু আমার এবং অন্য অনেকের জন্যই সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার ছিল ইসলামের যে সারাংশ, আত্মসমর্পণ, তা বাস্তবায়িত করা। মুসলিম হওয়া মানে হলো নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া। অর্থাৎ, অহংবোধ বিদায়, দাম্ভিকতা বিদায়, গর্ব বিদায়। নিজস্ব ইচ্ছাকে অনেক নিচে নামিয়ে আনা।

সারা এখন যে অবস্থানে আছে, সেখানে আসার পথটা ছিল প্রতিরোধে বাঁধাই করা,

> "আমি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকে প্রতিরোধ করছিলাম। আমার জীবন যেভাবে চলছিল, তা নিয়ে আমি ভালো ছিলাম। খুব কর্মঠ ছিলাম আমি, ঘুরাঘুরি করতাম, শিল্পকলায় সিনেমা দেখতাম, গ্যালারিতে ছবি প্রদর্শনী দেখতে যেতাম, সুন্দর সুন্দর রেস্তোঁরায় খেতে যেতাম, ফ্যাশন পছন্দ করতাম। বাবাও আমাকে এরকম দেখতে চাইতেন—বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা, শিক্ষিত হওয়া, নিজের কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়া। বাবাকে আমি ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম, তো আমি সেভাবেই নিজেকে গড়ে তুলছিলাম।"

সারাজীবন নিজের উপর অন্য কারো কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে এসে আমরা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব মেনে নিলাম—আল্লাহ। ব্যাপারটা মাঝে মাঝে আগুনের মতো জ্বলে উঠত। খুব করে কিছু চাওয়ার নিদারুণ যন্ত্রণা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও তুমি জানো যে এটার অনুমতি নেই, ভালো কিছু কারণেই এটা নিষেধ। আল্লাহ বলেছেন—

> "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে

পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরাহ বাক্বারা ২:২১৬)

যদিও এই আয়াতের জিহাদ দিয়ে শারীরিক যুদ্ধের কথা বোঝানো হয়েছে, যা রাসূল (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা করেছেন, তবে তা জিহাদুন নাফসের বেলায়ও প্রযোজ্য, যা হলো মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এটা প্রথম যুদ্ধ, যা সবাইকে করতে হয়, এই যুদ্ধে মানুষ তাঁর নিকৃষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, উচ্চাভিলাষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কেউই বলেনি যে এই যুদ্ধ তাড়াতাড়ি বা সহজেই জয় করা যায়, কিন্তু আমাদের সবাইকেই এই যুদ্ধ করতে হয়। আমি তখনই এই যুদ্ধ শুরু করেছিলাম এবং এখনো করছি। জীবনের প্রতিটা দিনই করে যাব ইনশাআল্লাহ, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

জাহিলিয়্যাহর জীবন থেকে ইসলামে আসা নতুন মুসলিম বা ফিরে আসা মুসলিম, প্রত্যেকের জীবনই কষ্টকর মুহূর্ত আছে, আত্মত্যাগের জায়গা আছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সেই মানুষগুলোর স্মৃতি আছে, যাঁরা প্রথম রাসূল (সা.) এর কাছে ইসলামের বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মূর্তিপূজার এক ভূমিতে, পূর্বপুরুষের নিয়মে চলা এক জায়গায়। তাঁদের ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা মার খেয়েছিলেন, নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, জীবন দিয়েছিলেন কিন্তু নিজেদের বিশ্বাস থেকে সরে আসেননি একটুও।

আমার মাথায় সবসময় যে ঘটনাটা থাকেই, তা হলো রাসূল (সা.) এর একজন মহিলা সাহাবি, সুমাইয়া (রা.) ঘটনা। বেশ কিছুদিন আরবের উত্তপ্ত বালুতে নির্যাতন করার আবু জাহেল রেগে গিয়ে লজ্জাস্থানে বর্শা ছুঁড়ে তাঁকে হত্যা করেছিল, কারণ তিনি ইসলাম ত্যাগ করতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সমস্ত মুসলিম তাঁকে সম্মান করে ইসলামের প্রথম শহীদ হিসেবে। তাঁর সাহস এবং প্রত্যয় আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণা।

আর আমাকে যা খুব অবাক করেছে, স্পর্শ করে গিয়েছে, তা হলো আমি যেই মেয়েদের সাথে কথা বলেছি, তাদের দৃঢ় প্রত্যয়। অশ্রু, মনঃকষ্ট, সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাদের বিশ্বাস। সেই সময়গুলো ফিরে এলেও তারা কখনো শাহাদাহ থেকে সরে দাঁড়াবে না। নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে, দ্বীনকে আঁকড়ে থাকতে, তারা সমস্ত পরীক্ষা, দুর্দশার মধ্য দিয়ে যেতে প্রস্তুত; যাতে দ্বীনের সৌন্দর্য তাদের জীবনকে সুন্দর করে, দেহ, আত্মাকেও, যাতে তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি, ভালোবাসা অর্জন করতে পারে, একদিন তাঁকে দেখতে পারে।

আমাদের সৌন্দর্যের আবরণ

গতকাল আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। বেশিরভাগ মেয়ে যেভাবে বের হয়, সেভাবেই—চুলে নিখুঁত যত্ন, সর্বোচ্চ প্রভাব ফেলার জন্য অনেক বেছে নেওয়া জামা, পারফিউমের মোহনীয় ঘ্রাণ, কোমর দুলিয়ে, হাতের সাথে তাল মিলিয়ে যেন রাস্তার রাণী। এরপর, কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে জীবনে ইসলাম এলো, সবকিছু বদলে দিল। এখন আমরা সেই রাস্তায়ই হাঁটি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো খামে আবৃতা হয়ে, শুধু চোখ দেখা যায়। কীসে আমাদের বদলে দিল এভাবে?

প্রথম পদক্ষেপগুলো

শুরুর দিকে মাথা ঢাকা, ঢিলা জামাকাপড় পরা টনিকের মতো কাজ করেছিল। আমাকে কেমন দেখায়, এই ব্যাপারটার উপর থেকে আমি নিজের নির্ভরতা সরাতে চাইছিলাম আর তা প্রয়োজনও ছিল। আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিলাম, নিজের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, কাজকর্মের শক্তির উপর ভর করে চলার সাহস আমার আছে কি না। এটা কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিল না। যদিও ঐ সময়ে আমি জানতাম না এই ঢেকে চলাফেরা করা আমাকে কোনদিকে নিয়ে যাবে। আমার ধারণা, এখন পর্যন্ত নিজের কর্মপদ্ধতি নিয়ে ভাবলে, আরো ভালো কিন্তু আরো কঠিন বিকল্প আছে জানলে আমি আগের মতো করে চলতে পারতাম না। আমি চোখে পাপড়ি সাজাচ্ছি, অথবা কোন পাজামায় আমাকে মোহনীয় লাগবে, এসব নিয়ে ভাবছি বুঝতে পারার পর আমি নিজের প্রতি সম্মানটা কীভাবে ধরে রাখতে পারি? আসলেই, আমি নিজে নিজেকে বলি, তোমাকে কেমন দেখায়, এর উপর ভর করে চলতে চলতে বড় হয়েছ—নিজের প্রতি তোমার আর কতটুকু সম্মান বাকী আছে? মেয়েদের দেহ মেপে তাদের মূল্যায়ন করার প্রথা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি (একারণে আমি সবসময়ই সুন্দরী প্রতিযোগিতার ঘোর বিরোধী ছিলাম) কিন্তু আমরা নিজেরাই কি নিজেদের মতো করে সেই প্রথার অংশ হয়ে থাকিনি?

পৃথিবীজুড়েই সুন্দরী নারীরা সামাজিকভাবে সফল হয় খুব সহজে, অন্যায্য সুবিধা পেয়ে—নাইটক্লাবের অতিথি, বিনামূল্যে ড্রিংকস, চারপাশে চাটুকারের ক্রমাগত আনাগোনা। নারীশক্তি নিয়ে নতুন বুঝতে শেখা অল্পবয়সী কোনো মেয়ের জন্য এটা দারুণ ব্যাপার। "ঠিক" মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারলে, "ঠিক" জায়গায় যেতে

পারলে মনে হবে দুনিয়াটা যেন তোমার পায়ের তলায়। কিন্তু আমি কি সেই মেয়েগুলোকেই একটা সময় প্রসন্ন, অলস আর বিরক্তিকর হয়ে যেতে দেখিনি? ব্যাপারটা এমন ছিল যে, তারা যখন বুঝে গেছে এই সৌন্দর্য ব্যবহার করে তারা কতদূর যেতে পারবে, তখন যেন আর আত্মোন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করেনি—বুদ্ধিমত্তা, হাস্যরস, জীবনের লক্ষ্য—একটা ব্যক্তিত্ব আর নিজস্ব মনোজগত।

যদিও আমার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের কিছু ছিল না কিন্তু আমি জানতাম আমি একটা পরিবর্তন আনার জন্য প্রস্তুত। আর সে কারণেই মিশর থেকে ফেরার পরদিনই আমি এক টুকরো কাপড় নিয়ে নিজের মাথা ঢেকে ফেলি। আমি যে প্রথমবারের মতো মাথা ঢেকেছিলাম, তা কিন্তু না। জিম্বাবুয়েতে আমাদের ব্যান্ডের হয়ে ঐতিহ্যবাহী কিছু পরিবেশনার সময়ও প্রায়ই মাথা ঢাক হতো; আবার কোনোদিন চুলের অবস্থা খারাপ থাকলেও মাথা ঢেকে বাইরে চলে যেতাম। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। কোনো সাংস্কৃতিক বিবৃতি- "আমি কৃষ্ণাঙ্গ এবং আমি গর্বিত"- এর জন্য মাথা ঢাকিনি। আমি নিজের একটা ছোট্ট অংশকে দমানোর জন্য স্কার্ফ পরেছিলাম; ঢেকে রাখা চলটুকুই হোক না কেন, নিজস্ব একটা গোপনীয় জায়গা তৈরী করার জন্য।

তো ঐদিন ঢেকে চলার ব্যাপারে আমি আমার পরীক্ষামূলক প্রথম পদক্ষেপ নিলাম। ব্যাপারটা ছিল করুণ, স্বীকার করতেই হবে। কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে না, পটিয়ে কথা বলছে না, কিছুই না—আমার নিজেকে অদৃশ্য মনে হলো। দিনের প্রায় অর্ধেক এভাবে গেল। তারপর হঠাৎ আমার ভেতরে একটা চিন্তা আসলো। ভাবলাম, ভালো, তাকিও না আমার দিকে। তোমাদের চোখ দিয়ে আমাকে গিলে খেও না, আমার দেহ মাপার চেষ্টাও কোরো না। আমার দেহ, আমার ব্যাপার।

সেই অনুভুতি আমার এখনো আছে। পর্দা করা নারীরা বারবার নিজেদের এই অনুভূতিরই পুনরাবৃত্তি করে, নিজেদের দেহ তারা শুধু নিজেদের কাছেই ব্যক্তিগত করে রাখে।

রূপান্তরযাত্রা

মাথা ঢাকা শুরুর কয়েক মাস পরই আমি প্রচলিত 'খিমার' পরার সিদ্ধান্ত নিই। খিমার হলো এমন স্কার্ফ যা চুল, ঘাড় ও বুক ঢেকে রাখে। আমার ধারণা এর কারণ ছিল তখনো কিছু ছেলে আমার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিল এই ভেবে যে আমার মাথাঢাকার কাপড়টা আমার কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদের সচেতন পরিচয়, আমি তাদের কাছে তাই সহজলভ্য। আমি সেই মনোযোগটা চাচ্ছিলাম না। আমার মনে হলো মাথা ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যটা ওদের জন্য কাজ করছে না। কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হলো দ্বীন নিয়ে পড়াশুনা করতে করতে আমি আর সান্দ্রা উপলব্ধি করলাম—হিজাব হচ্ছে একটা ধর্মীয় বিধান, আত্মসমর্পণের পূর্ণ অংশ, গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদাত।

"তাকওয়া, আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা এবং ভয় হলো একটা কাজ তুমি কেন করছ আসলে। আল্লাহ আমাদের করতে বলেছেন, এটা আমাদের করতেই হবে। খাওয়া, ঘুমানোর মতো।"

—উম্মে সাফওয়ান।

কুরআনে সূরাহ আন-নূরে মুসলিম মেয়েদের পর্দার কথা বলা হয়েছে-

> "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।" (সূরাহ আন নূর, ২৪:৩১)

আর সুরাহ আহযাবে আল্লাহ বলেন-

> "হে নবি! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরাহ আহযাব, ৩৩:৫৯)

রাসুল (সা.) এর স্ত্রী এবং একজন বিশিষ্ট বিদ্বান আইশা (রা.) সহিহ বুখারির এক হাদিসে বর্ণনা করেছেন যে, মদিনার আনসার নারীরা যখন এই আয়াত শুনে, সাথে সাথে তারা নিজেদের স্কার্ফ দিয়ে মাথা ও চেহারা ঢেকে ফেলে।

হিজাবের কথা কুরআনে, হাদিসে বলা আছে এবং প্রথমদিককার মুসলিমরা তা মেনে চলতেন। এটা বেদুইন সংস্কৃতি থেকে মুসলিমদের মূলধারায় ঢুকে পড়েনি, এটা ইসলামেরই অংশ।

এসব এবং অন্যান্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমরা জানতে পারি যে আমাদের বাইরের পোশাকটিকে কিছু নির্দিষ্ট মানদন্ডে পড়তে হবে। সেগুলো হলো-

- এটা অবশ্যই চেহারা ও হাত ছাড়া সারা শরীর ঢেকে রাখবে।[২]
- এটা এমন আটসাঁট হবে না যাতে পরিধানকারীর দেহের আকৃতি বোঝা যায়।
- কাপড়ের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, এমন স্বচ্ছ হবে না।
- উজ্জ্বল রঙ এর হবে না।

---

[২] এটা নিয়ে কিছু ইখলিতাফ আছে। তবে বর্তমান জমানায় এই ফিতনার সময়ে এই বিষয়ে সবচেয়ে উত্তম মাসআলা হলো চেহারাও ঢেকে রাখা অর্থাৎ নিকাব পরিধান করা— সাজিদ ইসলাম

- ❒ দেখতে পুরুষের জামার মতো হবে না।
- ❒ অমুসলিমদের কাপড়ের সাথে সাদৃশ্য থাকবে না।
- ❒ জমকালো, আকর্ষণীয় হবে না।

মুসলিম পুরুষদের কাপড়ের ব্যাপারেও কিছু নির্দেশনা আছে-

- ❒ নাভি এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ অবশ্যই ঢাকা থাকবে।
- ❒ এ অংশটুকুয় টাইট হবে না।
- ❒ এ অংশটুকুয় এমন কাপড় ব্যবহার করা যাবে না যেন ভেতরে দেখা যায়।
- ❒ মেয়েদের জামার মতো হবে না।
- ❒ অমুসলিমদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য থাকতে পারবে না।
- ❒ জমকালো, আকর্ষণীয় হবে না।
- ❒ সিল্কের কাপড় হবে না।
- ❒ নিচের অংশে পরা কাপড় টাখনুর উপর থাকবে।

এর সাথে আছে, ছেলেরা স্বর্ণ পরতে পারবে না, রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসরণে দাঁড়িকে ছেড়ে দেবে বড় হওয়ার জন্য। অপরদিকে মেয়েরা দাঁড়ি রাখবে এমনটা আশা করা হয়নি।

আমার একদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন আমি আর সান্দ্রা মিলে ক্যাম্পাসে ওর রুমে লেইস লাগানো হিজাব পরে দেখতে চাইছিলাম কেমন লাগে। আমরা খুব সাবধানে তিনকোণা কাপড়ের টুকরোটা মাথার উপরে দিলাম, তারপর সামনে চিবুকের নিচে আনলাম। সেফটি পিন দিয়ে আটকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম আয়নায়। কী হয়েছিল জানো? মনে হয়েছিল যেন আমরা নতুন হিজাব পরছি দেখে আল্লাহ্ আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। আমাদেরকে হাস্যকর, বেখাপ্পা বা সাদামাটা লাগছিল না—সুন্দর লাগছিল। আমার সেই মিশরীয় মহিলার কথা মনে পড়ে গেল, মুচকি হাসলাম। দুজনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম—আলহামদুলিল্লাহ। এরপর গেলাম ক্যাম্পাসেরই অন্যখানে হানাহর সাথে দেখা করতে, আমরা খুবই খুশি।

যাই হোক, আর সবার হিজাব পরে প্রথম বাইরে আসার অভিজ্ঞতা আমার মতো ভালো ছিল না। সারা বলছিল আমাকে—

> "আমি তখন সেন্ট্রাল লন্ডনে, লজ্জা লজ্জা লাগছিল। জ্যাকি স্টাইলে চেহারার চারপাশে টাইট করে স্কার্ফ পরে নিলাম, ঘাড় ঢেকে, সাথে ঢিলাঢালা জামা। আমি খুব সতর্ক ছিলাম ছোট্টো একটা স্কার্ফের জন্য আমার ভিন্নবেশের দিকে কেউ যেন তাকিয়ে না থাকে। বেশ দূর থেকে একটা একটা মেয়েকে দেখলাম যাকে স্কুলে চিনতাম, ও আমার আগের ফ্যাশন করা বেশের সাথে পরিচিত—আমি সত্যিই ওকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম, যতটা সম্ভব। রাস্তা পার হয়ে গেলাম।"

আমার সৌভাগ্য যে এই নতুন চেহারার জন্য যুদ্ধটা আমাকে একা করতে হয়নি। আমার পাশে বোনেরা ছিল যারা সাহস দিত, উৎসাহিত করত। খুব তাড়াতাড়ি আমার অনেকগুলো নানান রঙের হিজাব হয়ে গেল। আমি যা পরতাম তার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে হিজাব পছন্দ করতাম, খুব তাড়াতাড়িই ওসব আমার একটা অংশ হয়ে গেল।

ভেতরে বদল, বাহিরে বদল

নিজেদের ভেতরে একটা পরিবর্তন বোঝার আগে আমাদের কেউই নিজেদের আবৃত করে চলা শুরু করিনি। এই পরিবর্তন আশপাশেও ছিল।

হিজাব আমাদের উপর প্রথম যে প্রভাব ফেলেছিল তা হলো শালীনতা—পোশাকে, আচরণে। সারাজীবন নিজেদের কাপড়-চোপড়, দেহ মানুষকে দেখিয়ে বেড়াবার পর আমাদের হঠাৎ জনসমক্ষে নিজেদের প্রদর্শন করতে লজ্জা লাগতে শুরু করল। একজন মুসলিম, বিশেষ করে মুসলিম নারী হিসেবে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, হিজাব আমাদেরকে তা মনে করিয়ে দিতে লাগল। আমরা ইসলামি আদব-কায়দা মেনে চলার ব্যাপারে আরো সতর্ক হয়ে গেলাম—কারো সাথে অভদ্র আচরণ না করা, মিথ্যা না বলা, দয়ালু, উদার হওয়া। বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে ব্যক্তিগত বা ঘরোয়াভাবে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করছিলাম। পটানো ধরনের কথাবার্তাকে হিজাব পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। যদিও আমরা তখন শুধু হিজাবই পরতাম, তা-ও শরীরের অন্য অংশ বের করে রাখা দিনদিন আমাদের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল। ফলাফলে আমাদের জামা-কাপড়ের ধরণ বদলাতে শুরু করল। টাইট জামার সাথে হিজাব পরাটাকে সঠিক মনে হচ্ছিল না।

আমরা যেখানেই যাই, খুব সতর্ক হয়ে গেলাম যে আমাদেরকে যেন মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, আমরা যে বিশ্বাস ধারণ করি, তার বহিঃপ্রকাশ যেন থাকে। তো আমরা কী করি, কোথায় যাই, এসব কি একজন মুসলিমের জন্য ঠিক কি না এসব নিয়ে নিজেদের প্রশ্ন করা শুরু করলাম। এরপর বুঝলাম, আমরা যে স্টুডেন্টস ইউনিয়নের বারে আড্ডা দিতে যাই, এটাও ঠিক না। হিজাব ছিল ইসলামে আমাদের গর্ব করার মতো এক অনুভূতি। আমাদেরকে অন্যরা মুসলিম হিসেবে চিনতে পারছে, এটা আনন্দের। অন্যদের চোখে বেখাপ্পা লাগলেও বুঝতাম, আল্লাহর চোখে আমাদের সুন্দর লাগছে।

> *"তুমি কে, তোমার পরিচয় কী—হিজাব এগুলোর উত্তর দেয়, যদিও ঐ সময়ে আমি এত বুঝতাম না। কিন্তু এখন আমি সত্যিই সেই পরিচয় পেতে চাই। সমাজের অন্যদের সাথে মিশে যেতে না চেয়ে মুসলিম হিসেবে পরিচয় পেতে চাই।"*
>
> *—ক্লেয়ার*

আমাদের পর্দা করার সিদ্ধান্ত শুধু আমাদেরকেই প্রভাবিত করেনি। বাইরের জগতের কাছে একটা বার্তা পৌঁছাচ্ছিল—'আমাকে বিরক্ত হতে দিতে চাই না, আমাকে কোনো

ধরনের যৌন ইঙ্গিত দেওয়া না হোক। আমার সাথে আচরণের একটা সীমারেখা আছে।' ছেলেরা আমাদের প্রতি আচরণ না বদলিয়ে পারল না। আমাদের চলাফেরা, আমরা কীভাবে হাঁটি এসব ওরা আর দেখত না; আমাদের মাপত না, তুলনা করত না। নারীর দেহ নিয়ে যে ধারণা, তা আর কাজ করছিল না কারণ আমাদের দেহ তো দেখাই যাচ্ছিল না।

এই ব্যাপারটা আমাদের সাথে ছেলেদের আচরণকে এক নতুন মাত্রা দিল, সম্মান ও ভদ্রতার অলংকার পরাল। ওরা না চাইলেও সেটা করছিল। স্পষ্টভাবে আমরা আর কোনো যৌনতানির্দেশক ছিলাম না, আমাদের সাথে ভিন্নরকম ব্যবহার করতে হচ্ছিল।

> *"একজন মুসলিম নারী হিসেবে হিজাবে আমার নিজেকে সুরক্ষিত লাগত, পুরুষেরা আমার দিকে কীভাবে তাকায়, তা থেকে সুরক্ষা দিত। এই বেশে আমার নিজেকে সম্মানিত লাগত, কারণ ওরা আর আমার দিকে তাকিয়ে আমার পশ্চাদ্দেশ বা বুকের আকার নিয়ে মন্তব্য করতে পারছিল না।"*
>
> *— রাবি'আ*

হিজাব এবং তারপর ...

ঐ বছরেরই গ্রীষ্মে, সান্দ্রা জানাল সে আবায়াহ পরা শুরু করতে চায়। পরনের জামার উপর আরেকটা বড় চওড়া গাউন, যাকে আমরা তখন জিলবাব বলতাম। যদিও আল্লাহ কুরআনে মুমিন নারীদের পরনের জামার উপর লম্বা, ঢিলা আরেকটা কাপড়ে নিজেদের আবৃত করতে বলেছেন, তা-ও আমি সান্দ্রার কথায় অবাক হয়েছিলাম, ও কি আসলেই প্রতিদিন ঐ বস্তাটা পরতে চায়? আমি পরতে চাইতাম না, জানালাম ওকে। কিন্তু তা-ও আমি ওর সাথে স্ট্যাটফোর্ডে এক মহিলার কাছে যাই যিনি আমার অন্য বন্ধুদের আবায়াহ বানিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন চমৎকার একজন মানুষ, ব্রিটিশ-পাকিস্তানি। আমি আগেই বলেছি তখনকার প্রচলিত আবায়াহগুলো কী সাংঘাতিক ছিল, কিন্তু তার বানানো আবায়াহ ওগুলোর ধারেকাছেও ছিল না।

ভারী কিন্তু মোটামুটি পাতলা কাপড়ে বানানো তার আবায়াহগুলো ছিল চওড়া, ছড়ানো, বুকের সামনে থেকে আলাদা একটা স্তর এসে সামনে নিচে নেমে যাওয়া। সান্দ্রা যখন নিজেরটা গায়ে দিল, আমি জানতাম আমিও এমন একটা চাই। আসলেই এরপর আমি খুশি খুশি মনে গ্রিন স্ট্রিটের কাপড়ের দোকানগুলোয় ঘুরে ঘুরে নতুন আবায়াহর জন্য কাপড় আর তার সাথে মিলিয়ে হিজাব খুঁজতাম। আমার সংগ্রহে তখন নানান রঙ—বাদামি, কালো, নেভি ব্লু, ক্রিম। ঐ সময়ে আমাদের উন্নতি হয়, আমরা আরো লম্বা হিজাব দিয়ে আবায়াহ পরতে শুরু করি। ঐ হিজাব আমাদের সামনের অংশ অনেকটা ঢেকে রাখত, কাঁধে পিন দিয়ে আটকানো, পেছনে কোণা হয়ে ঝুলে থাকত। আমরা শুরু করার কিছুদিন পরই হানাহও শুরু করে, আমাদের তিনজনকে একসাথে তিনযোদ্ধার মতো দেখাত। আমরা সব জায়গায় একসাথে যেতাম আর

পরামর্শ দিয়ে বেড়াতাম, কোথায় সবচেয়ে ভালো কাপড়টা পাওয়া যাবে, কোথায় সেলাই করানো যাবে।

একটা সাধারণ হিজাব পরার চেয়ে আবায়াহ পরা অনেক ভিন্ন ব্যাপার। অনেকেই বলেন, আবায়াহ পরা হচ্ছে ঈমান বৃদ্ধি বা বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার একটি যৌক্তিক লক্ষণ। কিন্তু তুমি যখন একবার তা পরার সিদ্ধান্ত নেবে, তখন আর পেছনে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না, ফিরে যাওয়ার দরজা তুমি পার করে ফেলেছ বহু আগেই। আর কিছু মানুষের চোখে তুমি তখন অন্যরকম, অন্য মাত্রায় থাকা তুমি। হিজাব পরার পরও যেই ছেলেরা তোমার সাথে কথা বলত, আবায়াহ পরা তুমিটার সাথে কথা বলতে তারা আর স্বস্তিবোধ করবে না। অমুসলিম মেয়েরাও তোমার থেকে দূরে থাকবে। তাদের কাছে তোমাকে একটা নান মনে হবে, মনে হবে তুমি তাদের থেকে যোজন যোজন দূরে।

> *“আবায়াহ পরা শুরুর পর লক্ষ্য করলাম অমুসলিম মেয়েদের সাথে একটা না-বোঝার দেয়াল তৈরী হচ্ছে। আমরা ওদের কাছে অপরিচিত, আর ওদের সমান নই। ওরা জানত না আমরা কেন পর্দা করি, আমরা কি নিজেদের জন্য তা করি নাকি আমাদের সঙ্গীরা আমাদের বাধ্য করে তা করতে। ওরা হয়তো ভাবত আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব অথবা আমরা লাজুক।”*
>
> *—সারা*

আমরা খেয়ালই করলাম না যে নিজেদের মুসলিম পরিচয় তৈরী করতে, তা নিয়ে আরো গভীরে যেতে নিজেরা এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে আমরা কী পরছি না পরছি এসব নিয়ে অন্যরা কী ভাবে, তা ভাবার সময় আমাদের ছিল না। ইসলাম গ্রহণের আগে থেকে যারা আমাকে চিনত, আমার ধারণা এই আবায়াহ পরা তাদের কাছে বার্তা দিয়েছিল যে আমি সত্যি সত্যিই এসব করছি, কোনো নিরীক্ষা চালাচ্ছি না, স্টুডেন্টস ইউনিয়নের আড্ডায়ও হয়তো আমাকে আর দেখা যাবে না।

এরপর আমার পরিচয় হয় হাফ-জিলবাবের সাথে, সোমালি নারীদের মাধ্যমে। নিজেদের গৃহযুদ্ধের শরণার্থী হয়ে ওরা এখানে এসেছিল। প্রতিদিনই ওদের দেখতাম, কাজে গেলে, ক্লাসে, এখানে সেখানে, ওরা নীল, সবুজ, গোলাপি, সরিষা-রং এর হাফ-জিলবাব পরে আছে। একদিন ওদের একজন আমাকে ওরকম একটা বানিয়ে দিতে চাইল। কদিন পরে সে আমার জন্য তা বানিয়ে কলেজে নিয়ে এলো। আমি পরলাম, ছড়ানো, সুন্দর, যেন মেঘের মাঝে আছি, ভীষণ ভালো লেগে গেল জিনিসটা। ভেতরে সহজেই বাতাস ঢুকত, হাঁটার সময় ছড়িয়ে যেত, কাঁধের উপর দিয়ে পরে থাকত, দেহের আকার বোঝা যেত না। আমার তখন ওটাই বেশি ভালো লাগত, যেখানে যেতাম, এটা পরেই যেতাম। আমার ফ্ল্যাটে থাকত সুদানি একটা মেয়ে—হায়াত। ও আর আমি মিলে সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম, পর্দা করার জন্য এটা বেশি উপযোগী।

হায়াত যখন আমাকে ওর বানানো ফুল-জিলবাব দেখাল, আমার আতঙ্কটা আন্দাজ করুন! আমি হতভম্ব হয়ে যাই—এত বড়, এত কালো, বিশাল! ভাগ্যবশত হায়াত ছিল মানসিকভাবে দৃঢ়, সে জানত সে কী করতে চায় আর তাই আমার ওসব কথা তাঁকে ফুল-জিলবাব পরা থেকে সরাতে পারেনি। এর পরপরই আমার মনে হলো, আমাকে তো খারাপ দেখাবে না ওমন পরলে! বিখ্যাত শেষ শব্দগুলো!

আল্লাহ অবশ্যই আমার চেয়ে ভালো জানতেন। তিনি জানতেন কদিন পরই আমার একজন মেয়ের সাথে দেখা হবে যে জিলবাব এবং নিকাব পরত, মানে চেহারা ঢাকত। আল্লাহ জানতেন তার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক হবে এবং এপ্রিলের এক সপ্তাহান্তে ছুটির দিন আমি তার বাসায়ই কাটাব। দুপুরবেলা জুমআর সালাত আদায় করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় সে আমাকে নিকাব পরার কথা জিজ্ঞেস করে। আমি তাকে জানাই আমি কখনোই ওরকম কিছু পরব না। সে আমাকে একবার পরে দেখতে বলল। আমি দেখলাম—কাপড় রাখার স্ট্যান্ডের পাশের ছোট আয়নাটায় তাকিয়ে। চেহারার দুপাশ থেকে কাপড়টুকু ঝুলে সামনে পরে আছে, সহজেই বাতাস ঢুকছে। আমি খুশি হয়ে ওর দিকে ঘুরে তাকালাম, আনন্দে বলে উঠলাম, "আমারও চাই এমন একটা।"

আমার আরেকটা প্রতিজ্ঞা নিরস্ত হলো। তবে জিলবাবের প্রতি সবার এত বিরাগ থাকে না। সারা বলেছিল যে এটা ওর কাছে ছিল দৃঢ় ঈমানের প্রতীক, একটা মানসিক শক্তি, যা সে চাইছিল- 'জিলবাব পরা মেয়েদের যখন দেখলাম, আমার খুব ভালো লাগল। মনে পড়ে, যখন মসজিদে ক্লাসে যেতাম, সারা লন্ডন থেকে মেয়েরা আসত, জিলবাব, নিকাব পরা ওদের দেখে আমার মনে হতো, আমিও যদি এভাবে পর্দা করতে পারতাম! নিজেকে বলতাম, ওরকম পরে চলাফেরা করার জন্য তোমাকে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে হবে।'

যাই হোক, নিকাব নিয়ে আমার কখনোই কোনো সমস্যা ছিল না, অর্থাৎ চেহারা ঢেকে রাখা, যেটাকে পশ্চিমে 'দ্য ভেইল (The veil)' বলা হয়। এই শব্দটার বিরোধী আমি, বিশেষ করে এই শব্দ দিয়ে ওরা যা বোঝায় তার। ওদের অসংখ্য বই আছে এমন নামে- Behind the veil, Beyond the veil, Beneath the veil থেকে শুরু করে Lifting the veil, Tearing the veil, Rage against the veil পর্যন্ত। এগুলো হচ্ছে প্রাচ্যের ভিনদেশী ধারণা, যা আমাদের নিজস্ব নিকাবের দৃশ্য থেকে বহু বহু দূরের। এছাড়াও, 'ভেইল' হচ্ছে এমন একটা শব্দ যা আমি আমার পরিচিত কোনো মুসলিম মেয়ের মুখে শুনিনি কখনো। অতএব, 'ভেইল' বললে সেটাকে নিকাব বলে বুঝতে হবে, ঠিক আছে?

একদম প্রথমদিকের দিনগুলোয়, যখন আমরা কোনোমতে হিজাব পরি, তখন কোথাও খেতে গেলে আমি মাথা ঢাকার কাপড়টা দিয়ে মাঝে মাঝে চেহারা পেঁচিয়ে নিতাম। আমার বন্ধুরা বলত, তুমি একটু বেশি বেশি করছ। আবায়াহ আর লম্বা হিজাব

পরা শুরুর পর আমি আবার মুখ ঢেকে চলাফেরা করার প্রেরণা পেলাম। কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় মুখের নিচের অংশ হিজাব দিয়ে ঢেকে পিন দিয়ে আটকে রাখতাম। এটার জন্য পরিচয় যে গোপন থাকত, এই ব্যাপারটা আমি বেশ উপভোগ করতাম; মানুষ আমার চেহারা দেখতে পারছে না, আমি তাদের কাছে এক রহস্য। একটা সময় আমার খুব অস্বস্তি লাগতে শুরু করল যেকোনো মানুষ, যেকোনো পুরুষই আমার চেহারা দেখতে পারছে, আমার চেহারা দেখার অধিকার ওদের নেই, তা-ও, নিজেদের মতো করে আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকাতে পারছে।

> *"নিকাব জিনিসটা চমৎকার—বাইরের জগৎ থেকে তুমি নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারছ। এটা একটা মানসিক ব্যাপার। তুমি আবৃত, জানো যে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করছেন কারণ তোমার যা করা উচিত, তুমি তা-ই করছ, আর তিনি তোমার উপর খুশি।"*
>
> *—মেই।*

ঐ সময়ে আমার একদিন মনে হলো, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তার সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি অন্তত নিকাব পরতে পারি। এক বিকেলের কথা, এখনো মনে হয় যেন মাত্র গতকালই, হোয়াইটচ্যাপেলের এক ব্যস্ত রাস্তায় আমার মাথায় একের পর এক ঘুরপাক খাচ্ছিল আল্লাহ আমাকে কী কী দিয়েছেন—বিবাহিত জীবন, একজন চমৎকার স্বামী, বছরের পর বছর ধরে নানান বিপদ থেকে সুরক্ষা, দিকনির্দেশনা, ভালো বন্ধু, নিরাপত্তা আর এখন, ভালোবাসা। নিকাবকে আমি অপছন্দ করতাম না, বরং বেশ পছন্দই করতাম। আর এটা পরা আমার জন্য কঠিন কিছু ছিল না, থাকতাম লন্ডনের ইস্ট এন্ডে। আমার স্বামীও সমর্থন দিত।

নিকাব পরা, পর্দা করা আমার কাছে মনে হতো স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার ন্যূনতম কাজ। অন্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাবার সময় আমার ছিল না। ভালো কিছু করার সুযোগ পেয়েছি, আমি সেটা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আর ঐ সময়ে, অন্যেরা কী বলে, অন্য মানুষের মতামত, তারা কীভাবে দেখছে এসব পেছনে পড়ে গেল। আমার চোখ শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর আটকে আছে।

এরপর এক ব্যাংক ছুটির দিনে, যেমন দিনে আমি প্রথমবারের মতো জিলবাব পরে দেখেছিলাম, জুমআর সালাত আদায় করতে মসজিদে যাই। ওখানকার অধিকাংশ নারীই জিলবাব, নিকাব পরে ছিল। খুতবা (বক্তৃতা) চলাকালীন সময়ে আমি হঠাৎ নিজের চারপাশে তাকিয়ে আমার সমস্ত বোনের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তখন আমার খুবই স্বাভাবিক লাগল যে আমরা নিজেদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখব, আড়ালে রাখব। কিছু লোকের কাছে আজব লাগে যে সুন্দরী মেয়েরা কেন নিজেদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখবে, কিন্তু আমার তা লাগত না। বরং ওদের মতো করে ঢেকে থাকতে আমার ভালো লাগত।

কিন্তু আমার একটা নিকাব দরকার ছিল যা আমার স্টাইলের সাথে মানিয়ে যায়। সেকারণে বিন্তুর সাথে কথা বলি, যাতে ও আমাকে ওর নিকাবের মতো একটা নিকাব বানিয়ে দেয়, গোছানো, এক স্তরের পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে। বিন্তু হলো আমার গিনিয়ান বান্ধবী, খুব ভালো বান্ধবী। হাতে বানানো ঐ নিকাবে চেহারা দেখা যেত না, আমার বড় স্কার্ফ, আবায়াহ অথবা জিলবাবের সাথে ওটা পরে আরাম পেতাম। গ্রিন স্ট্রিটের যে কলেজের অফিসে আমি কাজ করতাম, সেখানকার নিয়োগকর্তারা আমাকে আবারও সমর্থন দিল, সাহায্য করল। কাজের সময় নিকাব পরতে আমার কোনো সমস্যা হলো না। কেমন কাজ করছি তা দেখতে বড়কর্তা যখন অফিসে এলো, তখন আমাকে দেখে কী ভেবেছিল ভাবতে আমার ভয় হয়। নিয়োগবইয়ে তারা আমাকে ঢুকে নিয়েছিল আধুনিক জামাকাপড় পরা, সাদা কাপড়ে মাথাঢাকা এক তরুণী হিসেবে, আর সেখানে আমি ফোনকল নিয়ে কাজ করছি হাফ-জিলবাব, নিকাব পরিহিতা হয়ে, ব্যস্ত খুব। কিন্তু বড়কর্তা মহিলাটিকে কৃতিত্ব দিতে হয়, তিনি অবাক হলেও তা প্রকাশ করেননি।

শিক্ষার্থীরা আমাকে দেখে উৎসুক হতো, মুসলিম পুরুষেরা দৃষ্টি নিচু করে লাজুকভঙ্গিতে কথা বলত আর মুসলিম নারীরা আমার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করত। এক দৃঢ়দেহী ইংরেজ লেকচারার প্রায়ই ওখান দিয়ে আসা যাওয়া করত। একদিন আমাকে বলল, 'আপনি এখন পর্দা করছেন!'

তার এই কথায় আমি খুশি হই—এরকম ব্যস্ত একটা পরিবেশে কাজ করাকে আমি পর্দা বলতাম না!

তাকে বললাম, আমি জানি না এটা কী। ব্যাখ্যা করলাম, আমি শুধু নিজেকে আরেকটু ঢেকে চলতে চেয়েছি, চেয়েছি আমার চেহারা আমার ব্যক্তিগত জায়গায় থাকুক, আমি একে উন্মুক্ত করতে চাইছিনা আর। সে বুঝতে পারল, মাথা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে ফিরে গেল।

তো, আমি নিকাব পরা শুরু করলাম। আমার স্বামী খুবই খুশি হলো, অন্য বান্ধবীরাও। কিন্তু অপরিহার্যভাবে সবাই আমার নিকাব মেনে নিয়ে খুশি হতে পারল না। কেউ কেউ ভাবল এটা অপ্রয়োজনীয়, আমি অতিরিক্ত করছি। বিশেষ করে, আমার বান্ধবী হানা আর সান্দ্রা খুব একটা খুশি হলো না। কিন্তু ইস্ট এন্ডের সেই ছোট জগতে আমি স্বস্তিবোধ করছিলাম। কিছু বাঙালি নারী নিকাব পরতেন, আমাকে আর উঁচিয়ে ধরা কালশিটে পড়া বুড়ো আঙুলের মতো দেখাত না। আর এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমি আমার রবের সাথে ঠিক কাজটাই করছিলাম।

অধিকতর আবরণ, ক্ষুদ্রতর প্রদর্শন

নিজেকে আরো আবৃত করার সেই উত্তেজনা আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করব? নিজেকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে অনেক অনুভূতি জড়িয়ে আছে, আল্লাহকে

খুশি করার জন্য আরো কিছু করতে চাওয়া হলো সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি। এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো উচ্চতর ঈমান, গভীরতর বিশ্বাস আর আরো শক্তিশালী আধ্যাত্মিক অঙ্গীকারের ফলাফল। কারো কাছে মনে হতে পারে এটা হিজাবের প্রভাব। আসলে একবার নিজেকে আবৃত করতে শুরু করলে তুমি এই নিয়ে সচেতন হতেই থাকবে। যখন তুমি দেখবে কেউ তোমার চেয়ে বেশি নিজেকে ঢেকে রেখেছে, তুমি হিসাব করতে শুরু করবে যে তুমি কতটুকু ঢাকোনি। তখন তোমার নিজেকে আরো ঢেকে রাখতে ইচ্ছে করবে, নিজের দেহকে আরো ব্যক্তিগত করে সুরক্ষিত করতে ইচ্ছে করবে। হঠাৎ মনে হবে যদি এই আবায়াহ দিয়ে হাত আর পা-ও ঢেকে রাখতে পারতে!

জিলবাব ও নিকাব পরা হলো নিজেকে আরো ঢেকে রাখা এবং কম দেখানোর প্রবণতার প্রভাব। আবায়াহ পরার আগে যদি তোমার নিজের বাহু, পা বের হয়ে থাকা নিয়ে খারাপ লাগে, তাহলে নিজের চেহারা উন্মুক্ত থাকা নিয়েও তোমার ভাবনা আসবে, বিতর্কিতভাবে যেটা মানুষের দেহের সুন্দরতম অংশ। যখন জানবে রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণ, মহিলা সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম চেহারা ঢাকতেন, সেটাও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। নিকাব পরা নিয়ে যে বাধা-বিপত্তি আর নিষেধ আসবে, তুমিই সবকিছুর প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়াবে, ওগুলোকে ভাসিয়ে দেবে কারণ ঈমান যখন উপরে উঠে, তখন মানুষ শুধু তাঁর রবকে খুশি করা আর পুরস্কারের কথাই চিন্তা করে।

হিজাব—স্বাধীনতা নাকি চাপিয়ে দেওয়া?

ব্যাপারটা কেমন যে আমরা যা আকাঙ্ক্ষা করি, তা অনেকের কাছেই অত্যাচার মনে হয়? হিজাব আবার কীভাবে স্বাধীনতা হয়?

এই সমাজের একজন নারী হিসেবে, অনেকেই কিছু নির্দিষ্ট মানসিকতা নিয়ে বড় হতে থাকে—বাহিরের বেশ দেখে মানুষ তার ব্যাপারে ধারণা করবে, ফ্যাশন ট্রেন্ড একজনের স্টাইল, দেহের আকৃতি ঠিক করে দেবে, পুরুষেরা তার দিকে মনোযোগ দেবে অথবা দেবে না ইত্যাদি। নারী এই সবকিছুই উপভোগ করে, ধরে নেয় এগুলোই তার নারীত্বের অনিবার্য অংশ। আমরা অনেকেই এভাবেই ভেবেছি। তারপর একটা সময় আসে, যখন সমস্ত আকর্ষণ কমতে শুরু করে—সেজেগুজে থাকা, সবচেয়ে নতুন জামাটার জন্য শোরুমে দৌড়ে যাওয়াটা অনর্থক মনে হতে থাকে, দেহের গড়ন ঠিক রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা নিরর্থক লাগা শুরু হয়, যা আসলেই নিরর্থক। তুমি ভাবতে শুরু করো, আমি কি আমার এই দেহের চেয়ে বেশি কিছুই না? এই প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসলে কী হবে শেষে? বয়স, অসুস্থতা বা গর্ভধারণের জন্য আমাকে দেখতে অন্যরকম লাগলে কেমন হবে তারপর? হিজাব এইসব চিন্তাভাবনা, মানসিকতা থেকেই নারিকে মুক্তি দেয়, স্বাধীন রাখে।

সোনার খাঁচার পাখিরা

আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে তাদের দেহ, পোশাক-আশাক দিয়ে এমনভাবে বিচার করা হয়, যা ছেলেদেরকে করা হয় না। কিন্তু একজন আবৃতা মেয়েকে সেভাবে বিচার করা যায় না কারণ তার ব্যক্তিগত কিছুই বাইরে থেকে দেখা যায় না। সৌন্দর্যকে সে সমীকরণের বাইরে ফেলে দিয়েছে। নারীদেহ নিয়ে সমাজের ক্রমাগত পরিবর্তনীয় চাহিদা অনুযায়ী জীবন যাপন করার কোনো প্রয়োজনই সে অনুভব করে না। নিজেকে সবচেয়ে সুন্দরী দেখানোর চাপ থেকে সে মুক্ত থাকে। অতএব, তার ব্যাপারে কিছু বলতে হলে দেখতে হবে সে নিজেকে আসলে কীভাবে উপস্থাপন করছে—কথা, কাজ, চিন্তা দিয়ে। এই ব্যাপারেই ঘানিয়াহ আমাকে বলেছিল যে, তুমি কোনো চাকরির জন্য গেলে, সামনে রাখা কাগজ (সিভি) আর তুমি কী বলছ, এছাড়া কোনোকিছু দিয়েই তারা তোমাকে বিচার করতে পারবে না; সুতরাং তুমি জানো যে তাদের সিদ্ধান্ত তোমার সৌন্দর্যের উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়নি। এটাই তো স্বাধীনতা!"

> *"আমি কে তা আমার ছবির উপর নির্ভর করে না। ছবি দিয়ে নিজেকে বিচার করা হোক, আমি আর তা চাই না।"*

—সারা

মাংসের বাজার

ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকাবে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ আমরা সুন্দর। অনেক মেয়েই এটাকে মজা হিসেবে নেয়। কিন্তু এমন সময় আছে, যখন ব্যাপারটা সত্যিই বিরক্তিকর এবং অপ্রয়োজনীয়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, শিস বাজানো, মন্তব্য করা, ফোন-নাম্বার চাওয়া, পটানো বা মজা করা আর যৌন হয়রানির মাঝখানে সরু একটা রেখা আছে।

> *"মাঝে মাঝে আমি দেখি একটা ছেলে একটা মেয়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়, মেয়েটার পা বা অন্যকিছুর দিকে খেয়াল করে তাকিয়ে থাকে। আমার সাথে কখনো এমন হোক—ব্যাপারটা আমি ঘৃনা করি। আমার মোটেও ভালো লাগে না, এটা কোনো মজা না। আমি বুঝিনা মেয়েদের কীভাবে এটা ভালো লাগে! বরং এটা চমৎকার যে একজন মুসলিম পুরুষ আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় চোখ নামিয়ে ফেলে। আমার পা দেখে শিস বাজানোর চেয়ে এটা বেশি সম্মানের।"*

—রাবি'আ

পর্দা করা একজন মেয়ের সাথে এসব করা যায় না, সুযোগ নেই। ছেলেদের এসবে তার কোনো আগ্রহ নেই—নিজের দেহের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। সে-ই নিয়ন্ত্রণ করে তাকে তুমি কতটুকু দেখতে পারবে।

সুন্দর শরীর

একজন নারী, একজন মেয়ে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া তাদের উপর ভীষণ চাপের, এটাই নানারকম সংকটের জন্ম দেয়। খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম, অনেক বেশি খাওয়া অথবা খুব কম খাওয়া এই চাপ থেকেই অভ্যাসে আসে। নিজের দেহ নিয়ে অসন্তুষ্টি তৈরী করে আত্মবিশ্বাসের অভাব আর দেহের আকৃতি নিয়ে নানারকম দুশ্চিন্তা।

একজন পর্দাবৃতা নারী যেহেতু তার শারীরিক সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে না, অতএব, সে নিজেকে এই দিয়ে সংজ্ঞায়িতও করে না। ফলাফল, নিজেকে নিয়ে তার ভাবনা সৌন্দর্য দিয়ে বাঁধা পড়ে না। সুতরাং, বাহ্যিক রূপ এবং এই সম্পর্কিত সমস্ত উদ্বেগ থেকে সে থাকে মুক্ত।

> *"প্রথমদিকে আমার মনে হয়েছিল আমি যেন নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছি, নিজেকে অপ্রকাশিত রাখতে পারছি। মানে আমি বোঝাতে চাইছি যে আমার দেহের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো আমার মতো করে ঢেকে রাখতে পারছি, আমি চাই না সেগুলো অন্যদের জন্য প্রকাশিত থাকুক। আমি চেয়েছি আমার মতো করে সেই অংশগুলো আড়ালে রাখতে, শুধু যাকে আমি চাই, তার কাছ থেকে ছাড়া।"*
>
> *—হাযার।*

ভেতরের সৌন্দর্য

আমাদের সমাজে নারীকে খুব কৌশলে কিছু বাহ্যিক ব্যাপারে মনোযোগী করে ফেলা হয়—সৌন্দর্য, বাহ্যিক রূপ, আকর্ষণীয়তা আর এই সম্পর্কিত শূন্যতায় আত্মমুগ্ধ থাকা। যেখানে প্রচুর মানুষ এসব বাইরের ব্যাপার নিয়ে মগ্ন, ইসলাম নারীকে শেখায় ভেতরের সৌন্দর্য অনুশীলন করতে, যা তার ত্বকের রঙ এর চেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ—তার চরিত্র, আচরণ, নৈতিকতা। এইভাবে সে স্বাধীন থাকে, নিজের সময় আর শক্তিকে বাহ্যিক রূপের পেছনে খরচ করা থেকে বাঁচতে পারে। কারণ সে জানে তার হৃদয়ে যা আছে, শুধু তা-ই তাকে সুন্দর করে তুলবে।

কখন ব্যাপারটা স্বাধীনতা না?

প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন কেমন করে এই বোরকা, নিকাব পরাটা স্বাধীনতা হয়? প্রতিদিন মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকার মধ্যে কি কোনোই সমস্যা নেই?

> *"খুব যখন গরম থাকে, তখন দুঃসহ লাগে। ঐ মুহূর্তে কেউই বলবে না যে এটা তখনো স্বাধীনতা। তখন কী মনে হয় জানো? এসব খুলে বসে পড়ি, রোদ সরাসরি গায়ে লাগুক।"*
>
> *—হাযার*

সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো, "তোমার গরম লাগে না?" পুরোপুরি হিজাব মেনে চলার সবচেয়ে বড় সমস্যা এই ব্যাপারটাই, আরামের অভাব, প্রচন্ড তাপ। আমার মনে পড়ে, একজন হিজাবী নারীকে নিয়ে এক লেখায় পড়েছিলাম, তাকেও এই প্রশ্নই করা হয়েছিল। উত্তর ছিল স্পষ্ট—জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশি উত্তপ্ত।

স্পষ্ট, কঠোর উত্তর হয়তো, কিন্তু একেবারে জুতসই। আমার শুধু মনে হয় আমাকেও যখন কেউ এই প্রশ্ন করে, এভাবে উত্তর দেওয়ার সাহসটা যদি আমার থাকত!

সৌদী আরব এবং অন্যান্য যেসব দেশে মেয়েরা এমন পোশাক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পরে, ওদের ওখানে তো ইংল্যান্ডের চেয়েও অনেক অনেক বেশি গরম। তা-ও কালো কাপড়ের নিচে আমাদের মাঝে মাঝে গরম লাগত। আমি সবসময় বোরকার নিচে পাতলা সুতি কাপড়ের জামা পরে এই সমস্যার সমাধান করতাম। জিলবাব আর হিজাবের কাপড়টাও দেখেশুনে পাতলা আরামদায়ক কি না, বুঝে কিনতাম। যেন কাপড়টা তেমন অনুভূত না হয়।

> *"শুরুতে আমার খুব ঝামেলা লাগত, বোরকা সামলে গাড়িতে উঠতে, নামতে। যুদ্ধের মতো ছিল এই অতিরিক্ত কাপড়ের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াটা।"*
>
> *—মেই।*

হিজাব পরে চলাফেরার আরেকটা সমস্যা হলো অমুসলিমদের প্রতিক্রিয়া। আমি যখন নিজের কৃষ্ণাঙ্গ পরিচয় থেকে বেরিয়ে এসে একজন মুসলিম নারীর মতো পোশাক পরা শুরু করলাম, হঠাৎ দেখলাম মানুষজন আমাকে 'মুসলিম নারী' বলছে—ইসলাম, মুসলিম সম্পর্কে তাদের নিজেদের যে ধারণা, সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে। নিজের ব্যাপারে এমন শোনাটা আমার কাছে অদ্ভুত ছিল। কারণ এই নামের পেছনের ধারণা আর চিত্রগুলো আমি জানতাম। আর এ-ও জানতাম, আমি ওসবের কিছুই বহন করি না, কখনো ওরকম কিছু করার পরিকল্পনাও নেই। হিজাব, জিলবাব, বিশেষ করে নিকাব সাধারণ মানুষের কাছ থেকে একধরনের উগ্র প্রতিক্রিয়া পায়। যেন একজন নিকাব পরার সাথে সাথে মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। আমি জানি, নিকাব এই সমাজের জন্য একটা ধাক্কার মতো। এখানে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য একদম খোলামেলা—তার জাত, বর্ণ, বয়স, সৌন্দর্য। কিন্তু নিকাব এসবের কিছুই জানতে দেয় না। আমাদের দেখে একজন অমুসলিম আসলে কী ভাবে? অতীতে চলে যাওয়া একটা সময়ের ধ্বংসাবশেষ? স্বাধীন দুনিয়ায় অত্যাচারিত হওয়ার প্রতীক? ধর্মান্ধ? সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী সহায়তাকারী? বহিরাগত, অভিবাসী অথবা অনুমতি ছাড়াই ঢুকে পড়া কেউ?

এই আচরণ হাযারের কাছে খুবই পীড়াদায়ক ছিল। ইসলামে আসার আগে সে ছিল অডিও জগতের বেশ গুরুত্বপূর্ণ একজন। সে বলছিল-

"এর আগে, আমি ছিলাম এমন একজন যার সাথে তারা পরিচিত হতে চাইত, যার সাথে পরিচিত হওয়াটা গুরুত্বপুর্ণ ছিল। ব্যাপারতা এমন ছিল যে, 'আমি যদি তাকে চিনি তাহলে একটা ভালো অবস্থানে যেতে পারব, অমুক অডিওর কাজটা পাব যদি ওকে চিনি, ওর সাথে থাকলে অমুক পার্টিটায় যেতে পারব'। অথচ হঠাৎ করে আমি হয়ে গেলাম সমাজচ্যুত। আমি প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত হলাম রাতারাতি। ভাবলাম, আমি যদি এসব বাদ দেই, তাহলেই ওরা আবার আমার কাছে দৌড়ে আসবে। এসবে বিরক্ত হলাম খুব।"

একবার তুমি নিকাব দিয়ে চেহারা ঢাকো, তোমাকে আর ব্যক্তিমানুষ হিসবে তারা দেখবে না। তুমি তখন একটা প্রতীক। এরকম বলছি কারণ মানুষ তখন তোমাকে নিয়ে তোমার সামনেই কথা বলবে, অপমান করবে, নাক-মুখ দেখা গেলে যেটা তারা কখনোই করত না। অনেক মানুষ আর তোমার চোখে তাকিয়ে যোগাযোগ করবে না, বন্ধুতার হাই-হ্যালো বলবে না, গল্প করবে না। আমার একটা অংশ বুঝতে পারে কেন আমি তাদের সবার চেয়ে আলাদা, আমি ওদের ভুল বুঝলেই বা কী, ওদেরকে না বুঝলেই বা কী, ওরা আমার সাথে কী নিয়ে কথা বলবে আর সেখানে কী-ই বা বলার আছে।

আমার মনে পড়ে, এমন কতবারই তো হয়েছে আমি মানুষের চোখের দিকে তাকাইনি প্রত্যাখ্যাত হবার ভয়ে, বোকামি করে বসি কি না এই ভয়ে মুখ বন্ধ রেখেছি কত! এরকম করলে নিকাব পরা তোমার জন্য খুবই নিঃসঙ্গ একটা অভিজ্ঞতা। রাস্তাঘাটে অপরিচিত কারো সাথেই আর ভালো সম্পর্ক হবে না। এটা সম্পূর্ণই তোমার ব্যাপার—তুমি এই ঠান্ডা সম্পর্ক ভাঙবে কি না! তুমি কী হতে চাও, কী করতে চাও; তা হতে এবং তা করতে আলাদা সাহস লাগে। পরিচিত মানুষদের সাথে থাকলে হয়তো নিজেকে নিয়ে অন্যদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া যায়, বাইরে ঘোরাফেরার অভ্যাসটা বদলানো যায়, এককালের সাহসী নিজেকে ভীতু বানানো যায়, নিজেকে খোলসে ঢুকিয়ে ফেলা যায়। ব্যাপারটা এমন যে এই সমাজে থাকলে তোমার প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকতে হবে অনেক।

"হিজাব তো আমার দেহের অংশ না। এটা তো আমার ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে না কোনোভাবেই। কারণ আমি যা করতে চাই, তা করতে পারি, যেখানে যেতে চাই সেখানে যেতে পারি। অমুসলিমদের সাথেও বাইরে বেরুতে পারি যেখানে সবাই জিন্স পরে আছে। আমি মোটেও পরাজিত কেউ নই।"

—হাযার

আমার প্রায়ই মনে হয় যে একজন পর্দাবৃতা মুসলিম নারী হিসেবে কিছু আচরণকে মুখোমুখি মোকাবেলা করা উচিত, অনেক ভুল ধারনা ভেঙে দেওয়া উচিত। আমি জানি মানুষ আমাকে ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে দেখলে অবাক হয়। যখন আমি কোনো মতামত প্রকাশ করি, বা তাদের সন্তানের সাথে আদর করে কথা বলি।

ওরা অবাক হয় যখন দেখে রাস্তা আটকে আমিও গাড়ি চালাতে পারি, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া, আমি কাজ করি, আমি ভ্রমণ করতে পছন্দ করি—মুসলিম নারী হিসেবে ওরা যে গতানুগতিক ছবি নিজেদের মাথায় এঁকে রেখেছে, তার সাথে আমার ছবি মেলে না। মাঝে মাঝে চাপও মনে হয়, গাড়িতে, দোকানে টাকা-পয়সা গুনতে অথবা আমার সন্তানের সাথে আচরণে যেন কোনো ভুল না করে বসি। লোকে যেন মনে না করে যে আমি পর্দা করি এবং সেকারণে আমি অযোগ্য।

আশপাশের বোনদের আমি প্রায়ই এই নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি যখন অপরিচিত কারো সাথে কথা বলতে যাই, তার ধারণা খন্ডনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, খুশিমনেই কথা হয়। আমার ভালো লাগে, মনে হয় সন্দেহ ও কুসংস্কারের দেয়ালে গর্ত করে দিয়ে এসেছি, ভাববার মতো অন্তত একটা উপকরণ অপরিচিতাকে দিয়ে এসেছি। মাথা উঁচু করে হাঁটার, আত্মবিশ্বাসী হয়ে কথা বলার আর চোখ দিয়ে আনন্দ প্রকাশের কারণ খুঁজি আমি—যাতে করে তারা নিজস্ব ধারণা থেকে বেরিয়ে আসে, ব্যক্তি আমাকে নিয়ে কথা বলে এবং এর সাথে নিকাবকে জড়িয়ে না ফেলে।

> *"আমার ছেলে ঘোড়া খুব ভালোবাসে, ওকে নিয়ে ফ্রান্সে একটা ঘোড়া প্রদর্শনীতে যাওয়ার কথা আমি কখনো ভুলব না। এটা টেক্সাসেও হতে পারত। ওখানে সবাই চামড়ার পাজামা আর রাখালবালকের হ্যাট পরেছিল। পরিবারকে বললাম, একদম স্বাভাবিক আচরণ করো। সবাই খুবই ভালো আচরণ করল আমাদের সাথে।"*
>
> *—হাযার*

মাঝে মাঝে কিছু মানুষ আমাকে অবাক করে, তারা আগে থেকে গৎবাঁধা কিছু ভেবে রাখে না। আমার মহিলা ডাক্তারের কথা মনে আছে। একবার পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পেয়ে তার কাছে যাই। সে জিজ্ঞেস করল কীভাবে ব্যথা পেয়েছি। উত্তর দিলাম—কিকবক্সিং খেলছিলাম। আমার স্বামীর উপর চালাতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে বসেছি।

শুনে সে মুচকি হাসল। আমি তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করলাম—কালো কাপড় পরা এক মহিলা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে, শুয়ে শুয়ে কিকবক্সিং খেলার গল্প বলছে। এসব ভেবে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার মতো পোশাক পরা একজনের কাছ থেকে এমন গল্প শুনতে আপনার কি অদ্ভুত লেগেছে?"

সে আগের মতো হাসল, মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, আমার পেশায় মানুষের ব্যাপারে আগে থেকে ধারণা করার শিক্ষাটা দেওয়া হয় না।

বোঝা যাচ্ছে যে নিকাব পরে চলাটা খুব একটা সহজ কাজ না। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে যে, তুমি তাহলে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন?

আমি অনেককেই এই প্রশ্নটা করেছি, বলেছি এমন কোনো অর্থপূর্ণ উত্তর দিতে যা সবসময়ের জন্য কাজ করবে।

হাযার উত্তর দিল,

> "আমার ধর্মবিশ্বাসের জন্য ছেড়ে দেই না। অন্যের কথা, প্রতিক্রিয়া বা রোদের তাপে যদি ছেড়ে দেই, তাহলে যেসব কারণে হিজাব পরেছিলাম, তা অনর্থক হয়ে যায়। আমার কাজটা হালকা হয়ে যায় তখন। পরিপূর্ণ কিছু চাইলে তার সাথে লেগে থাকতে হয়, হাল ছেড়ে দিলে হয় না।"

এছাড়া আমার সাথে এমনটা কখনো হয়নি যে, নিকাব পরা বা দ্বীনের কোনোকিছু নিয়ে এই কারণে কষ্ট সহ্য করা, একটা অনৈতিক পরিবেশে নীতি ধরে রেখে কাজ করার মতো। বর্ণবৈষম্যের দিনগুলোয় এমন অনেক কোম্পানি ছিল যারা সাউথ আফ্রিকার সাথে অথবা সাউথ আফ্রিকার সাথে সম্পর্ক আছে এমন ফার্মের সাথে কাজ করতে চায়নি। সিনিকরা ওদের সিদ্ধান্তে উপহাস করেছে। যে ব্যবসা ওরা মিস করে ফেলছে, তার উদাহরণ টেনে কথা বলেছে, আরো অনেক বানানো তর্ক করেছে এই বয়কট পরিত্যাজ্য করাকে সমর্থন দিয়ে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, বেশিরভাগ বিবেকবান মানুষই এই ধারণার সাথে একমত—পাউন্ড, ডলারের কাছে স্বাধীন, বৈষম্যহীন একটা দক্ষিণ আফ্রিকার আদর্শকে বিক্রি করে দেওয়া না হোক। একজন ভেজিটেরিয়ান যখন স্টেক খাওয়ার ইচ্ছাপূরণ করতে পারে না, একজন ভেগান যখন আইসক্রিম খেতে পারেনা, অথবা অরগানিক খাবার খাওয়া কেউ যখন তা কিনতে বেশি টাকা খরচ করে, তখন কারো মায়া হয় না—এটা অদ্ভূত। নিজের নীতিতে অটুট থাকার জন্য তাদের সম্মান করা হয়। সবাই ভাবে যে তারা একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেজন্য তাদের তারিফ করা হয়।

> *"আমি মনে করি এর পেছনে যে বিশ্বাস ও আস্থা আছে, তা এইসব ছোট ছোট সমস্যার চেয়ে অনেক বড়। সবকিছুরই কোনো না কোনো সমস্যা থাকে। জিলবাব আর নিকাব তোমার একটা অংশ, এমন তো না যেন প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এর কথা ভাবতে হচ্ছে। এটা তোমার দ্বিতীয় পরিচয়ের মতো—একে ছেড়ে দেওয়া বা উঠিয়ে ফেলার চিন্তাটা আজব"*
>
> *—রা'বিয়া*

একজন মুসলিম নারী, যে এভাবে পোশাক পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে তবুও নিজের নীতির কারণে বেশ সমস্যায় পড়ে, সবজায়গায় সমান সম্মানটা সে পায় না। ধরে নেওয়া হয় যে এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। কখনো কখনো তার জন্য কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু সে ছাড়ে না। বৈপরীত্যের বিরুদ্ধে তার অবস্থান থাকে দৃঢ়, পরীক্ষাগুলোয় ধৈর্যশীল। একজন পরিবেশবাদী আর তার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। আহা, লোকে যদি তার ভেতরের মনটা জেনে তাকে সম্মান দিত!

আরব রাজকন্যা

একজন মুসলিম নারী কেন পর্দা করে এই নিয়ে মানুষ সব ধরণের ধারণা করে ফেলে। আমরা হয়তো খুব সুন্দর, অথবা নরকের মতো কুৎসিত। যারা ভাবে আমরা খুব সুন্দর তাই নিজেদের ঢেকে রাখি, তাদের কাছে আমরা অদ্ভুত, রহস্যময়ী, তাদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ। এসব লোকের চিন্তাভাবনায় কোনো লাগাম নেই। পূর্বাঞ্চলের যৌনাবেদনময়ী নারী আর হারেমের কল্পনা করে ফেলে তারা। ওরা জানলে হতাশ হবে যে পর্দাবৃতা যেই নারীদের তারা আরব রাজকন্যা হিসেবে দেখে, তারা আসলে পিমলিকোতে জন্ম নেওয়া জ্যানে স্মিথই। আমরা বহিরাগত কেউ না, জাদুর কার্পেটে করে মরুভূমি থেকে উড়ে আসা যৌন আবেদনময়ী কোনো নারীও না। যদিও তাদের এই ধারণাকে আমি অন্য একটা ধারণার চেয়ে অগ্রাধিকার দেই। তবে তার কারণও আছে। যারা মনে করে আমরা কুৎসিত, মোটা বা নিজেদের দেহ নিয়ে হীনম্মন্য বলে নিজেদের ঢেকে রাখি, তাদের কাছে আমরা হচ্ছি ব্যঙ্গ-তামাশা করার বস্তু। নিনজা বলে গালি দেওয়ার জিনিস। এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটে থুথু মেরে, অথবা শারীরিকভাবে আঘাত করে। আমার মনে আছে, একদিন আমি আর উম্মে তাসনিম বাড়ি ফিরছিলাম, সাথে ট্রলিতে বাচ্চা ছিল। হঠাৎ কিছু বাচ্চা আমাদের দিকে ডিম ছুঁড়ে মারল। ডিমটা এসে ট্রলির হুডে লেগেছিল বলে রক্ষা, নইলে আমার বাচ্চার চেহারা আজ যেমন, মোটেও তেমন থাকত না। ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম আমি।

হিজাব পরিহিতা প্রায় সব মেয়েরই আসলে এমন গল্প আছে। তবে কিছু ঘটনার পর তারা এসবে আর পাত্তা দেয় না। অপরাধীদের বেশিরভাগই অল্পবয়সী। অন্যদের মতো তাদেরও একই অবস্থা। তারা যা জানে না, তা ভয় পায়।

এসব শত্রুতার সাথে সাথে ঘরের বাইরে আমরা বেশ আগ্রহের মুখোমুখিও হই। বেশিরভাগ অমুসলিমই কখনো কোনো মুসলিম নারীর সাথে পরিচিত হয়নি বা কথা বলেনি। বিশেষ করে আমাদের মতো জামা-কাপড় পরা বা আমাদের মতো জীবনযাপন করা কারো সাথে। সুতরাং বাইরের জগতে এই প্রশ্নগুলো থাকেই, এসব ঝুলন্ত কাপড়চোপড়ের আমরা আসলে কেমন? আমরা কি কখনো এগুলো খুলি? আমরা কি ওদের মতোই কেউ? অনেকেই অবাক হয় ভাবে এই ঘোমটার ভেতরে একটা উঁকি মারলে ব্যাপারটা কী দেখা যেত?

পর্দার অন্তরালে

আমাদের চারপাশ প্রতিদিন অসম্ভব রকমের সুন্দরী নারীদের ছবিতে ভেসে যায় যারা আমাদের এই বার্তা দেয় যে—একটা নতুন ডিজাইনের জামা, ক্র্যাশ ডায়েট বা এক বোতল পারঅক্সাইডে আমরা জীবনের সুখ কুঁজে পাব, আমরা এসবের যোগ্য। ক্যাটওয়াকের মঞ্চ থেকে বড় রাস্তা, টেলিভিশন থেকে ইন্টারনেট, সব জায়গায় চুলে-দেহে পরিবর্তন আনা সেলেব্রিটিরা আমাদের কাছে বিক্রি হয়, আদর্শ নারীর প্রতিরূপ

হিসেবে। এইরকম একটা সমাজ, যেখানে তরুণী থেকে মধ্যবয়েসি, প্রত্যেক নারীই লেটেস্ট ট্রেন্ডে চলার প্রেশারে দিনযাপন করে, সেখানে একজন মুসলিম নারী কেমন করে মাথা থেকে পা ঢেকে নিজেকে এই ফ্যাশন শো থেকে সরিয়ে রাখে? নিজেদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখা এই নারীদের কি ফ্যাশন, ওজন, বলিরেখা নিয়ে ফোবিয়া আছে? নাকি ওরা প্রশংসা করা চাহুনি থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে এইজন্য যে নিজেদের প্রকাশ করার অন্য উপায় তাদের আছে যা সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে না?

হিজাবের ব্যাপারে প্রচলিত ধারণার একটি হলো এটা একজন নারীকে যৌন আবেদনময়ী থেকে অনাকর্ষণীয়, রুচিহীনায় পরিণত করে। কেউ কেউ ভাবে হিজাব একজন নারীকে তার নারীত্ব থেকে সরিয়ে ফেলে, তার নিজেকে সাজাবার, প্রকাশ করবার অধিকার কেড়ে নেয়, তাকে আলুথালু বেশে উপস্থাপন করে যেন এমন এক প্রজাপতি—যে তার ডানাগুলো হারিয়ে ফেলেছে।

আমি যখন প্রথম পর্দা করা শুরু করি, আমার অমুসলিম বন্ধুরা কোনোভাবেই বুঝতে পারত না যে কেন আমি তখনো হেয়ারস্টাইল করতে চাই, মেকআপ বা জামা-কাপড় কিনি। "কী লাভ এসব কিনে? ঢেকেই তো রাখবে।"

ছুঁড়ে ফেলা হল্টার-নেক

জন্মগত মুসলিম হোক আর নওমুসলিম, দ্বীনের পথে নতুন আসা প্রায় প্রত্যেক নারীই তার দ্বীনে আসার আগের জামাকাপড় ফেলে দেয়। এরকম করার পেছনে কোনো আইন নেই, হাদিস নেই, তবুও তারা তাদের হটপ্যান্ট, স্টিলেটো ফেলে দেয়। শুধুমাত্র পার্টিজামাগুলোই না, যেকোনো ফ্যাশনেবল জামার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে, ওগুলো স্থানীয় চ্যারিটিতে চলে যায়। যেন এক মন্ত্রবলে, জাহিলিয়্যাহর সময়ের সমস্ত স্মৃতি বিশোধন প্রক্রিয়া।

> *"আমার ধারণা আমরা ভাবতাম যে দ্বীনে এসেছি মানে ষাট বছর বয়স্কার মতো আচরণ করতে হবে। ফেলে দাও ওসব জামা কাপড়। অন্যদের মতো আমিও একই কাজ করেছিলাম"*
>
> *—জামিলা*

একজন নতুন মুসলিমের ভবঘুরে বেশ

স্বীকার করতেই হবে, পর্দা করতে শুরু করা বেশ প্রভাবিত করছিল যে ভেতরে আমরা কী পরব। আমরা যেন ভাবতাম একজন মুসলিম নারী হিসেবে আমাদের জামা কাপড় হওয়া উচিত লম্বা, ঢিলে, অনুজ্জ্বল, এক কথায় এলোমেলো। আমি একে বলি—নতুন মুসলিমের ভবঘুরে বেশ। এর সংজ্ঞা হলো—হিজাব, আবায়া, জিলবাবের নিচে স্টাইলের অভাব, ইসলামের আসার আগে তার বেশের পুরো উল্টো। এর মধ্যে আছে ম্যাচিং না করে কাপড় পরা, জামাইয়ের ট্র্যাকস্যুট বা অন্য জামা পরে ঘুরা যেগুলো ঠিকমতো গায়ে লাগেও না।

এরকম ধারণা হতে পারে যে নতুন মুসলিমদের এই ভবঘুরে বেশ পশ্চিমাদের মধ্যে বেশি, যেটা সমস্যার মূল হতে পারে। আগে যেখানে আমরা একটা জামা কিনতাম এই ভেবে যে এটা কতটুকু যৌনাবেদনপূর্ণ, সেখানে ইসলাম আমাদের এখন শালীন হতে শেখায়। মুসলিমদের উপর আদেশ আছে শালীন থাকার, এমনকি অন্য নারীদের সামনেও হল্টার নেক বা মিনিস্কার্ট পরা যায় না। সুতরাং আমাদের আগের অনেক জামা-ই এখন আর মুসলিম মেয়েদের অনুষ্ঠানেও পরা হয় না।

কিন্তু, বিয়ে করার পর আমরা নিজেদের এই সিধান্তের জন্য বেশ আফসোস করেছি। হালাল উপায়ে ঐগুলো পরার সুযোগ হারিয়েছি, যেখানে এগুলো পরাকে উৎসাহিত করা হয় রীতিমতো।

> *“যে জামাগুলোকে আমার ঠিক মনে হয়নি সেগুলো ফেলে দিয়েছিলাম, পরে আফসোস করেছি কারণ স্বামীর সামনে ওগুলো তো পরা যেতই”*
>
> *—সাদিক্বা*

আমরা কী পরব, সমস্যা শুধু এখানেই না, একজন মুসলিম নারীকে দেখতে কেমন লাগবে তা নিয়েও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলো। ব্যাপারটা এমন যে, তুমি এখন মুসলিম, “এলোমেলো থাকো, জীবনটা ভুলে যাও”, উম্মে সাফওয়ানের ভাষায়। আর কোনো সুন্দর জামা না পরা, হেয়ারস্টাইল না করা, মেকআপ না করা অথবা বস্তুগত সাজগোজ বোঝায় এমন যেকোনো কিছু না করা।

> *“কিছু মেয়ে আছে যারা আর একটুও কেয়ার করে না তাদের কেমন দেখাচ্ছে, তারা কী পরছে। না, এটা ইসলামিক কিছু না, তবে আমি মনে করি হিজাব পরা শুরু করার সাথে অন্য অনেকের মতো তারাও অলস হয়ে যায়”*
>
> *—ঘানিয়াহ*

বহিরাগত অনেকের মধ্যেই এমনটা দেখা যায়। কিন্তু এই আচরণটা পশ্চিমাদের মধ্যেই বেশি। অধিকাংশ মুসলিম সমাজ ও দেশগুলোয়, পাকিস্তান থেকে সোমালিয়া, মালয়েশিয়া থেকে সৌদী আরব—মেয়েরা পর্দার মধ্যেই অনেক সুন্দর হয়ে থাকে। এমব্রয়ডারির কাজ করা শাড়ি পরে, সোনালি কাজের পাকিস্তানি সালওয়ার কামিজ পরে, ফুল স্কার্ট লেহেংগা পরে, হাতের কাজ করা কাফতান বৌবৌ পরে পশ্চিম আফ্রিকায়, সোমালিরা পরে দিরা, গোগোরা, এগুলো বিভিন্ন ধরণের স্কার্ট। মেহেদী দিয়ে তারা হাত রাঙায়, চোখে দেয় কাজল, বুখুর নামক আতরের সুবাস লাগায়, সোনা রূপার অলংকার পরে। কিন্তু আমরা বেচারা পশ্চিমা নতুন মুসলিমরা এইসব বিস্ময়কর শিল্প কিছুই পারি না। আমরা যা জানতাম তা হলো, মুসলিম হয়েছি, একজন ধার্মিক নারীর এইসব ছেলেমানুষী করার কোনো সময় নেই।

আমাদের আর সৌদী আরবের নারীদের মধ্যে পার্থক্যের কথা হায়ার বলছিল, "ওদের তুলনায় আমরা আলুথালু ধরনের। আর এজন্য ওরা আমাদের দিকে করুণার চোখে তাকায়, ভাবে আমরা বোকাসোকা ধরনের।"

বিয়ের পরে নতুন একটা কম্যুনিটির সাথে পরিচয় হওয়ার পর আমি এসবের সাথে পরিচিত হই, প্রথমে বুঝতে পারিনি। এর আগে আমার মেহেদী দেওয়ার পার্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বান্ধবীদের দাওয়াত দিয়েছিলাম, তাদের বেশিরভাগই ছিল জন্মগত মুসলিম। ওরা সবাই সেজে এসেছিল, খুব সুন্দর লাগছিল। অলংকার পরেছিল, সিল্ক-স্যাটিন কাপড়ের জামা পরেছিল। সান্দ্রা, হানা আর হায়াত হলঘরটা সাজিয়েছিল, ওটা ছিল রঙ আর হাসিতে পরিপূর্ণ। আমরা দফ বাজিয়ে গান গাইছিলাম। শুধু মেয়েরা মিলে খুব সুন্দর সময় কাটিয়েছিলাম—আমার জীবনের সেরা রাতগুলোর একটি।

এরপর আমার ওয়ালিমা—নবদম্পতিকে সমাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার অনুষ্ঠান। আমার সাথের অন্য নতুন মুসলিম বোনদের কমিউনিটিতেই ওয়ালিমা হয়েছিল। আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। তাদের অনেকেই সেজে আসা তো দূরের কথা, জিলবাবটাও খোলেনি। অলংকার নেই, মেকআপ নেই, মানে একটা ইসলামি আলোচনা সভার থেকে এই অনুষ্ঠানটাকে আলাদা করার কোনো উপায়ই নেই। আমি, আমার পরিবারের সদস্যরা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বান্ধবিরা সেজে এসেছিল। আর সেজেছিল উম্মে তাসনিম, ওর ওয়ালিমা আমার সাথেই হচ্ছিল। আমি খানিকটা হতাশ হয়েছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা। রাবি'আ বলল যে তার-ও ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছিল, "পাকিস্তানি সংস্কৃতিতে বিয়ে বা কোনো অনুষ্ঠানে সেজে যাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার অদ্ভুত লাগে এটা দেখে যে কোনো দাওয়াতে আমি একাই সেজে এসেছি।"

এই ভবঘুরে ধরনের আচরণ নিয়ে ঘানিয়াহ তার অভিজ্ঞতা বলছিল আমাকে, "হিজাব খুললেই সবাই এমনভাবে তাকায় যেন জন কলিন্সকে দেখছে। আর যাকে দেখছে তার ভাবটা হয়, 'এটাই আমি হিজাবের ভেতর'। আমি এমন বিয়েতেও গেছি যেখানে কনের চেয়ে আমার সাজই বেশি ছিল।"

তবে এই ভবঘুরে বেশের পেছনে আরেকটা সম্ভাব্য কারণ আছে। ভেতর থেকে কেউ যেন বলতে থাকে, "কী দরকার মাথা ঘামানোর? কেউ তো দেখছে না।" যত যা-ই হোক, এটা তো আর ইসলামে আসার আগের জাহিলিয়্যার সময় না যখন আমরা খুব সতর্ক হয়ে একেকটা জামা বাছাই করতাম, কারণ তখন বাইরে প্রচুর ছেলের প্রশংসাভরা চোখ ছিল বুঝবার জন্য ওটা ঠিক আছে কি না, আর অনেক মেয়ের ভঙ্গিমা ছিল ওটা ঠিক নেই বোঝার জন্য। সুতরাং আমরা নিজেদের আরেকবার নিশ্চিত করতে আর অন্যদের দেখানোর জন্য কাপড় পরতাম, সজাগ থাকতাম যে আমাকে এর উপর মূল্যায়ন করা হবে। আর এই মনোযোগ আর মন্তব্যই এর পেছনে ব্যয় করা সময় ও অর্থকে সার্থক করত। আমরা খুশি মনে পা ওয়াক্সিং এর ব্যথা সহ্য

করতাম, বা চিমটার টান, সূচালো হিলের গুঁতোও, শীতের রাতে মিনিস্কার্টের ঠান্ডাও। ফ্রেঞ্চ বচন "সুন্দর দেখাতে চাইলে কষ্ট করতেই হবে" —যেন আমাদের জন্যই বলা হয়েছিল। সমস্ত চেষ্টা সার্থক হতো ছেলেদের ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্য, শিষ বাজানো আর পটানো কথাবার্তায়।

অতএব, কী লাভ এসব করে, যদি কেউ, কোনো ছেলেই তা না দেখে?

> *"জাহিলিয়্যার সময় আমি এত কষ্ট কেন করতাম? আমরা বলি যে ছেলেদের আকর্ষণ করতে করি না, আমরা নিজেরা করতে চাই বলেই করি, কিন্তু আসলে তা না। অনেক সময় অন্য মেয়েদের দেখাতেও এমন করা হয়"*
>
> *—সাফওয়া।*

আমাদের কম্যুনিটির মেয়েরা বা যেখানে মুসলিমরা দ্বীন পালন করে, সেখানকার মেয়েরা এসবে মনোযোগী না একদমই। তাদের মধ্যে কোনো সাজগোজ নেই, পরিপাটি হয়ে থাকার চেষ্টা নেই, নিজের অর্জনকে দেখিয়ে বেড়ানোর চল নেই। সুতরাং এখানে নিজেকে ধরে রাখার কোনো ব্যাপার নেই, কেউই দেখবে না বিয়ের অনুষ্ঠানে তুমি ট্রাউজার পরে এসেছ কি না, তোমার জামাকাপড় বা অন্যকিছু ম্যাচিং করা আছে কি না। এই মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা অনেকেই খুশি ছিলাম। তবে ফ্যাশন শো, ক্যাটওয়াকের সাথে যুক্ত থাকা কারো উপর এটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তার জন্য, এখানে কাজ করার কোনো জায়গা নেই।

সুয়াদ আর আসিয়াহ এর সাথে এই নিয়ে আমি বেশ খোলামেলা আলোচনা করেছিলাম যে জাহিলিয়্যার যুগে আমরা কেন ওরকম পোশাক পরতাম আর এখন কীরকম পরি।

আসিয়াহ—জাহিলিয়্যার আমার সাথে তুলনা করলে বলা যায় আমি নিজেকে ছেড়েই দিয়েছি। আমার ভেতরের আমি এখন বুঝতে পারি যে অন্যান্য মেয়ের মাঝে নিজেকে সুন্দর দেখানোর ব্যাপারটা সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই নয়।

নাইমা—জাহিলিয়্যার সময় তুমি আসলে কাকে দেখানোর জন্য নিজেকে সাজাতে?

আসিয়াহ—অবশ্যই ছেলেদের।

নাইমা—শুধুই ছেলেদের?

আসিয়াহ—হ্যাঁ, আর অন্য মেয়েদেরও।

সুয়াদ—আসলে ব্যাপারটা ছিল সবার কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় লাগানো। সত্যি বলতে গেলে, আমি চাইতাম সবাই—বুড়ো থেকে কমবয়সী, ছেলে থেকে মেয়ে, এমনকি রাস্তার কুকুরটাও আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাক। আমি চাইতাম সবাই আমাকে এভাবে দেখুক যেন আমিই রাণী।

পর্দা শুরু করার পর নারীরা এই ব্যাপারটার মুখোমুখিই হয়—তারা কি আসলেই নিজেদের ছেড়ে দেবে, কারণ তাদের দেখে প্রশংসা করার মতো কেউ নেই? আমি এটাকে একটা সুযোগ ভাবলাম পরখ করে দেখার জন্য যে আমি কি আসলেই নিজের জন্য সুন্দর পোশাক পরতাম নাকি অন্যদের দেখানোর জন্য। এবং নিজের সেই অবস্থান আমি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলাম, যদিও সেটা সবসময় শতভাগ ঠিক ছিল না। কিন্তু আমি নিশ্চিত হলাম হিজাব পরতে শুরু করা আমাকে আলুথালু বেশের কোনো মেয়েতে পরিণত করবে না।

> *"আমি এমন অনেক মেয়েকে চিনি যারা বলে, 'আমি ওরকম পরতাম কিন্তু মাথা ঘামাই না। কী লাভ তাতে?' আমি কখনোই দ্বীন মানার সাথে 'আর মাথা না ঘামানোর' সম্পর্ক বুঝতে পারিনি। আমার মনে হয় আমাকে আরো ভালো দেখানো উচিত। সবকিছুর পর তুমি এখনো একজন নারী এবং এখনো সুন্দর, মাশাআল্লাহ। এখন আমি বলছি না যে সবসময় পুতুলের মতো হয়ে থাকতে হবে কিন্তু তার মানে এ-ও না যে সারাদিনই জামাইয়ের ট্র্যাকস্যুট আর মোজা পরে ঘুরে বেড়াবে। এরকম কোনো পরিবর্তন আসা উচিত না যে—আমি এখন দ্বীন মানছি, তার মানে আমাকে এলোমেলো দেখাতে হবে।"*
>
> *—রাবি'আ।*

বেশিরভাগ মেয়েই যেখানে নতুন মুসলিম হবার পরপর ইসলামি পোশাকের ব্যাপারে তাদের নিজেদের পূর্বধারণা নিয়ে দুঃখ করত বা হাসত, সেখানে আলিয়াহর চিন্তাভাবনা ছিল ভিন্ন—যেটা আমি কখনো বিবেচনাই করিনি।

সে বলছিল,

> "মুসলিম হওয়ার পর আমার পোশাক বদলায়নি কারণ আমি আবায়াহ বা ওরকম কিছু পরতে চাইনি। আমি তখনো আমার ফরাসী ঘরানার জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াই, শুধু এর সাথে একটা হিজাব। কিন্তু একবার যখন আবায়াহ পরেই ফেললাম তখন এসব ছেড়েই দিচ্ছিলাম প্রায়, না চাইতেও ধরে রাখার মতো ব্যাপার। তো ছেড়েই দিলাম। এরপর আমিও কিছুটা আওলাঝাওলা হয়ে গেলাম। আমার মনে হয় আমি জীবনের অনেকগুলো বছর ব্যয় করে ফেলেছি এই সুন্দর থাকার পেছনে। পা ওয়াক্স করতে, আইব্রু সাজাতে, এসব ফালতু কাজে অনেক সময় দিয়েছি। আমার মনে হলো ইসলাম মোটেও এমন না। তুমি যেমনই হও, তেমনই সুন্দর। তো আমার মনে হয়নি জাহিলিয়্যার সময়ের মতো এত সাধনা করে নিজেকে সুন্দর দেখাতে হবে। ওগুলো করতে হচ্ছে না বলে আমার ভালো লাগছিল। নিজেকে স্বাধীন মনে হলো।"

লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্য

তবে অন্য অনেক মেয়েই জাহিলিয়্যা থেকে হিজাব, জিলবাব, নিকাবে এসেও নিজেদের মানদন্ড ঠিক রেখেছিল।

"আমি কখনোই আমার আগের জামাগুলো ফেলে দেইনি আর আমি খুশি যে আমি ফেলিনি। মাশাআল্লাহ। আমি নিজেকে একজন স্টাইলিশ ব্যক্তি বলে মনে করি এবং মনে করি যে অন্য মেয়েদের সাথে এই ক্ষেত্রে আমরা সমান।"

—সাদিকা

তবে এই ভবঘুরে নতুন মুসলিম ব্যাপারটায় বেশ পরিবর্তন এসেছে—অনেকেই এখন তাদের সুন্দর জামাকাপড় ফেলে না দেওয়ার উপদেশ পাচ্ছ। আমরা যে ভুলটা করেছি তারা যেন সেটা না করে। শারিফাহ মাত্র কয়েক মাস আগে মুসলিম হয়েছে। সে তার আগের কাপড়চোপড় ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে বলছিল, "আমি ওগুলো স্থানীয় চ্যারিটিতে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আমার বোন এসে সেগুলো নিয়ে আবার বাক্সে রেখে দিল। আমি সেটা দেখার পর বললাম, 'কত বড় সাহস তুমি এরকম করেছ? এটা আমার সিদ্ধান্ত আমি কী করব না করব।' আমি যতই ওগুলো নিয়ে সতর্ক হচ্ছিলাম যে ততই নাক গলাচ্ছিল। এরপর আমি কিছু মেয়ের সাথে কথা বললাম। তারা আমাকে বললেন যে ফেলে দিতে হবে না। বলল, 'হ্যালোওওও, নিজের জামাগুলো রেখে দাও, মেয়ে!'"

গত কয়েক বছরে আমাদের ছোট্ট কম্যুনিটিতে মেয়েরা সতর্ক হচ্ছে আর তাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

একটা ফান্ডরেইজিং ডিনারের কথা আমি কখনো ভুলবনা। কয়েক বছর আগে সেটা আমার বাসাতেই হয়েছিল। আমি ওটাকে নাম দিয়েছিলাম প্রিন্সেস নাইট। সবাইকে প্রিন্সেসের সাজে আসতে হয়েছিল, কোনো বাচ্চা আনা নিষেধ। এর আগে আমি কখনো এত মেয়েকে একসাথে তাদের বাচ্চাদের ছাড়া বাইরে এত সুন্দর, নিশ্চিন্ত দেখিনি। আমরা খেয়েছি, কথা বলেছি, হেসেছি। কেউ কেউ উপরতলায় মেকআপ করছিল। একজন বলেছিল, "সবাইকে এত সুন্দর সাজে দেখতে খুব ভালো লাগছে। এরকম সাজগোজ করার সুযোগ আমরা পাই না বললেই চলে, তাই না?"

এরপর পরিবর্তন আসতে শুরু করল। হঠাৎ করেই মেয়েরা একজন আরেকজনের বাসায় পরিপাটি হয়ে যাওয়া শুরু করল, মেকআপ লাগাল, কিছু জুয়েলারিও, তবে সবই পর্দার ভেতরে। অন্যান্য কম্যুনিটির মতো ঈদ, বিয়ে, উৎসব ইত্যাদিতে বিভিন্ন সংস্কৃতির আমেজ আসতে লাগল। চাইনিজ পোশাক, কুর্তা পাজামা, হুড লাগানো জালাবিয়া, সবার পছন্দের দুবাই থেকে আসা সোমালি ঐতিহ্যবাহী দিরা পরল তারা। সাথে মেহেদী, চুড়ি, কানের দুল, ফিতের জুতো, চুলের সাজ, পাউডার। লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বিউটি ডে হওয়া শুরু করল। এতে দুরকম লাভ হলো। মেয়েরা পর্দার মধ্যে থেকে নিজেদের যত্ন করার ফুরসত পেল; আর আগে যারা ফ্রিল্যান্সার বিউটি থেরাপিস্ট, হেয়ার স্টাইলিস্ট, মেহেদী আর্টিস্ট ছিল, তারাও কাজের সুযোগ পেল। কেউ কেউ রূপার অলংকার, আকর্ষণীয় অন্তর্বাস, সাজগোজের উপকরণ ইত্যাদির ব্যবসা শুরু করল। এতে করে যারা নিজেদের সাজাতে চায়, তারাও

একটা রেডি মার্কেট পেয়ে গেল। এখন তো ফিটনেস আর অবসর কাটাতে মেয়েদের জন্য অনেক কিছুই হয়েছে আলাদা; অ্যারোবিকস, সার্কিট ট্রেনিং, কিকবক্সিং, সাঁতার। আমার উষ্ণ আশা যে নতুন মুসলিমদের ভবঘুরে ভাবে থাকার দিনগুলো সত্যিই সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে।

তবে এই বিপ্লব বেশ কিছু ব্যাপার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখনো অনেক মেয়েই সতর্ক যে এসব নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি হয়ে যাচ্ছে না কারণ এগুলো শুধুই দুনিয়াবী ব্যাপার। বিশেষ করে আমার কম্যুনিটিতে সতর্কতা আছে যে নিজেদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলে না আসে, এবং বিচার করা না হয় যে আমাদের কতটুকু পরিশ্রম হয়েছে এর পেছনে। এই মানসিকতা ব্যাপারগুলোকে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে না যেতে ভূমিকা রেখেছে, আর একইসাথে আগের সেই সুন্দর দেখানোর মানসিক চাপ যেন ফিরে না আসে সেখানটাতেও সতর্ক রেখেছে—যেটা জাহিলিয়্যার যুগে হতো। আমি একবার জুবাইদাকে বলেছিলাম যে সবসময় আবায়াহ পরে থাকার ব্যাপারটা আমার কাছে প্রেশার লাগে। কিন্তু এরকম অনেক মেয়েই আছে যারা সবসময় সাজগোজ করা বা সব অনুষ্ঠানে ভালো কাপড় পরার সামর্থ্য রাখে না। তাদের কাছে আবায়াহ খোলা এবং ভালো কাপড় পরাটাই চাপ। সুতরাং এই ট্রেন্ডটা আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেনি আর আমরা সব উৎসবেই এমনটা করতাম না। কিন্তু চাইলে সাজতে পারতাম—এমন ব্যাপার তৈরি হলো।

কিছু মানুষের মাথা থেকে এটা বেরই হয় না যে আমরা বাইরে দিয়ে ঢেকে রাখি আর ভেতরে সুন্দর থাকি। আমাদের কেউ একজন যখন হল্টার-নেক জামা, হিপস্টার পাজামা বা সুন্দর কোনো অন্তর্বাস কিনে তখন অবিশ্বাসে ভরা কিছু চাহুনি তার কাছে নতুন না।

> *"আমি মনে করি মানুষ ভাবে যে মুসলিম মেয়েরা ফ্যাশনেবল জামা পরে না। তারা চুল সাজায় না, মেকআপ করে না। মাঝে মাঝে দোকানে গেলে তাদের তাকানো দেখে মনে হয় যেন ভাবছে, 'এক মিনিট, সে এগুলো দিয়ে কী করবে? ঐ স্কার্টটা কেন নিচ্ছে, ঐ টপটা কেন?' এটা কখনো কখনো বিরক্তিকর।"*
>
> *—উম্মে মুহাম্মাদ*

কমবয়সী মেয়েরা, যারা ইসলামের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে, তাদের সৌন্দর্যসচেতনতা আমার ভালো লেগেছে। ষোল বছরের রুমাইসা বেশ কবছর ধরে তার মুখ ঢাকে। আমি জানতে চাইলাম হঠাৎ করে গ্লিটারি আইশ্যাডো আর সিরামিক স্ট্রেইটনারে সে এত পারদর্শী হয়ে উঠল কীভাবে?

বলল, "আমি মনে করি বড় হতে হতে মানুষ তার বাহ্যিক রূপ নিয়ে সচেতন হতে শুরু করে, নতুন নতুন জিনিস ব্যবহার করতে চায়। ছোট থাকতেও আমি ফ্যাশন পছন্দ করতাম কিন্তু তখন মা ঠিক করে দিতেন আমি কী পরব। এখন আমি নিজেই

দোকানে গিয়ে নিজে পছন্দ করে জামা কিনি যদিও মা'র কাছ থেকে মতামত নেই কিছু ব্যাপারে। হালফ্যাশনের ব্যাপারে আমার মা বেশ জানেন।"

মুসলিম টিনএজার আর তাদের অভিভাবকদের মধ্যে জামা পছন্দ করা নিয়ে প্রায়ই মতের অমিল হয়, তাই আমি জানতে চাইলাম তার মা, উম্মে মুহাম্মাদ মেয়ের এই ফ্যাশন সচেতনতাকে কীভাবে দেখছেন? উত্তর শুনে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম।

> "আমি সবসময়ই রুমাইসাকে বলতাম ফ্যশনেবল জামা পরতে। কিন্তু ও পরত না। কানের দুল পরত না, চুল ঠিক করত না, সুন্দর জামা পরতে চাইত না। আমি বলব ছোটবেলায় ও ভীতু ধরনের ছিল, এমনকি মেয়েদের মধ্যেও। কিন্তু বড় হতে হতে আত্মবিশ্বাসী হয়েছে, সুন্দর দেখানোর ব্যাপারে সতর্ক হয়েছে। আর এটা একদম ঠিক আছে কারণ ও পর্দার মধ্যে থেকেই করে।"

তাহলে ব্যাপারটা এমন যে একজন টিনএজার, যে নিজেকে ঢেকেই বড় হয়েছে, হিজাব তার আর তার বান্ধবীদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও স্টাইল করার মানসিকতাকে দমন করে ফেলেনি। আমার হিজাব পরা নিজের চোখকে সমালোচকের চোখ বানিয়ে দেয়, যা দিয়ে নিজেকে, নিজের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহকে দেখা যায়। যেহেতু একজন মুসলিম নারী তার সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ করবে না, তাহলে এখানে নিয়তের সঙ্কট তৈরী হতে পারে—কেউ যদি না-ই দেখল, তাহলে কেন করব? ইসলামে আসার শুরু থেকেই আমরা এ প্রশ্নের সাথে যুদ্ধ করেছি, তারপর এই উপসংহারে এসেছি যে সুন্দর দেখানো, নিজের যত্ন করা একটা আত্মসম্মানের ব্যাপার, কেউ দেখুক আর না দেখুক তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা এখন সত্যিই নিজের জন্য পরিপাটি থাকি এবং অন্যকে দেখানোর কথা ভাবি না। এখন যখন আমি মুসলিম মেয়েদের সাথে কথা বলি যে হিজাবের ভেতরে নিজদের সৌন্দর্য নিয়ে তারা কী ভাবে, আমি বেশ ইতিবাচক উত্তর পাই। বাইরে ঢেকে রাখা এবং ভেতরে সুন্দর থাকা নিয়ে কারো কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ব্যাপারটা এমন যেন, পর্দার অন্তরালে থেকেই রঙিন পাখাগুলো খুলছে, উন্মোচিত হচ্ছে আর আমাদের বোনেরা উড়ে বেড়াচ্ছে।

আমরা যারা আল্লাহর আইন মেনে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নতুন বা জন্মগত মুসলিমরা, তাদের কাছে হিজাব মানে অনেক কিছু—আমাদের পর্দা, আমাদের রিমাইন্ডার, আমাদের আরাম, আমাদের আত্মরক্ষা, আমাদের মুক্তিদাতা, আমাদের রবের কাছে আমাদের দাসত্বের চিহ্ন। এটা মোটেও অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বোঝা না, কোনো বিকার না, নিপীড়নের চিহ্ন না—এটা একজন মুসলিম নারী হিসেবে আমাদের পরিচয়ের মৌলিক অংশ। আর যারা আমাদের এখান থেকে 'মুক্ত করতে' কঠোর পরিশ্রম করেন, তাদের উচিত যাদের তারা মুক্ত করতে চাইছে, আগে তাদের কথা শোনা। ভালো উদ্দেশ্যেও, একজন নারীর স্বাধীনতাও অন্য একজন নারীর কাছে কারাগার মনে হতে পারে।

মুসলিম রীতিতে বিয়ে এবং ভালোবাসা

মুসলিম হওয়ার প্রায় নয় মাস পর আমি একজনকে বিয়ে করি, ইসলামি নিয়ম অনুসারে। গিনিতে থাকার সময় থেকেই বিয়ের ব্যাপারটা আমার মাথায় ছিল। আর সান্দ্রার রান্নাঘরে এই নিয়ে গল্প করতে করতে আমরা বহু ঘণ্টা পার করেছি। একটি ইসলামিক বিয়ের ভিত্তি, এর সাথে জড়িত অধিকার ও দায়িত্ব, ছেলে দেখা, কী ধরনের প্রশ্ন করা উচিত, কোনো ঝামেলা হলে কীভাবে মেটানো যায়—এর সবই আমরা আলোচনা করতাম আন্তরিকভাবে, অকপটে, কখনো হাসিতে ফেটে পড়ে।

আমরা সবাই-ই তখন অবিবাহিত আর সেজন্যই জানতাম না আমাদের কী আশা করা উচিত। বেশ কিছু ব্যর্থ ছেলে দেখা পর্বের শেষে আমি বিয়ে নিয়ে আর ভাবতে চাইলাম না, এর বদলে দুনিয়াটা ঘুরে বেড়ানোর এলোমেলো পরিকল্পনা করা শুরু করলাম। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত একজন এক ছেলের কথা বলল, তারা দুজন একসাথেই বড় হয়েছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী—একজন দ্বীনদার নতুন মুসলিম, দাঁড়ি আছে, মায়ের ফার্ম দেখাশোনা করে, শিক্ষিত, আধুনিক, দায়িত্বশীল—শুনে আমার দেখা সব ছেলের চেয়ে তাকেই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হলো। আমি আমার অভিভাবক, ওয়ালির সাথে তাকে দেখা করানোর ব্যবস্থা করলাম। ওয়ালি ছিলেন রিজেন্টস পার্ক মসজিদের ইমাম। উনি ছেলের সাথে প্রাথমিক কিছু প্রশ্নোত্তর পর্বের পর খুশিমনে সামনে আগাতে মত দিলেন। একদিন অফিসের সময়ে ফোন করে মসজিদে আমাদের দেখা হলো, আমার সাথে করে একজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনদিন পর আমি তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেলাম।

> "(মুসলিম) বান্দা যখন বিবাহ করে, তখন সে তার অর্ধেক ঈমান (দ্বীন) পূর্ণ করে, অতএব বাকী অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।" (তাবারানি)

গিনিতে থাকতেই আমি বুঝতে পারছিলাম যে ইসলামিক জীবনযাপনের একটা বড় অংশ হলো বিয়ে। আগেই বলেছি, যাদের সাথে পরিচয় হয়েছিল তারা সবাই-ই আমার বিয়ের জন্য ভাবছিলেন। কেন, সেটা বুঝতে পারলাম। আমার চারপাশে তাকালেই দেখতাম স্বামী-স্ত্রী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা, মামা, ভাগনে-ভাগ্নী—এরা প্রত্যেকেই পরিবারের মাধ্যমে সম্পর্কিত। আর বিয়ে হচ্ছে এই সম্পর্কগুলোর মৌলিক ভিত্তি। এর মাধ্যমে পরিবারগুলো আন্তরিকতার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, নতুন নতুন

পরিবার তৈরী হয়, একটা নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠে আর পুরনো প্রজন্মকে যত্ন করা হয়। আমি খুব ভালোমতো বুঝতে পারছিলাম একা একা ইসলামি জীবনযাপন করাটা কী পরিমাণ নিঃসঙ্গ! ভোরবেলা আমার সাথে নামাজ পড়তে উঠার কেউ নেই, একসাথে ইফতার করার কেউ নেই, মন খারাপ হলে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার কেউ নেই, একটা পরিবার তৈরী করার আনন্দ বেদনা ভাগাভাগি করার কেউ নেই!

ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিয়ে হচ্ছে একধরনের স্বর্গ, যেখানে ভালোবাসা, যত্ন, সাহচর্য্যের মাধ্যমে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা হয়। এটা হচ্ছে আদর্শ—যে আদর্শের কথা আল্লাহ বলেছেন-

> “আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরাহ রুম,৩০:২১)

কারণ শারীরিক ঘনিষ্ঠতা এখন সমাজে অনেক সহজলভ্য—বিবাহপূর্ব সম্পর্ক, লিভ টুগেদার, অথবা শুধুই এক রাতের প্রেম। অনেকেই এখন ভাবে যে বিয়ের সাথে যে পরিমাণ দায়িত্ব জড়িত, তার তুলনায় এর সুবিধা খুবই কম। কিন্তু মুসলিমদের জন্য এমনটা না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই এটা একধরনের স্বাধীনতা। বিয়ের মাধ্যমে অনেক নিষিদ্ধ ব্যাপার বৈধ হয়ে যায়, বরং কাজগুলোয় উৎসাহিত করা হয়। দুজন তরুণ-তরুণী একজন আরেকজনের সাথে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে, ঘুরে বেড়াতে পারে, একসাথে থাকতে পারে। সংক্ষেপে, একজন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সবকিছু ভাগাভাগি করা যায়।

আর এর সাথে যে দৈহিক আনন্দ জড়িয়ে থাকে, সেটা একান্তই নিজের। ইসলামি বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বাসীদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বৈধভাবে পূরণ করার সুযোগ করে দেওয়া। আর এজন্য আছে পুরস্কারও, দুনিয়াতে এই পুরস্কারের রূপ হচ্ছে সুখ ও সন্তান-সন্ততি, আখিরাতে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার।

বিয়ে হচ্ছে তাই পরিকল্পিত উপায়ে মানুষকে অবৈধ ব্যাপার থেকে দূরে রাখা, সেইসাথে এই বিষয়ক হতাশা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোকেও দূরে রাখা।

অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের মতো ইসলামে সন্ন্যাসব্রতের আলাদা কোনো পদবী নেই। বরং যারা শারীরিক সম্পর্ক থেকে দূরে থেকে বেশি ধার্মিক হতে চায়, রাসুল (সা.) তাদের কড়া সমালোচনা করেছেন। “বিয়ে আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নত অনুসরণ করে না সে আমার অনুসারী নয়।”

তো এটা স্পষ্ট যে আমি বিয়েকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারতাম না। অবশ্য এড়িয়ে যেতে চাইওনি, বরং খুবই আগ্রহী ছিলাম যে নতুন কারো সাথে দেখা হবে—আমার সময়, দ্বীন, জীবন তার সাথে ভাগাভাগি করব।

অপ্রত্যাশিত কিছু আশা করা

আমার স্পষ্ট মনে আছে, ইসলামে প্রবেশ করার প্রথমদিককার সময়ে আমরা কেউই খুব বেশি কড়া, প্র্যাকটিসিং কাউকে বিয়ে করতে চাইতাম না। "এহ, বিয়ে করি আর তারপর আমি যা-ই করি, সে বলতে থাকুক সবই হারাম। কখনো না!" ঐ সময়ে এরকম প্রায়ই শোনা যেত যে কেউ বলছে, "আমার বিয়ের পুরোটাই তো হারাম!" এর মানে হলো ছেলে-মেয়ে আলাদা ব্যবস্থা থাকবে না, কনের পর্দা হবে না, আর সাথে পার্টি হবে, সবাই ইলেক্ট্রিক স্লাইডে নাচানাচি করতে থাকবে। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের ইসলামের বুঝ তখন কোন জায়গায় ছিল! সময়ের সাথে সাথে আমরা আরো শিখলাম, আমাদের দ্বীনের বুঝ শক্তিশালী হলো, অগ্রাধিকারের জায়গাগুলো বদলাল। আমরা আর অল্প অল্প দ্বীন মানা কাউকে চাইলাম না, বরং দ্বীনকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরা কাউকে চাইতাম—যে আমাদের আরো শিখতে, জানতে, মানতে উৎসাহ দেবে, আমরা যেরকম করে ইসলামে বাঁচতে চাইতাম, সেরকম করে সে-ও ইসলামে বাঁচতে চাইবে।

> *"আমি এমন দ্বীনদার কাউকে খুঁজছিলাম যে শিখতে পছন্দ করে, নিয়ম করে শিখতে বিভিন্ন ক্লাসে যায়, যে কিনা ঘরের ভেতর একটা ইসলামি পরিবেশ তৈরী করবে। এমন একটা ঘর হবে যেখানে দ্বীন থাকবে সবার আগে, যে ঘরে ইসলামকে মানা হবে, শুধু সপ্তাহের শুক্রবারে মুখে মুখে বলা হবে না। ইসলাম হচ্ছে একটা জীবনব্যবস্থা, আমি সেটাই চাইতাম। আমি ইসলামে বাঁচতে চেয়েছিলাম।"*
>
> *—উম্মে মুহাম্মাদ*

বেশিরভাগ মুসলিমের মতো আমিও আমার রাসূল (সা.) আদর্শের কাউকে স্বামী হিসেবে চাইতাম। আগেই বলেছি, তাঁর পারিবারিক জীবন আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

তিনি ছিলেন একজন মুসলিম পুরুষের চমৎকার উদাহরণ, যিনি দ্বীন ও দুনিয়া একসাথে ভারসাম্য করে চালাতে পারতেন। তিনি মুসলিমদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন, সামাজিক কাজকর্ম করতেন, বিচার করতেন; একইসাথে ওহী গ্রহণ করতেন, সালাতে কাঁদতেন, সারারাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা ফুলে যেত। তাঁর স্ত্রী আইশা (রা.) যেভাবে বর্ননা করেছেন, আমার খুবই ভালো লেগেছে যে পাত্রে করে দুধ খাওয়ার সময় স্ত্রীর ঠোঁট পাত্রের যেখানে স্পর্শ করেছে উনি সেখানটা থেকেই নিজেও খেয়েছেন, কেমন করে তাঁরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন, কেমন করে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতেন। আমি জানলাম তিনি ছিলেন ভীষণরকমের

শান্ত এবং ধৈর্যশীল একজন মানুষ, ঘরে সাহায্য করতেন, নিজের জুতা ঠিক করতেন। এগুলো অনুসরণ করা বেশ কঠিন।

সবচেয়ে বড় কথা আমি একজন সত্যিকারের মুসলিমকে বিয়ে করতে চাইতাম যে প্রতিদিন পাঁচবার সৃষ্টিকর্তার সামনে সিজদাবনত হওয়ার মতো বিনয়ী—ইসলামি ব্যক্তিত্বের মহৎ গুণগুলো যার অংশ। আমি চাইতাম সে হোক সৎ, মহৎ, দয়ালু এবং দায়িত্বশীল। এমন কাউকে চাইতাম যে প্রকাশ্যে এবং গোপনে, সব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবে, যে তাঁর নিজের ভুল স্বীকার করতে পিছপা হবে না, অন্যের থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে।

অনেক দিক থেকেই একজন জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে আমার প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি—যে কিনা ঐসব প্লেবয়দের চেয়ে অনেক অনেক ভালো হবে যাদের আমরা ইসলামে আসার আগের জাহিলিয়্যার সময়টায় চিনতাম। আর এটা জেনে আমরা বেশ স্বস্তি পেয়েছিলাম যে বিয়ের জন্য যে ছেলেদের সাথে আমাদের পরিচয় হবে, তাদের সামনে আমরা হিজাব পরেই যেতে পারব। ইসলামে আসার আগে হাযারের একটা বেশ সিরিয়াস প্রেম ছিল, "মুসলিম হওয়ার পর আমার বিয়ে নিয়ে অনেক প্রত্যাশা ছিল। আমার জামাইয়ের সাথে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম আড়াই পৃষ্ঠা প্রশ্ন নিয়ে। তার ব্যাপারে একের পর এক খোঁজখবর চলছিলই।"

আমার দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারেও আমি চাইতাম আমার স্বামী পূর্ণ সক্ষম থাকবে। একটা হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে এটা একজন নারীর অধিকার যে তার স্বামী নিজে যা খাবে—তা-ই তার স্ত্রীকে খাওয়াবে, যা পরবে—তা-ই পরাবে, যেখানে থাকবে—সেখানেই স্ত্রীকে রাখবে।

বিয়ের চিন্তাভাবনার সাথে সাথে আমার ব্যক্তিগত কিছু ইচ্ছা অবশ্য ঝাপসা হয়ে যায়নি। টিনএইজ বয়স থেকে, হারারের বিশাল বাড়িটায় যখন থাকতাম, তখন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল নিজের একটা ব্যবসা থাকবে, আমার স্বামীর চেয়ে বেশি না হলেও সমান আয় করব। মুসলিম হওয়ার পরও আমার এই ইচ্ছাটা ছিল যে নিজে কিছু আয় করব, যদিও তখনো জানতাম না কীভাবে করব। কিন্তু আমি এটা জানতাম পরিবারের ভরণপোষণ ও দেখাশোনার দায়িত্ব আল্লাহ পুরুষকেই দিয়েছেন। বিয়ের উপকারিতা আমার চোখে আরো ধরা পড়ল যখন বুঝলাম একজন নারী হিসেবে আমি যা-ই আয় করি, তা নিজের কাছে রাখতে পারব, এবং ইচ্ছামতো কম-বেশি খরচ করতে পারব। এটা আমার কাছে বেশ সুবিধার লাগল।

আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে কম কিছু নিয়ে থিতু হওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। অন্য মুসলিমদের মতো আমিও এমন কাউকেই বিয়ে করতে চাইতাম যে পরিবার গড়তে প্রস্তুত। সন্তানের ব্যাপারে দ্বীন অনেক উৎসাহ দেয় আর এমন কোনো মুসলিম পুরুষ পাওয়া দুর্লভ যে বাবা হওয়ার দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে চায়। আমার কাছে বিয়ে এবং সন্তান ছিল একসূতোয় গাঁথা।

এর আগে আমি নিজেকে একজন "ক্যারিয়ার উইমেন" ভাবতাম। আমার সন্তান থাকবে কিন্তু তাদের দেখাশোনার জন্য আমি টাকা দিয়ে মানুষ রাখব, যাতে আমার ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। কিন্তু ইসলাম আমার জীবনকে একজন স্ত্রী ও মা হিসেবে ভিন্নভাবে দেখতে শিখিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিলাম আমার সন্তানদের আমি নিজেই দেখাশোনা করব। বুঝতে পারছিলাম আর সব কর্মজীবী মায়েদের মতো সন্তান লালন, ঘর দেখাশোনা, ক্যারিয়ার গড়া এসব একসাথে করতে গেলে আমার সময়ে বেশ টান পড়বে। এতগুলো চরিত্রে একইসাথে কাজ করার ভেলকি থেকে আমি নিজেকে দূরে রাখতে চাইলাম। আর নিজের সন্তানের সাথে আলাদা একটা বন্ধন তৈরী করা, তার প্রথম হাঁটা, প্রথম কথা বলার দৃশ্য দেখা, তাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইনি। আমি নিজেকে একজন সার্বক্ষণিক মা'য়ে পরিণত করতে চাইলাম, আমার সন্তান যেন সবসময় ঘরে তার মা'কে পায় সেটা নিশ্চিত করতে চাইলাম। ইসলাম আমাকে শিখিয়েছে যে এই সবকিছুই ঐ অতিরিক্ত অর্থের চেয়ে অনেক দামী—যা আমি বাইরে কাজ করে উপার্জন করতাম। আমি সেটা বুঝতে পারলাম। সুতরাং বাইরের দিকে, উপার্জনের দিকে আমার যে মনোযোগ ছিল তা চলে গেল একটা সুন্দর ইসলামি পরিবার গঠনের দিকে, যেখানে স্বামী বাইরে উপার্জন করে আর স্ত্রী ঘরে সন্তানদের দেখাশোনা করে।

"আমি এরকম আশা করি না যে কেউ আমার সবটুকু দায়িত্বই নেবে কিন্তু দ্বীন একজন স্বামীকে সেটাই করতে বলেছে। তুমি যদি এই দিকটায় সীমা নির্ধারণ করে দাও, তাহলে তুমি আসলে তাকে পুরোপুরি পুরুষ হতে দিচ্ছ না। আল্লাহ তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তার পুরোটা তাকে পালন করতে দিচ্ছ না।"

—শারিফাহ।

আমার ভেতরে একটা স্বেচ্ছাচারী আমি ছিল, যার সাথে আমি আপোষ করলাম। সে পদত্যাগ করল—একজন সত্যিকারের ভালো মুসলিমকে আমি বিয়ে করব তাই। আমি নিজেকে বলতাম, এসবের বিনিময়ে তুমি কী পাচ্ছ? হ্যাঁ, তোমার জীবনে একজন পুরুষ আসবে যে ভালো, দয়ালু, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে কিন্তু মনে রেখো, সে কিন্তু অনেক "বোরিং"ও।

এই ধারণা কোত্থেকে এসেছে জানি না, তবে একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম পুরুষ বলতে আমি বুঝতাম গম্ভীর, পুরান আমলের কেউ, যে হাসি-ঠাট্টাও বুঝে না। সে কি আমাকে সারাক্ষণই আল্লাহকে ভয় করার কথা বলতে থাকবে? হাসতে মানা করবে, বলতেই থাকবে যে এটা হারাম, সেটা করা যাবে না? কোনো কারণে আমার মনে হতো পশ্চিমে একটা সম্পর্ক থেকে আমরা যেমন হাসি, আনন্দ, রোমান্টিকতা আশা করি, তা ইসলামি বিয়ের সম্পর্কে নেই।

খারাপ ব্যাপার হলো, আমার প্রত্যাশাগুলোর একটা অন্ধকার দিকও ছিল। আমার ভিতরের একটা অংশ ভয় পাচ্ছিল, একটা অংশ ভীষণ ভীত ছিল এই ভেবে যে আমি

মনে হয় ভূতের গল্পের চরিত্রের মতো কাউকে স্বামী হিসেবে পাব। সে হয়তো দানব ধরনের কেউ হবে যে আমাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবে, পরিবার, বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে দেবে না, সে যেমন স্ত্রী চায়, যেমন নারী কল্পনা করে, সেরকম বানাতে চাবে জোর করে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আমি মনে হয় এমন একটা বিয়ের জালে জড়িয়ে যাব যা আমাকে নিরাপত্তা দেবে, স্থিরতা দিবে, সুরক্ষা দিবে; আর এর উল্টোপিঠে বিনিময়ে ছিনিয়ে নেবে আমার স্বকীয়তা, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা।

"একবার দেখা করেই বিয়ে করে ফেললে?"

একবার আমি, সান্দ্রা আর হানাহ ইসলামি বিয়ে নিয়ে কথা বলছিলাম, এই ব্যাপারে ভালোই জানাশোনা ছিল আমাদের। এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে কোনো ছেলের যদি কোনো মেয়েকে পছন্দ হতো তাহলে সে তার বন্ধুর বউকে সেই মেয়ের কাছে পাঠাত জানতে যে সে বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভাবছে কি না। পাত্রটি মানানসই হলে উত্তরের সাথে থাকত চাপাহাসি, চেহারায় রক্তিমাভা; আর উপযুক্ত না হলে রাগ, অট্টহাসি। তারপর কথা আগালে কিছু মানুষের উপস্থিতিতে ছেলে-মেয়ের দেখা, এরপর বোনদের উপস্থিতিতে আরেকবার সব বিষয়ে স্পষ্ট কথা। ছেলেকে উপযুক্ত মনে হলে অনেক কিছুই সিরিয়াসভাবে শুরু হয়ে যায়। গোগ্রাসে গেলা শুরু হয় বিয়ে বিষয়ক বই, প্রশ্ন তৈরী হয়, অভিজ্ঞদের কাছ থেকে উপদেশ নেওয়া হয়, এই ছেলেই "সেই" জন কি না এই নিয়ে চলতে থাকে তুমুল আলোচনা।

পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে দুজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম দেখা করা থেকে শুরু করে বিয়ে পর্যন্ত কীভাবে যায় আসলে? একটা মেয়ে যখন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়, বুঝতে পারে যে সে বিয়ের জন্য প্রস্তুত, তখন তার মা-বাবা, পরিবার, বন্ধু-বান্ধবকে বিয়ের কথা বলে, সে কেমন ছেলে চায়, তা-ও বলে।

> "তোমার কাছে যদি কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে আর তার দ্বীন, চরিত্র নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে তাকে বিয়ে করো। তা না হলে এই দুনিয়াতে খুব ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।"—রাসুলুল্লাহ (সা.), (ইমাম আত তিরমিযি হতে বর্ণিত, হাসান)

কেমন ছেলে চায় এই বিষয়ে সে কতটুকু দ্বীনদার ছেলে চায়, কেমন চরিত্র, ব্যক্তিত্বের, দেখতে কেমন, পড়াশুনা, তার সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে নিজের চাহিদা জানাতে পারে, যা যা জানালে অন্যদের ছেলে খুঁজতে সুবিধা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই দ্বীনদার কাউকে বিয়ে করার উপদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ একজন মেয়ে এমন ছেলেকে খুঁজবে যার চরিত্র ভালো, যে মহৎ, দয়ালু, উদার, ধৈর্যশীল, যে আল্লাহকে ভয় পায়, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করে।

ছেলে খোঁজা পর্ব শুরু হয়। ছেলেটা মেয়ের ভাইয়ের বন্ধু হতে পারে, বান্ধবীর ভাই হতে পারে। এই পর্বে বেশ অনুসন্ধান চলে, মেয়ের পক্ষ থেকে মেয়ের পরিবার ও

বন্ধু-বান্ধব ছেলের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়, আচার-আচরণ দেখে। ছেলের পরিচিতদের কাছ থেকে জানে।

এসব উতরে গেলে মেয়ের বাবা অথবা অভিভাবক ছেলের পরিবারের সাথে কথা বলে। ছেলে আগ্রহী হলে, দুই পরিবারের কথা মিললে অন্যদের উপস্থিতিতে ছেলে-মেয়ের দেখা হয়। যেহেতু মুসলিমদেরকে বিয়ের ব্যাপারে বাহ্যিক সৌন্দর্যও দেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে, ছেলে-মেয়ের সাক্ষাতে এটাও দেখে নেওয়ার সুযোগ হয় যে তাদের একজনের চোখে অন্যজনকে আকর্ষণীয় লাগছে কি না। নিজেদের গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা কথা বলতে পারে, প্রশ্ন থাকলে করতে পারে। পরিস্থিতি বিবেচনায় তাদের একাধিকবারও দেখা হতে পারে। তবে বিয়ের আগে খুব বেশি দেখা না করার উপদেশই দেওয়া হয় মুসলিমদের। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। একটি হলো, ইসলামি আইন অনুসারে, ছেলে-মেয়ে তখনো একজন আরেকজনের জন্য হালাল না—তাদের একসাথে সময় কাটানোর বা নির্জনে থাকার অনুমতি নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা দুজন এখনো একে অন্যের জন্য হারাম। সে কারণেই দেখাটা হয় অন্যদের উপস্থিতিতে, সতর্ক থাকা হয়, কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ যেন না হয়। কারণ এরকমও হয় বেশি যোগাযোগের কারণে প্র্যাকটিসিং দুজন মানুষও জিনায় (অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক) লিপ্ত হয়ে গেছে। এরকম মুহূর্তে মানুষ আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; সব নিয়ম, সতর্কবার্তা, পরিণাম ভুলে যায়। আর কোনো প্র্যাকটিসিং মুসলিমই চায় না তার সাথে এমনটা হোক।

আবেগী কথাবার্তায় একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করে ফেলাটা এই সমাজে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এইসব কাম-ভালোবাসা আসলে একটা ছবি আঁকে, কল্পনায় মোড়ানো, মোহ তৈরী করে। কারো প্রতি এইসব আবেগ তৈরী হওয়ার জন্য তার সৎ, বিশ্বস্ত, মহৎ, দয়ালু ও দায়িত্ববান হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, সে বিয়ে করার মতো কেউ হওয়ারও দরকার হয় না। সুতরাং এইসব আবেগকে একপাশে রেখে দিলে একজন মানুষ সম্পর্কে ঠান্ডা মাথায়, যুক্তি দিয়ে ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, তার ভালো-খারাপ দিকগুলো আলাদা করা যায়। কিন্তু কখনো কখনো দ্বিতীয়বার দেখা করেও আসলে কোনো কাজ হয় না।

আমি আর আমার বন্ধুরা এই দিক দিয়ে সৌভাগ্যবান ছিলাম যে বিয়ের চিন্তাভাবনা করার সময় ব্যাপারগুলো খুব সুন্দরভাবে সামলানো হয়েছে। কোনো প্রস্তাব পেলে আমরা হয় তা গ্রহণ করেছি অথবা ভদ্রভাবে ফিরিয়ে দিয়েছি। সাধারণত মুসলিম পরিবারগুলোয় মেয়েদের সাথে বিয়ে নিয়ে যা হয় আমাদের ব্যাপারগুলো ছিল তার চেয়ে আলাদা। এর একটা কারণ ছিল যে নতুন মুসলিম হওয়ার কারণে আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিয়েছি। সান্দ্রা আর আমার একজন অভিভাবক ছিলেন, কিন্তু তিনি তো আর পরিবারের কোনো সদস্য না। তাই তিনি কোনো বিষয়ে আমাদের জোর করতে পারেননি, আবার আমাদের যা করা ঠিক মনে হয়েছে তাতে

বাধাও দিতে পারেননি। পারিবারিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকায় আমরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিয়েছি। আমার কাছে নারী হিসেবে এই স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা সবসময়ই ভালো লেগেছে। তবে এই ভালো লাগাটা ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, এই একা একা নেওয়া সিদ্ধান্তটা যে ভীষণরকমের ভুল—সেটা দেখার আগ পর্যন্ত। পরবর্তী সময়ে আমি যে সমাজটায় গেলাম, সেখানে অনেক মেয়েকেই দেখেছি ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়েই বিয়ে করে ফেলছে। মেয়েদের পরিবার অমুসলিম হলে বা দ্বীনদার না হলেও তারা এসব সিদ্ধান্তে নিজেদের জড়ায়নি। কাউকে তার সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করা হচ্ছে, কেউ হয়তো নিজের অধিকারটাই ছেড়ে দিচ্ছে, উল্টো যৌতুক দিচ্ছে, বা শর্ত মানছে, কারণ নিজেদের অধিকার আদায় করার মতো জ্ঞান বা সাহস তাদের ছিল না। এটাই আমাকে ইসলামি বিয়েতে পরিবারের ভূমিকা নিয়ে ভাবাল যে নিজেকে রক্ষা করতে পরিবার আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমের বাইরে প্রায় সব সমাজেই বিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারের চেয়ে অনেক বেশি পারিবারিক। এর মানে হলো পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের জীবনসঙ্গী খুঁজতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর কেনই বা রাখবে না? বিয়ে দুজন একক ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করার সাথে সাথে দুটো পরিবারের সাথেও সম্পর্ক তৈরী করে। সে কারণে আমি বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে এমন কারো সাথে আলোচনা করতে চাইলাম যার একটা ইসলামি পরিবার আছে। সে হচ্ছে রা'বিআ।

ও বলেছিল,

> "আমার পরিবার আমার জন্য বোনাস। আমি জানি তারা ছেলের ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর নেবে; ছেলে উপযুক্ত শর্ত মানছে কি না দেখবে, ছেলের নিজেকে একজন দায়িত্ববান পুরুষ হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। আমি এসব নিয়ে কখনোই ভাবি না কারণ জানি বাবা এসব দেখবেন। আমি ছেলের সাথে দ্বীন নিয়ে কথা বলব, ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলব। এই ফ্যামিলি সাপোর্টটার জন্য আমার নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয়। আর আমাকে তেমন কেউ সরাসরি প্রস্তাব দেয় না, এদিক দিয়েও নিরাপত্তা আছে। অনেকে আমার বাবা পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারে না।"

আমি জানতে চাইলাম এই যে তার বাবা এভাবে তার জন্য ছেলে বাছবিচার করেন এটায় সে বিরক্ত হয় কি না! সে অবাক হয়ে হেসে ফেলল এই প্রশ্নে।

> "একটা বেকার ছেলে, যে তার পরিবারের সাথে থাকে, যার কোনো কাজ বা যোগ্যতা নেই, দ্বীনে নতুন এসেছে, সে জানে এখানে এসে কোনো লাভ নেই। কারণ আমার বাবা প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করবে সে কিছু করে কি না। সে আমাকে কীভাবে দেখে রাখবে? আর আমি এমন কাউকেই চাই যার কাছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আছে।".

কিছু সমাজে মায়ের গর্ভে থাকতেই সন্তানের বিয়ে ঠিক করে রাখা হয়, অথবা বিদেশফেরত কোনো কাজিনের সাথে বিয়ে ঠিক করা হয়। কিছু বিয়ে থাকে যেমনটা

সাধারণত মানুষ মনে করে থাকে যে বিয়েটা পারিবারিকভাবে আয়োজন করা এবং সন্তানের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, কিংবা কিছু বিয়ে তো এমন হয় যে নিজের বিয়ের প্রক্রিয়ায় কেউ নিজে জড়িত থাকে না—তেমন কিছুই আমার সাথে ঘটেনি। আমি আমার স্বামীকে আগেই দেখেছি, হিজাব পরে; তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছি, একজন আরেকজনকে পছন্দ করেছি।

প্রথা অনুযায়ী পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়ে আর ইসলামি উপায়ে আয়োজিত বিয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে একজন আরেকজনকে পছন্দ করার জায়গাগুলো। ইতিহাস বলে, সারা দুনিয়াজুড়েই কোথাও বাচ্চা বয়সে বিয়ে ঠিক করে রাখা হয়েছে, কোথাও জন্মের পরপরই, কোথাও হয়তো ছেলেমেয়ের প্রথম দেখা হয়েছে বিয়ের রাতে, সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর। বিয়েকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজ্য রক্ষায়, ক্ষমতাবান পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে, বংশমর্যাদা বাড়াতে, পারিবারিক বন্ধন বাড়াতে, কখনো বা যৌতুকের জন্য। এই সব ক্ষেত্রেই জড়িত ছেলেমেয়েদের পরিবারের পছন্দের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, নিছক দাবার গুঁটির মতো, কিন্তু এই খেলা দাবার চেয়েও বড় খেলা। এমনকি আজও এশিয়ায় বা অন্য জায়গায় পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়ে হচ্ছে জোর করে দেওয়া বিয়ে, সেখানে কোনোরকম আপত্তি না করে পরিবারের পছন্দের ব্যক্তিকে জীবনসঙ্গী হিসেবে মেনে নিতে হয়।

সত্যিকারের ইসলামি উপায়ে আয়োজিত বিয়ে এসবের চেয়ে একদম আলাদা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ অনুযায়ী যে বিয়েতে ছেলে মেয়ে উভয়ের সম্মতি নেই সেটা বিয়েই হয় না। আর নিজের সন্তানের হয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেলার অনুমতিও কারো নেই। বরং ছেলে মেয়ে একে অপরের সাথে দেখা করে সিদ্ধান্ত নেবে একজনকে আরেকজনের পছন্দ হচ্ছে কি না। ছেলে বিয়েতে উপহার হিসেবে মেয়েকে মোহরানা দেবে, এটা বিয়ের অংশ। আর এই উপহার শুধুই মেয়ের, অন্যান্য সংস্কৃতির মতো মেয়ের পরিবারের না।

অর্থাৎ, ইসলামি বিয়ে হচ্ছে জোরপূর্বক বিয়ে আর সমাজে চলতে থাকা অবাধ মেলামেশার মাঝামাঝি একটি পন্থা।

আমি সবসময়েই ভেবেছি ইসলামি উপায়ে জীবনসঙ্গী খোঁজার অনেক সুবিধা আছে। অনেকগুলো বছর সম্পর্কে থাকা যেই মেয়ের দিক থেকে তার প্রেমিক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এই বলে যে—সে এখন বিয়ের জন্য প্রস্তুত না—সেই মেয়ে আসলে খুব ভালো বুঝবে এই ব্যাপারটা যে সরাসরি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া কত সুন্দর। আগ্রহী হলে বিয়ে, না হলে একজন ছেলে তার থেকে দূরে থাকবে।

আমি যখন কাউকে আমার "আয়োজিত" বিয়ের ঘটনা বলি, তারা অবিশ্বাসের চোখে অবাক হয়, বলে, "মানে তুমি কখনো তার সাথে একা সময় কাটাওনি? হাত ধরোনি?

দেখা হওয়ার তিনদিন পরই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ যে তাকে বিয়ে করবে?" আমি হাযারকে ইসলামি বিয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছিল,

> "এটা সব ফালতু জিনিস থেকে দূরে রাখে; নিজেকে অন্যরকম করে দেখানো, একজনকে সবসময় খুশি করার চেষ্টা, তার মনমতো চলতে চাওয়া, সব অনর্থক ব্যাপার থেকে মুক্তি দেয়।"

তবে এটা বলছি না যে ইসলামি উপায়গুলোতে কোনো সমস্যা নেই। এরকম হতেই পারে যে একটা ছেলে নিজেকে খুব ধার্মিক, ভালোমানুষ হিসেবে উপস্থাপন করল কিন্তু আসলে সে তেমন না, বরং পাশবিক, যে তোমার জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ছেলে সম্পর্কে মেয়ে এবং মেয়ের পরিবার খুব ভালোভাবে জেনে নেবে।

এরকমও হতে পারে সব পছন্দ হওয়ার পরও ছেলেকে দেখতে ভালো লাগছে না। এটাও একটা চিন্তার বিষয়, যেহেতু শারীরিক সৌন্দর্যের ব্যাপারটাও বিয়েতে গুরুত্বপূর্ণ।

> *"আমার অনেক বড় একটা দুশ্চিন্তা ছিল যে সে দেখতে কেমন হবে? আমার কি তাকে ভালো লাগবে? আমি কি তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারব? ভাবছিলাম সে আমার ব্যাপারেও ঠিক এমন চিন্তা করবে কি না।"*
>
> *—সাফওয়া*

শরিয়তে আল্লাহ আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন। ইসলামি উপায়ে স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারেও দিকনির্দেশনা আছে। নিচে কিছু দিকনির্দেশনা লেখা হলো। এর সবগুলোই সরাসরি শরিয়ত থেক নেওয়া না, আমার এবং অন্য মেয়েদের অভিজ্ঞতার আলোকেও কিছু আছে-

❒ বিশুদ্ধ নিয়ত রাখা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর নির্দেশ মেনে আরো বেশি তাঁর ইবাদাত করতে বিয়ে করা। যদি অন্য কোনো নিয়ত থাকে, যেমন একটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাওয়া বা কারো বিয়ে ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি, তাহলে নিজের পক্ষে আল্লাহর রহমত আশা করার দরকার নেই।

❒ নিজের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে জানা উচিত। একজন মুসলিম হিসেবে কোনো কিছু করার আগে তা সম্বন্ধে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ইসলামি বিয়ের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করে নিন, নিজের এবং জীবনসঙ্গীর অধিকারগুলো জানুন, সেগুলো পুরণ করতে প্রস্তুতি নিন, অন্তত মানসিকভাবে।

❒ পরিবারকে পাশে রাখুন। তাদের দূরে সরিয়ে দেবেন না, তারা মুসলিম হোক বা না হোক। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তারা না থাকলেও বিয়ের অনুষ্ঠান এবং আনুষঙ্গিক কাজে তাদেরকে রাখুন। পরিবারের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকলে এবং তাদের পাশে রাখলে ছেলে ব্যাপারটাকে আরো গুরুত্ব দিবে এবং আপনার সিদ্ধান্তকে সম্মান করবে।

❒ বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোমতো খোঁজখবর নেওয়া উচিত। এটাকে একটা বিনিয়োগের মতো ভাবুন। কোথাও এক লাখ ডলার বিনিয়োগ করার আগে আপনি নিশ্চয়ই ঐ কোম্পানি, তার পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কোম্পানির অতীত, তাদের সুনাম বা দুর্নামের ব্যাপারে খোঁজখবর নেবেন। বিয়ের ব্যাপারেও এভাবেই ভাবুন। ছেলের ব্যাপারে খবর নিন, তার বন্ধুদের থেকে, আপনার বন্ধুদের সাহায্য নিন, তার শিক্ষক, সে কাদের সাথে মিশে ইত্যাদি ব্যাপারে। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

❒ সম্পর্কটা স্বচ্ছ রাখুন। কোনো ধরনের জিনায় জড়ানোর মানসিকতা যেন না থাকে। তার সাথে একা দেখা করা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা, বারবার ছবি দেখা এসব এড়িয়ে চলুন। এগুলো করার অনুমতি নেই শুধু এ কারণে এড়াবেন, এমন না। নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বেড়ে গেলে আপনাকে অনেক কিছুতে আপস করতে হতে পারে।

❒ সৎ থাকুন। আপনি কী কী করতে পারেন, স্বামী হিসেবে তার কাছ থেকে কী কী আশা করেন, সেগুলো নিয়ে কথা বলুন। সে কী চায় তা নিয়েও কথা বলুন। এমনটা আশা করবেন না যে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে, সপ্তাহের ছুটির দিনে দামি দামি হোটেলে থাকবে—অথবা এগুলোর কিছুই করবে না। সব মুসলিম পুরুষ একরকম হয় না, সব মুসলিম নারীও একরকম হয় না। আপনি সবসময় ঘরে থাকা গৃহবধূ হতে চাইলে সেটা খুলে বলুন; কাজ করতে বা পড়াশুনা চালিয়ে যেতে চাইলে সেটাও বলুন। নিজে নিজে ধারণা করে বিয়ে করে নিলে ভুল হতে পারে, আর তাতে বেশ সংঘর্ষও তৈরী হবে। আপনি হয়তো এমন কাউকে বিয়ে করলেন যে চাইল তার বউ মিসেস ক্লিভারের মতো চমৎকার গৃহিণী হবে অথচ দেখল তার বউ মার্থা স্টুয়ার্ট, একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী।

❒ নিজেকে সস্তায় বিকিয়ে দেবেন না। আপনি কী চান, সেগুলো যদি ইসলামি আইনমতে বৈধ হয়, তাহলে চুক্তিনামা এবং মোহরানায় সেগুলোর কথা বলতে ইতস্ততবোধ করবেন না। খুব বেশি বড় মানের মোহরানাও চাবেন না, রাসূল (সা.) এমন করতে নিষেধ করেছেন। আবার নিজের দাম খুব কমিয়েও ফেলবেন না। মোহরানা আপনার অধিকার এবং এখানে কর্তৃত্ব করবার অধিকার কারো নেই। আপনাকে পাওয়ার জন্য একটু কষ্ট করতে ছেলে কষ্ট পাবে না। তবে যিনি বাস চালান, তার কাছে আরব ধনকুবেরদের মোহরানাও চাইবেন না।

❒ ইস্তিখারা করুন। আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার নামাজ। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দুই রাকাত নামাজ পড়ে ইস্তিখারার দুআ পড়ুন। যাতে আল্লাহ আপনার পথ সহজ করে দেন। বিয়েটা যদি আপনার এবং আপনার দ্বীনের জন্য ভালো না হয়, তাহলে আপনি বাধা বিপত্তির মুখে পড়বেন, বুঝতে পারবেন এই মানুষটা আপনার জন্য সঠিক মানুষ না।

দেখা হওয়ার তিনদিন পর আমি যখন আমার স্বামীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেই, তখন ইস্তিখারা করে কোনো ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছিলাম। পরদিন আমার মা'কে ফোন দেই বিয়ের কথা বলার জন্য। মা সবসময়ই আমাকে বলেছেন বয়স সাতাশ হওয়ার আগে বিয়ে না করতে। আমার বয়স তখন বাইশ, একটু নার্ভাস লাগছিল। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, "জানো, কেন জানি না, আমার ভালো লাগছে তোমার এই ব্যাপারে।" এটাকেই আমি ভালো ইঙ্গিত ধরে নিলাম।

□ আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনি আন্তরিকভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চললে আল্লাহ আপনার জীবন সুন্দর করে দেবেন, বিয়েতে সফলতা দেবেন। কী হবে, কী হতে পারে এসব নিয়ে বেশি বেশি ভাববেন না। আস্থা রাখুন আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর স্মরণ, দুআ, ভালো কাজ এসবের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো রাখুন।

আমার পরিচিত মেয়েদের অধিকাংশই ইসলামিভাবে আয়োজিত বিয়ে করেছে, খুব সুখের জীবন যাপন করছে। উম্মে তাসনিমের সঙ্গে তার স্বামীর দেখা এবং বিয়ে হয়েছে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে। কিন্তু তার গল্পটা যেকোনো মুসলিমকে মুগ্ধ করে, অমুসলিমকে অবাক করে। তার আগের স্বামীর মেয়ের বয়স তখন ছিল ছয় বছর। বেশ কজন ছেলের সাথে দেখা হওয়ার পর কিছু ঠিকঠাক না হওয়ায় উম্মে তাসনিম আশা ছেড়েই দিয়েছিল। একদিন নতুন একজন ছেলের ব্যাপারে জানল যে একটা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, ছোট একটা ব্যবসা আছে, ভদ্র, বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজছে। সবাই তার ব্যাপারে ভালো বলছিল। উম্মে তাসনিম তার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল। দেখা করলও। অন্য একজনের সন্তানকে দেখাশুনা করতে কেমন লাগবে এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটা সেই উত্তরই দিল যা উম্মে তাসনিম এতদিন ধরে শুনতে চাচ্ছিল কিন্তু কেউ বলেনি। ছেলেটি বলেছিল, "হাদিসে আছে, যে একজন এতিমকে দেখাশুনা করে, সে জান্নাতে রাসূল (সা.) এর কাছাকাছি থাকবে।" এই কথাতে উম্মে তাসনিমের হৃদয় গলে যায়। অন্যরা আগে থেকেই বলছিল যে সে রাজী হবে, সে আসলেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে যায়। আর আগের ছেলেদের কাউকেই তার মেয়েও পছন্দ করেনি কিন্তু এই ছেলেটার ব্যাপারে তার মেয়েই মা'কে বিয়ে করতে জোর দেয়, কারন সে-ই ছিল "সে"। আর ছেলেটারও মনে হয় এ-কেই বিয়ে করার জন্য খুঁজছে, অথচ তার চেহারাও সে দেখেনি। যাই হোক, চেহারা দেখেছিল এবং এক সপ্তাহ পরে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। ছয় বছর ধরে তারা বিবাহিত,। ক'জন সন্তানও আছে। এখনো এই গল্প বলার সময় উম্মে তাসনিমের চেহারা জ্বলজ্বল করে।

এক অনন্য ভালোবাসা

বাইরের দুনিয়া ভাবে ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগ মনে হয় আমাদের নেই। একসাথে মেয়েরা গল্প করলে ভালোবাসা নিয়ে আলোচনাটা খুব আকর্ষণীয় হয়, অন্যদের ভাবনার প্রতি একটা বিদ্রুপও। যত যা-ই হোক, শেষ করবে একটা মুসলিম জুটিকে

দেখেছেন, যেখানে মেয়েটা নিকাব পরা, ছেলেটা দাঁড়ি-জোব্বা পরা, তারা জনসমক্ষে হাত ধরছে, বা জড়িয়ে ধরছে অথবা চুমু খাচ্ছে? ঠিক, কখনো দেখেননি। তাই হয়তো ইসলামি বিয়ের ব্যাপারে এমন ধারণা চিত্রিত হয় যে এই বিয়ে জোরপূর্বক হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়, নিয়ম-নীতিতে ভরা, দায়িত্ব পালন করতে হয়, ভুক্তভোগী হতে হয়, তাতে আমি অবাক হই না। এরকম শুকনো কটকটে ব্যাপারে প্রেম, ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা থাকবে কী করে?

যেসব ধ্যান ধারণা নিয়ে আমরা বড় হয়েছিলাম, অনেকেই ইসলামে আসার পরও তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। সিনেমা, গান, বই দিয়ে যে মানসিকতা পশ্চিমে প্রবেশ করেছিল, তা খুব সাধারণ, 'ভালোবাসা দুনিয়াকে উল্টে দেয়'। ছোটবেলা থেকে রূপকথার গল্প আর নানান অভিজ্ঞতায় মেয়েরা শেখে জীবনের 'সত্যিকারের ভালোবাসার' জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। 'প্রথম দেখায় ভালোবাসা' ব্যাপারটায় আমরা সবাই বিশ্বাস করতাম একসময়, আর বিশ্বাস করতাম 'ভালোবাসা সবকিছুকে জয় করে নেয়', 'একমাত্র সত্যিকারের ভালোবাসাকে খুঁজে বের করা। যেকোনো যুগের পপ চার্টের দিকে তাকালেই পশ্চিমে ভালোবাসার এই ব্যাপারগুলো নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তো কেউ যখন ইসলামে আসে, তখন ভালোবাসা, প্রেমের ব্যাপারগুলো তার কাছে কেমন হয়?

হ্যাঁ, কিছু ব্যাপারে মিল থাকে, যেমন প্রেম, ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি। কিন্তু ভালোবাসার ইসলামি রূপটা জাহিলিয়্যার সময়ের চেয়ে আলাদা। এই ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা অর্থাৎ একজন মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ যা যা ভালোবাসেন, সেগুলোর জন্য তাকে ভালোবাসা—তার ঈমান, তার আত্মসমর্পণ, তার তাকওয়া, ইসলামি আচরণ, ভালো চরিত্র, তার মজবুত দ্বীন। এই ব্যাপারগুলো একজন মানুষের ব্যাপারে তার অন্য যেকোনো দুনিয়াবী ব্যাপারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

এক সন্ধ্যায় এসব নিয়ে কথা বলার সময় ঘানিয়াহ বলেছিল, "ইসলামে ভালোবাসা আর আগের সময়টায় ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইসলামে তুমি একজন মানুষকে ভালোবাসবে আল্লাহর জন্য, আর জাহিলিয়্যার সময়ে ভালোবাসাটা ছিল নিজের মনের জন্য, কারণ তোমার মন, ইচ্ছা এসবের সাথে ঐ মানুষটা জড়িয়ে যায়।"

ক্লেয়ার এর সাথে টাকা-পয়সা, মর্যাদা, সুবিধা, শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলো যোগ করে। কিন্তু ঘানিয়াহ বলেই চলছিল, "সে হয়তো দেখতে ব্র্যাড পিটের মতো, অথবা খুব পয়সাওয়ালা (তার লাহোরি উচ্চারণে খুব সুন্দর করে বলছিল) অথবা কেউ একজন ডাক্তার, বা ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট অথবা এমন কিছু যা দেখে তোমার মা বাবা খুশি হয়।" অন্যরা হেসে হেসে তার কথায় সম্মতি দিচ্ছিল।

"জাহিলিয়্যায় সব ধরনের ব্যাপারই মানুষকে প্রভাবিত করে—মা বাবার চাওয়া, তুমি যেসব মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠেছ, তা। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো ছিল যোগ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা ইত্যাদি। এগুলো অগভীর ব্যাপার। প্রথম যখন দ্বীন মানা শুরু

করলাম, এরকম চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে আসাটা আমার জন্য খুব কষ্টকর ছিল। বিশ্বাস আর দ্বীনের বুঝ বাড়তে থাকলে আমি আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে শিখলাম। বাইরের চাকচিক্যে প্রভাবিত না হয়ে বুঝতে শিখলাম একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে আল্লাহর প্রতি তার আত্মসমর্পণ। আমার স্বামীর সাথে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তার এমন কিছুই ছিল না যা আমি জাহিলিয়্যার সময়ে খুঁজতাম। কিন্তু তার মধ্যে যে মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, তা ছিল ওসবের চেয়েও অনেক সুন্দর। কারণ আমি তখন আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসতে শিখেছি।"

—সারা

আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা অন্য যেকোনো কারণ বা স্বার্থের কারণে কাউকে ভালোবাসার চেয়ে অনেক ভালো। প্রথমত, ব্যক্তিগত ঝোঁক বা ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথে এই ভালোবাসার কোনো নড়চড় হয় না, এটা ধ্রুবক—যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মানুষটা আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এটা হচ্ছে এমন ভালোবাসা যা একজনকে তার সঙ্গীর অধিকার দিতে বাধ্য করে, সে ব্যক্তিগতভাবে দিতে না চাইলেও। আল্লাহ বলেন-

"নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা নিসা, ৪:১৯)

"সেভাবে আল্লার ইবাদাত করা উচিত সেভাবে যদি সে আল্লাহকে ভয় করে ভয় করে, তাহলে সে তোমার সাথেও ভালোভাবে থাকবে কারণ সে জানে তুমি আল্লাহর বান্দা, সে নিজেও আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন স্ত্রী হিসেবে সে তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছিল কি না। সে জানে তাকে আল্লাহর কাছে ফিরতে হবে।"

—ঘানিয়াহ

মানুষ প্রায়ই 'লাভ ম্যারেজ' আর 'অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের' মধ্যে এমনভাবে পার্থক্য করে যেন এই একটা আরেকটার বিপরীত। আমার বিয়ের সময় আমি জানতাম ব্যাপারটা তা না। বেশিরভাগ মানুষ মনে করে নিজেদের চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করা, একসাথে সময় কাটানো, শারীরিক ঘনিষ্ঠতা এসবের মাধ্যমে ভালোবাসা বাড়ে। আর আমরা মুসলিমরা ভাবি ভালোবাসা হচ্ছে এমন এক বীজ যা আল্লাহ তাআলা—যিনি আল ওয়াদুদ, প্রেমময়—তিনি মানুষের অন্তরে রোপণ করে দেন। তো আল্লাহই মানুষের অন্তরকে কাছাকাছি আনেন এবং ভালোবাসা সৃষ্ট করে দেন। এ থেকেই আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের বিয়েও ভালোবাসাপূর্ণ হবে। এখন বাইরে থেকে যদি মনে হয় ভালোবাসা তৈরী হওয়ার মতো কিছুই আমরা করিনি, তা-ও। কিন্তু খাঁটি

নিয়ত, সিজদায় করা ফিসফিস, একসাথে আল্লাহকে মানতে চাওয়া, স্পর্শ, এই ব্যাপারগুলোই দুজনের মাঝে ভালোবাসা তৈরী করে।

আমার বিয়ে

তারিখ নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনার পর, প্রথমে রমজান, তারপর সেপ্টেম্বর, তারপর আগস্ট, তারপর এপ্রিল, শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির এক সকালে আমি ঘুম থেকে উঠলাম উত্তেজনায় তোতলাতে তোতলাতে, আমার বিয়ের দিনে। আমার প্রিয় হায়াত, যার সাথে আমি একই ফ্ল্যাটে থাকতাম, সে আমার জন্য বেশ ভালো নাস্তার আয়োজন করে রেখেছিল—ফ্রেশ স্ট্রবেরি দিয়ে সিরিয়াল, খুব সুন্দর একটা গ্লাসে কমলার জুস। আমি একটা খাকি রঙ এর আবায়া বানিয়ে রেখেছিলাম এই দিনের জন্য, সাথে গাঢ় বেগুনি রঙ এর একটা চাইনিজ হিজাব, চিকচিক করে এমন। তবে চিরাচরিত মুসলিম বিয়েগুলোর চেয়ে আমারটা কিছু এলোমেলো ছিল। এর আগের সপ্তাহে আমার মেহেদী উৎসব হয়, এক সুদানি মেয়ে আমার হাতে, পায়ে নকশা করে মেহেদী লাগিয়ে দেয়। বুখুর (bukhoor) নামক সুগন্ধি লাগিয়ে একসাথে সবাই ঘণ্টা ধরে বসে থাকা হয়নি, উষ্ণ গোসল, হাত পায়ের পশম উঠানো কিছুই না। খুব রান্নাবান্না বা বড় কোনো পারিবারিক উৎসব হয়নি, ইংল্যান্ড এবং সারা দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে আত্মীয়স্বজনও আসেনি। খুব শান্ত, সাধারণ আয়োজন। একটা ইসলামি বইয়ের দোকানের বেজমেন্টে আমার বিয়ে হয়, একপাশে সহিহ বুখারি, অন্যপাশে কম্পিউটার। এটাই আমার বিয়ে।

বিবাহোৎসব

'নিকাহ' হচ্ছে মুসলিমদের সাধারণ বিয়ের আয়োজন। বর এবং বরের অভিভাবকেরা থাকে, কনে থাকে, কখনো বন্ধুরা থাকে, আর পরিবারের অন্য সদস্যরাও। বিয়ের চুক্তিপত্র উপস্থাপন করা হয়, সাক্ষী রাখা হয়। মোহরানাও বলা হয়, সাক্ষী রাখা হয়। ব্যস, এটুকুই।

পশ্চিমার বিয়ের সাথে তুলনা করলে এইরকম বিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত আকারের, খরচও কম।

বিয়ের চুক্তিপত্রে মেয়ে কিছু শর্ত দেয় যা ছেলে মেনে নেয় এবং বিয়ের আগে স্বাক্ষর করে। এতে চাকরির ব্যাপারে কথা থাকে, পুনর্বিবাহ, দেশ ছেড়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারেও লেখা থাকে। মানে মেয়ে যেসব ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়, সেসবকে সম্মান করা হয় এবং মানা হয়। ইসলামি আইন অনুযায়ী, এই চুক্তিনামা পূরণ না করা তালাকের ভিত্তি তৈরী করে।

মোহরানা হচ্ছে অন্য সংস্কৃতির যৌতুক এবং লোবোলার (lobola) মতো। পার্থক্য হলো এটা মেয়েকে দেওয়া হয়, মেয়ের পরিবারকে না। সে তার ইচ্ছামতো টাকার অংকে চাইতে পারে, বা অন্যভাবে। মোহরের কিছু উদাহরণ হলো মেয়ে চাইতে পারে

যে তাকে কুরআন শেখানো হবে বা দ্বীনের অন্য কিছু শেখানো হবে। অথবা টাকা চাইতে পারে, বা স্বর্ণ, গহনা, বই, কাপড়চোপড়, ঘরের জিনিসপত্র বা ঘুরতে যাওয়া। উম্মে তাসনিমের মোহরের একাংশ ছিল সৌদী আরবে উমরাহ করতে যাওয়া।

নিকাহ হচ্ছে ছোটখাটো ঘরোয়া আয়োজন। আর ওয়ালিমা এর পুরোই বিপরীত। ওয়ালিমা হলো বিয়ের উৎসব। এটা হচ্ছে সামাজিকভাবে বিয়ের ঘোষণা দেওয়া যে এই দুইজন এখন বিবাহিত, এখন আনন্দ করার সময়। এই অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়া হয়, নারী শিশুরা দফ বাজিয়ে গান গায়।

প্রথম একটা ওয়ালিমায় যাওয়ার কথা আমার মনে আছে। মেয়েরা সপ্তাহভরে পরিকল্পনা করছিল কে কী পরবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ঐ রাতটা হবে গোলাপি রঙ এর রাত—গোলাপি ট্রাউজার স্যুট, গোলাপি-লাল সালওয়ার কামিজ, গোলাপি-সোনালি কাজ করা স্কার্ট, গোলাপি শাড়ি। শুভকামনায় মেয়েদের চেহারা উদ্ভাসিত লাগছিল। ওরা সুন্দর করে সেজেছিলও, কানে দুল, হাতে, আঙুলে সোনা রূপার গহনা। উত্তর আফ্রিকার সুস্বাদু খাবার ভোজনপর্ব শেষে কনে জামা বদলাতে গেল। এটা আলজেরিয়া ও মরক্কোর বিয়ের সংস্কৃতি। আমরা কিছু বাচ্চা মেয়েকে দাঁড় করালাম মেয়ের চারপাশ ঘিরে রাখতে, নিজেরা দুটো সারিতে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে সিঁড়িতে আসলো, মরক্কান জালাবিয়্যাহ পরনে, এর হুড দিয়ে মাথা ঢাকা। সে ঘরে ঢুকার সাথে সাথে একজন মেয়ে উল্লাস করে উঠল, দফ বাজাল। আমরা তার নাম দিয়ে গান লিখেছিলাম, সেটা গাওয়া শুরু করলাম। কনের বসার জন্য কুশন দিয়ে সুন্দর করে আসন সাজানো হয়েছিল, সেখানে বসার আগে সে কয়েকবার পুরো ঘর ঘুরে আসলো। এরপর আমরা গান গাইলাম, গল্প শুনালাম, উপদেশ দিলাম, নাচলাম, আরো গাইলাম। গভীর রাত পর্যন্ত। এখনো সেই মেয়েটা তার ওয়ালিমার কথা মনে করে মুচকি হাসে—সুন্দর একটা স্মৃতি, বন্ধনের, হাসির, আনন্দের—যা তার বিবাহিত জীবনে প্রবেশকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

বিয়ের অন্যান্য দিক

বিয়ে হয়ে গেল। দুজন অচেনা মানুষ, প্রথমবারের মতো একসাথে, একদম একা। সেই প্রথম দিন-রাতগুলোর লাজুকতা, প্রতীক্ষা আর শিহরিত হওয়ার অনুভূতি বর্ণনা করার মতো কোনো উপায় কি আছে? নব বিবাহিত দম্পতি একজন আরেকজনের কাছে অচেনা, পশ্চিমে এমনটা হয় না সাধারণত। কিন্তু একটি ইসলামিক বিয়ের প্রথম দিনগুলো হচ্ছে একজন আরেকজনকে আবিষ্কার করার দিন—বিস্মিত, মুগ্ধ হবার দিন। একজন আরেকজনকে চেনা—আধ্যাত্মিকভাবে, মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে। বেশিরভাগ সময়ই বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকা শুরু করে। কিন্তু নতুন বাসা নিতে দেরী হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু না। এই সময়টা নববিবাহিতদের জন্য দারুন সময়। দায়িত্ব পালনের বা একজন আরেকজনের জীবনে ঢুকে পড়ার চাপ নেই; স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে বন্ধু বা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো সম্পর্কটাই বেশি থাকে। এই সময়টায় একজন আরেকজনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে নিতে পারে, একজন আরেকজনকে জানতে পারে, হাঁটতে যেতে পারে, ডেটিং এ যেতে পারে, ভালোবাসতে পারে—সে এক অসাধারণ সময়।

বিয়ে ইত্যাদি আয়োজন শেষ হবার পর শুরু হয় আসল সময়। নতুন মুসলিম হিসেবে আমি আর আমার বন্ধুরা জেনেছি যে ইসলামিক বিয়ের সাথে অনেক দায়িত্ব আর অধিকার জড়িত থাকে। আর যেহেতু এগুলো স্রষ্টাপ্রদত্ত, এগুলোকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

এই ব্যাপারগুলো কী কী?

বিয়ের সাথে জড়িত অধিকার ও দায়িত্ব

এসব আলোচনা একেবারেই বৃথা, যদি কেউ এই ব্যাপারটা মাথায় না রাখে যে আল্লাহর কাছে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মর্যাদাই সমান। ভালো কাজের জন্য তারা একই পুরস্কার পায়, খারাপ কাজের জন্য শাস্তিও একই। এটা হয়েছে রাসূল (সা.) এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রা.) এর জন্য। তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন আল্লাহ কেন কুরআনে ছেলেদের কথা বলেছেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়-

> "আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৯৫)

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালণকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।" (সূরাহ আহযাব, ৩৩:৩৫)

নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দ্বীনী পড়াশুনা করা, মসজিদে যাওয়া, যাকাত আদায় করা-কোনোক্ষেত্রেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আলাদা নয়। শুধুমাত্র শারীরিক কষ্টের কিছু ব্যাপার ছাড়া—পিরিয়ড, সন্তান জন্মদান, প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ। একজন পুরুষ যেমন দ্বীন নিয়ে পড়াশুনা করবে, একজন নারীও। দুজনেই নিজেদের নামাজকে আরো) সুন্দর করার চেষ্টা করবে, অন্তর পরিশুদ্ধ রাখবে, ভালো কাজ করবে। বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একজন নারীর ব্যাপারে যা আশা করা হয়, এজন পুরুষের বেলায়ও তা-ই। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের মতো ইসলামে নারীকে কখনোই পাপের মূল, পুরুষের জন্য ক্ষতির কারণ বা অশুভ আত্মার অধিকারী বলেনি। অনেক মানুষই এই দিকটা খেয়াল করে না, কিন্তু এটাই আমাকে সবসময় মানসিক প্রবোধ দিয়েছে।

মর্যাদা একই হলেও সমাজে নারী-পুরুষের কাজ ও ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন। সে কারণে তাদের অধিকারগুলো কখনো কখনো আলাদা হয়। ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রেও ছেলের দায়িত্ব মেয়ের দায়িত্বের চেয়ে আলাদা। এর মানে হলো স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা আলাদা হওয়ার কারণেই ছেলে ও মেয়ের অধিকারগুলো আলাদা আলাদা।

ইসলামি আইনে একজন নারীর নিজের সম্পদের উপর অধিকার আছে, বৈধ পরিচয়েরও অধিকার আছে। এর সাথে আছে স্ত্রী হিসেবে ভালো আচরণ পাওয়ার, তার সমস্ত প্রয়োজন পুরণ হওয়ার অধিকার। তার স্বামী যা খায়, যা পরে, যেখানে থাকে, সেই একইরকম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সন্তান জন্মদানের অধিকার আছে তার। আর দায়িত্ব হলো সন্তান লালন এবং ঘর দেখে রাখা। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করবেন।

তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর বা নেতা তার অধীনস্থ লোকদের উপর দায়িত্ববান এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের উপর দায়িত্বশীল, সে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বাড়ী ও সন্তানের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মুনিবের মাল-সম্পদের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ওহে! তোমাদের প্রত্যেকেই (স্ব-স্ব স্থানে) একজন দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।—সহিহ বুখারি

ইসলামে সব দলেরই একজন নেতা থাকে, নারী অথবা পুরুষ। কেউ না কেউ অন্যদের ব্যাপারে দায়িত্ববান—কোনো দেশে, মসজিদে, ব্যবসায় অথবা ঘরে। কোনো ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অন্যদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করা হয়, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। উদাহরণস্বরূপ একজন নারী ব্যবসায়ী তার কর্মচারীদের সাথে ব্যবহারের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, সততার প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হবে আর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারেও।

ইসলামের পরিবারের মাথা হচ্ছে স্বামী। যদিও সে পরিবারের সবার সমস্ত বিষয়ে একক অভিভাবক না, তবে চূড়ান্ত পর্যায়ের দায়িত্ববান সে-ই। আল্লাহ এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করবেন।

স্বামীর অধিকার হচ্ছে বাড়ির ভেতরে তার প্রয়োজনগুলো পূরণ হবে—তার জন্য রান্না করা থাকবে, কাপড় পরিষ্কার, গোছানো থাকবে। এই ঘরোয়া মেয়েলি কাজগুলো আমার কাছে 'আদিকালের' মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আমি জানতে পারলাম যে এখন যেসব কাজকে মেয়েদের কাজ ভেবে মর্যাদাহানিকর ভাবা হয়, সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। একজন নারীর যত্নে একটা বাড়ি স্বর্গের টুকরোয়, প্রশান্তির জায়গায় পরিণত হয়—যেখানে ঢুকলে সারাদিনের ক্লান্তি উধাও হয়ে যায়। স্বামীর খেয়াল রেখে যত্ন করার জন্য একজন স্ত্রী পুরস্কার পাবে। স্ত্রীর খেয়াল রাখার জন্য স্বামীও পাবে। নিয়ত সুন্দর থাকলে এই দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামে লজ্জার কিছু নেই। আর আমি বলি কী, যে বেচারা আমার প্রয়োজন, চাহিদা পূরণের জন্য সারাটাদিন কষ্ট করে এলো, তার জন্য খাবারটা রেডি করে রাখা কি খুব বেশি কিছু? ভালোবাসার ঘরটা গুছিয়ে রাখা? নিজেদের সুন্দর জামাগুলো ঠিকঠাক রাখা? এত কঠিন কিছু তো না।

স্ত্রীর মতো স্বামীরও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সন্তান চাওয়ার অধিকার আছে।

কিন্তু স্বামীর আরেকটা অধিকার আছে—সমস্ত ভালো ব্যাপার এবং যেসব ব্যাপার শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক না, সেসব ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর কথা অবশ্যই মান্য করবে।

মান্য করবে?

মানবে, কেমন মানা? বাচ্চার মতো? অধীনস্থের মতো? দাসের মতো? কাকে মানবে?

মিথ্যে বলব না, শেষের কথাটা আমাকে থমকে দিয়েছিল। আমার ঈমানের সবটুকু দিয়ে এটা মেনে নিতে হয়েছে। আমি যেসব চিন্তাভাবনা নিয়ে বড় হয়েছি, যা শিখেছি, যা করতে চেয়েছি তার সাথে এটা ছিল ভীষণ সাংঘর্ষিক। আমার মা মেইয়ের মায়ের মতো ছিল না, যিনি মেইকে বলেছিলেন—"বিয়ের পর তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, স্বামীর সাথে। তাকে মেনে চলবে..."

আমাকে এমন উপদেশ কেউ কখনো দেয়নি, আমি চাইওনি। আমি যেমন ছিলাম, সেখানে এই ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি এলিয়েন।

> 'যদি নারী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পড়ে; তার (রমজান) মাসের রোজা করে; নিজ লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে : তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর।' (আহমদ, আত তাবারানি)

ব্যাপারটা আমি কীভাবে মেনে নিয়েছিলাম? বেশ কষ্ট করে, মনের সাথে বোঝা-পড়া করে, পড়াশুনা করে, বুঝতে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত, আত্মসম্পর্ণের মাধ্যমে। নিজেকে বারবার আল্লাহর বাণী মনে করিয়ে দিতে হয়েছে-

> "...তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।" (সূরাহ বাকারা, ২:২১৬)

সেইসাথে আমি এ-ও বুঝতে পারলাম, একজন দ্বীনদার স্বামী পাওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যে আল্লাহকে ভয় করে, যে একজন শাসকে পরিণত হবে না, অত্যাচারী রাজার মতো লৌহদন্ড ঘুরিয়ে রাজ্য শাসন করতে চাইবে না। আমার তরুণী মন নিশ্চিত করতে চাইল, যে আমার স্বামী হবে সে জানুক আমি এরকম কিছু মানব না যে আমাকে অর্ডার করবে, বা আমাকে ছোট করে কথা বলবে। যদিও সে এধরণের আচরণ করার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও দেয়নি, আমি তবুও ছাড় দেইনি। যতবার কথা বলেছি ততবার এই বিষয়ে সতর্ক করেছি। একদিন সে বলল, "আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি, ওকে?" আমিও বুঝতে পারলাম যে সে বুঝেছে।

নির্যাতক/নির্যাতিতা

একজন দাঁড়িওয়ালা পুরুষ আর পর্দা করা মেয়ে হেঁটে গেলে সাধারণত এই চিত্র মাথায় আসে যে একজন ক্ষমতাবান একজন দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব করছে, দুর্বল মেয়েটা আত্মসমর্পণ করেছে।

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি লোকটা জোর করে মেয়েটাকে এই পোশাক পরিয়েছে!"

ঐ নারীর খুবই দুর্ভাগ্য যে যদি হাঁটতে গিয়ে সে কোনো কারণে স্বামীর পেছনে পড়ে যায়, "দেখো, লোকটা মেয়েটাকে পেছন পেছন হাঁটাচ্ছে, দশ কদম দূরে রেখে।"

যদি মেয়েটার হাতে বাজারের ব্যাগ থাকে আর লোকটা হাতে বাচ্চাকে ধরে, তাহলে "গাধার মতো ব্যবহার করে মেয়েটাকে, না?"

আর যদি মেয়েটার কাছে বাচ্চা থাকে আর ছেলেটার কাছে বাজার, "বাজি ধরে বলতে পারি, মেয়েটার কোনো অবসর নেই। খালি জন্ম দিয়েই যাচ্ছে।"

ব্যাপারটা এমন যে, দৃশ্যটা যেমনই হোক না কেন, মাথার মধ্যে যে চিন্তা আগে থেকে ঢুকে আছে, সেভাবেই মুসলিমের বিচার করবে। এ হচ্ছে "মিলার ও তার গাধা" গল্পের নিত্যদিনের চিত্র।

ক্লেয়ার বলেছিল, "মানুষ বিশ্বাস করে যে ইসলামে পুরুষই সর্বেসর্বা। মেয়েদের নিজের কোনো মতামত নেই, পছন্দ নেই, তাকে যা করতে বলা হয়, সে তা-ই করে। তার নিজের কোনো পরিকল্পনা নেই, নিজের একটা জীবন নেই।"

এই কথা এমন এক মেয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, যার শিরায় বিদ্রোহী কেল্টিক রক্ত প্রবাহিত হয়, সে এই কথাগুলো ব্যঙ্গ করে বলতে পারত। কিন্তু অধিকার, দায়িত্বের বাইরে কি আসলে কোনো জীবন আছে?

অধিকারের ওপাশে

ইসলামে বিয়ে দায়িত্ব ও অধিকারের চেয়ে অনেক অনেক বেশি কিছু—ওগুলো তো শুধু ভিত্তি। অধিকার সবার প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে—ভালোবাসা, প্রেম বা বন্ধুত্ব তৈরী হওয়ার আগেই। আর কর্তব্য হচ্ছে লম্বা পথ, ভালোবাসা চলে গেলেও পালন করতে হবে। এসবের অন্যপাশে আছে স্বর্গ, আর সব সংস্কৃতি ও ধর্মের বিয়ের মতোই। যদিও মুসলিমের মধ্যে ভালোবাসার ব্যাপারতা শরিয়াহ ব্যাখ্যা করে, তবে এটা অন্যদের মতোই আবেগপূর্ণ, মিষ্টি, কোমল। যেমনটা রাসূল (সা.) বলেছেন,

> 'পূর্ণ মুমিন সেই যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' (তিরমিযি, ১১৬২)

ঘানিয়াহ বলেছিল, দুনিয়াবী ব্যাপারগুলোয় আমার স্বামী আমার অভিভাবক, সবচেয়ে ভালো বন্ধু, পরামর্শদাতা, আমার পাঞ্চ ব্যাগ, আমার ব্যাংক! সে এমন একজন যার সাথে আমি শিখি, কোনো সমস্যা হলে আলোচনা করি। আমাদের স্বামীরা আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড। যদিও আমরা আমাদের মেয়ে বন্ধুদের পছন্দ করি, দিনের কিছুটা সময় নিজের জন্য কাটাই, কিন্তু জামাই আমাদের কাছে অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ আমাদের দুজনকে সুখী করেছেন।"

> *"আমার জামাইকে দেখলে মনে হয় ওকে মাত্র তালিবানদের কাছ থেকে ছুটিয়ে এনেছে। ওকে সব দিক থেকে দেখতে আফগান লাগে। কিন্তু সে হচ্ছে এই দুনিয়ার সবচেয়ে ভদ্র, সবচেয়ে ভালোবাসার, সবচেয়ে চমৎকার একজন মানুষ, মাশাআল্লাহ। আহা সবার স্বামীই যদি এমন হতো!... আবার আমারটা নিয়ে নিও না!"*
>
> *—বেগম*

আমি ভেবেছিলাম ছেলেরা যেসব কাজকে 'মেয়েদের কাজ' বলে, সেগুলোর ব্যাপারে একজন মুসলিম স্বামী নির্লিপ্ত থাকবে। অথচ আমি দেখলাম একজন সত্যিকারের মুসলিম পুরুষ, যে সত্যিই সম্মানের যোগ্য, সে এই ব্যাপারে বিনয়ী হতে, হাত ময়লা করতে দ্বিধা করে না। সারা বলেছিল, "আমি যখন প্রেগন্যান্ট ছিলাম, তখন সবসময় অসুস্থ থাকতাম। আমার জামাই খুব সহযোগিতা করতো, একটুও বিরক্ত হয়নি। আর ঐ ভূমিকায় এমনই হওয়া উচিত।"

আমি মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম রোমান্সের ব্যাপারে তাদের ভাবনাগুলো কী। মুসলিম বিয়েতে কি এরকম কিছু আছে? মুসলিম ছেলেরা কি এই ব্যাপারে কিছু জানে? লায়লা বলেছিল, "অবশ্যই রোমান্স আছে। তুমি একজন মুসলিম ছেলেকে রোমান্টিক হতে শেখাবে, দেখাবে কেমন করে হতে হয়।"

বলে রাখা ভালো, পশ্চিমা পটভূমি থেকে নতুন মুসলিম হওয়ার কারণে রোমান্সের সংজ্ঞাটা আমাদের কাছে পশ্চিমের সংস্কৃতির মতোই—ফুল, চকলেট, পারফিউম এসব জিনিসপত্র। সারা একজন আরবকে বিয়ে করেছিল যে সারাকে রোমান্সের ব্যাপারে নতুন করে ভাবায়। এর আগে পর্যন্ত সারাও পশ্চিমাদের মতো করেই ভাবত,

> "পশ্চিমা সংস্কৃতি এমন রোমান্সকে উৎসাহিত করে। টেলিভিশনে, গানে একটা নির্দিষ্ট ধরনের প্রেম দেখানো হয়। কিন্তু পশ্চিমের বাইরের কাউকে যদি এ ব্যাপারে আগে থেকে না বলা হয় বা সে এরকম করতে আগে তার সংস্কৃতির কাউকে বা তার মা-বাবাকে না দেখে, তাহলে আমার মনে হয় তাদের এই ব্যাপারে কিছুই জানা থাকে না। তাকে তোমার এসব জানাতে হবে।"

সাংস্কৃতিক এই ভিন্নতার সাথে সে কীভাবে মানিয়ে নিয়েছিল?

> "আচ্ছা, ছোট থেকেই আমি বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। বিয়ের ব্যাপারেও যখন আগাচ্ছি, বুঝতে পারছিলাম এসব ব্যাপারে পার্থক্য থাকবে। যেমন বলা যায়, আমাকে এক জোড়া জুতা কিনে দেওয়াটা তার কাছে ভালোবাসার প্রকাশ। সে এরকমভাবে খুশি। কিন্তু আমার কাছে রোমান্সের সংজ্ঞা এসেছে পশ্চিম থেকে, 'ফুল দেখলে তোমার আমার কথা মনে পড়বে', এমন।"

আর তাই এসবকে অদম্য বাধা হিসেবে না দেখে আমি দেখলাম একটা ইসলামি বিয়ে আসলে 'স্বামীর আনুগত্য করার' ব্যাপারটাকে অতিক্রম করে যায়। এটা হচ্ছে ভালোবাসা, সহযোগিতা, সততা আর সুরক্ষা। একজন নেতার সবচেয়ে ভালো গুণের মতো একজন স্বামী তার স্ত্রীদের মতামত, অনুভূতিকে সম্মান করে। তারা একসাথে একটি দল হিসেবে কাজ করে—সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়ে।

আমি বুঝতে শুরু করলাম একজন মুসলিম স্বামী একজন দলপতির মতো—অসৎ হলে সে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। কিন্তু যদি সে ভালো হয়, আল্লাহকে ভালোবাসে এবং ভয় করে, সে আসলে তেমন আচরণই করবে যেমনটা তার স্ত্রী চায় এবং যেমনটা তার স্ত্রীর প্রয়োজন, আর আল্লাহও যেমন চান।

খুব আত্ম অনুসন্ধান ও লড়াইয়ের পর আল্লাহর আদেশ এবং আত্মসত্তা বজায় রাখার মাঝে আমি ভারসাম্য খুঁজে পেলাম। কারণ যদিও স্বামীর ইচ্ছা মেনে চলার আদেশ আমার উপর আছে, আমার সাথের মানুষটার অন্যের মন বুঝে চলার ক্ষমতা ছিল, দ্বীন আমার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে, একজন অত্যাচারী শাসকের মতো স্বামীর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

অতি অনুগত রোবট বউ

আমার বিয়ের কয়েকবছর পর এইরকম রোবট বউ দেখতে পাই। ব্যাপারটা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করি, 'সম্ভব হলে আমার জামাই কি আমার বদলে একটা রোবট নিয়ে আসবে?' একটা ছেলে ব্যক্তিত্বসম্পন্না, মেধাবী বউয়ের বদলে একটা নিরীহ, বশমানা বউকে পছন্দ করছে যার সবচেয়ে বড় আনন্দ স্বামীর সন্তুষ্ট চেহারা দেখায়—এই ভাবনায় আমার গা দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ঠিক-বেঠিক নিয়ে যে যুদ্ধ আমি করেছি, সে ইতিহাসের জন্য আমার এ অস্বস্তি স্বাভাবিক ছিল। রোবট বউ আমার কাছে একজন নারীর খোলসের মতো, যার নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব, মতামত, আগ্রহ বা অনুপ্রেরণা নেই।

কিন্তু আমরা দেখেছি রোবট বউ হওয়ার ব্যাপারগুলোই একজন মুসলিম স্ত্রী হিসেবে পালন করতে আমাদের উৎসাহিত করা হয়—স্বামীকে মেনে চলা, তার ও সন্তানদের দেখাশোনা করা, ঘরবাড়ি দেখে রাখা, নিজেদের যত্ন করা, সুন্দর হয়ে থাকা। এ থেকে আমার মাথায় প্রশ্ন আসলো, একজন আদর্শ মুসলিম বউ কি একজন রোবট বউ না? আর প্রকৃতপক্ষে, সন্তান, সংসার, স্বামীর জন্য আত্মোৎসর্গ করে একজন আদর্শ মুসলিম বউ কি রোবট বউয়ের মতোই হয়ে যায় না? সে যদি বাইরে কাজ না করে, তাহলে ঘর দেখাশোনায়, রান্নায়, পরিষ্কার করায়, সাজানোয়, বাচ্চাদের দেখাশোনায়, তাদের সাথে খেলায়, তাদের পড়ানোয় অনেক সময় দিতে পারে। যাই হোক, ঘর দেখাশোনা করার জন্য তো একজন মুসলিম নারীর অস্তিত্ব না। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার স্রষ্টার ইবাদাত করার জন্য যেটা সে ঘরের কাজ করার সময়ও করতে পারে। এছাড়া আরো অনেক উপায়ই আছে যেগুলোর মাধ্যমে সে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরণ করতে পারে। আমার নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল, প্রত্যেক পুরুষই কি দিনশেষে একটা সাজানো গোছানো বাসায় ফিরতে চায় না যেখানে গরম খাবার আছে, একটা সুন্দরী বউ আছে, বাধ্যগত বাচ্চাকাচ্চা আছে? আর একঘেয়েমি লাগতে পারে ভেবে প্রতিদিন যদি এমনটা না-ও চায়, মাঝে মাঝে কি চাইবে না? আর কোনো মেয়ে এমন স্বামী না চায় যে তার সব জোকস শুনে হাসবে, যখনই সে চায় তখনই তার সাথে গল্প করবে, নিজেকে গুছিয়ে রাখবে, সে যা চায় তা-ই কিনে দেবে? একটা অনুগত স্বামী? আমাকে দেখাও কে 'না' বলবে।

স্বপ্নাতীতভাবে মুসলিম বা অমুসলিম এমন পুরুষও আছে যারা তাদের জীবনসঙ্গীকে রোবট বউই বানাতে চায়। এরকম বউ সহজ সরল, নিরীহ, জটিলতা কম—একজন সত্যিকারের নারীর মতো না। কিন্তু বেশিরভাগ ছেলের জন্যই এটা শুধু কল্পনা। কারণ বাস্তবতা হলো এমন বউয়ের ব্যাপারে তাদের কয়েক সপ্তাহ পরই একঘেয়েমিতা চলে আসে।

"আমার স্বামী খুব ভেবেচিন্তে এমন একজন স্ত্রী খুঁজছিল, যে ব্যক্তিত্বসম্পন্না, পরিণত, যার সাথে সে নিজের চিন্তাভাবনা গুলো শেয়ার করবে, যে তাকে কিছু ব্যাপারে সামনে এগিয়ে দেবে।"

—হাযার

স্ত্রী স্বামীকে মেনে চলবে, যত্ন করবে, তার জন্য রান্না করবে—এসবের সাথে মুসলিম ছেলেরা আরো একটা জিনিস চায়—তার স্ত্রী একজন খাদিজা বা আইশা হবে। এই দুজন রাসূল (সা.) এর স্ত্রী, উম্মুল মুমিনীন, সৃষ্টির সেরা নারী। হ্যাঁ, তারা ভালো মুসলিম স্ত্রী ছিলেন কিন্তু তারাই হচ্ছেন সেই 'আদর্শ বউ মানে রোবট বউ'—এই ভাবনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। খাদিজা ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী, রাসূল (সা.) এর চেয়ে বয়সে বড়। তিনি তাকে ব্যবসা দেখাশোনার কাজ দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) এর পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততা দেখে খাদিজা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আর রাসূল (সা.) এর উপর যখন প্রথম ওহী নাজিল হয়েছিল, তিনি কার কাছে দৌড়ে গিয়েছিলেন? প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কে? রাসূল (সা.) কে রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া প্রথম ব্যক্তিটি কে? খাদিজা। কে রাসূল (সা.) কে ওয়ারাকার কাছে নিয়ে গিয়েছিল? নবিত্বের চিহ্নগুলো কে তাকে ব্যাখ্যা করেছিল? খাদিজা। এটা কোনো রোবট স্ত্রী না, যে একটা নিরীহ প্রোগ্রামে কাজ করে। এরপর আইশা—একজন স্কলার, ইসলামি আইনের একজন ব্যাখ্যাকারী, একজন কবি, একজন চিকিৎসক। আল্লাহ যখন তার পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করলেন তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি রাসূল (সা.) এর সাথে চ্যালেঞ্জ করেছেন, মজা করেছেন, সুন্দর সময় কাটিয়েছেন। আর যখন রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার কাছে সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ কে? তিনি কোনো দ্বিধা না করেই উত্তর দিয়েছিলেন, আইশা।

এখানেই দুই ধরনের স্ত্রীর মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য বিদ্যমান। একজন রোবট বউয়ের নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। ইসলামের কোথাও আদর্শ মুসলিম স্ত্রী হিসেবে এমন যান্ত্রিক মানুষের কথা বলা হয়নি। রাসূল (সা.) এর দুইজন স্ত্রী এর উদাহরণ।

একজন মুসলিম নারীকে দ্বীন নিয়ে পড়াশুনা করতে, শিক্ষিত হতে, তার অধিকার ও অন্যের অধিকার সম্বন্ধে জানতে উৎসাহ দেওয়া হয়। অধিকার সম্বন্ধে জানলেই সে অন্যদের প্রতিহত করতে পারবে। এগুলো একজন রোবট বউয়ের প্রোগ্রামের মধ্যে পড়ে না।

"যদিও একজন মুসলিম স্ত্রীকে তার স্বামী সন্তান ও সংসার দেখাশোনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়, তার পড়াশোনা ও শিক্ষার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি অনেক মেয়েকে চিনি যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তেমন শিক্ষিত হয়নি কিন্তু তারপর পড়াশোনায় খুব মনোযোগ দিয়েছে—প্রথমে ধর্মীয় ব্যাপারে তারপর অন্যান্য

বিষয়েও। তারা বুঝে পড়েছে, পড়াশোনার জন্য তাদের মধ্যে একটা ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। একজন রোবট বউ এর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে না।"

—হাযার

বস্তুত একজন মুসলিম পুরুষ রাসূল (সা.) এর জীবন থেকেই একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুমিন নারীকে বিয়ে করতে উৎসাহিত হয়। যাতে করে স্ত্রী তাকে আখিরাতের ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারে, তার সাথে শিখতে পারে, তাকে শেখাতে পারে, তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে এবং আল্লাহকে মানতে সাহায্য করতে পারে। আমরা এখানে শেষ করছি যে, একজন মুসলিম স্ত্রী হিসেবে রোবট বউ এর কিছু বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করা উচিত হলেও দ্বীন কখনোই আমাদেরকে ব্যক্তিত্বহীন যন্ত্রমানবী হওয়ার জন্য বলে না। সংক্ষেপে, একজন আদর্শ মুসলিম স্ত্রী একজন রোবট বউ নয়, যদি না তার কোনো রোবট স্বামী থাকে।

'S' শব্দ উচ্চারণ মানা!

কিছু একটা বাদ কি পড়ে গেল? আমরা ইসলামে বিয়ে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি—দায়িত্ব, কর্তব্য, সুবিধা, রোমান্স—কিন্তু এখনো সেক্স কথাটা আনিনি।

পশ্চিমা বিশ্বে সেক্স একটা পণ্য যা খোলা বাজারে বেচাকেনা করা হয়। বিজ্ঞাপনদাতারা ব্যবহার করে, গায়কেরা গান গায়, সিনেমা নির্মাতা সিনেমা বানায়, অভিনেতারা অভিনয় করে, মনোবিশেষজ্ঞরা পড়াশোনা করে, লেখকেরা লেখে আর সবাই পড়ে। কিন্তু যতটা দাবি করে তারা কেউই ততটা পায়না। এটাই হচ্ছে যৌনতা বিষয়ে খোলামেলা সমাজের নির্যাস।

গণমাধ্যমে বিশ্বাস করলে দেখা যায় এ বিষয়ে সেখানে আর কোনো সংবরণ নেই, বাধা নেই, লজ্জাও নেই। একটা নৈতিক শূন্যতা বিরাজ করে। যেখানে একসময় ধর্ম, সংস্কৃতি, পরিবার এবং সমাজ মানুষের যৌন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করত, সেখানে এখন পুরোপুরি শূন্যতা। এই শূন্যতা পূর্ণ হচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সেক্স বেচাকেনার মূলধনে, সুদে—যা আগে কখনো হয়নি। এখনকার দিনে শুধুমাত্র পেডোফিলিয়াই গনমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এর বাইরে এমন কোনো যৌন আচরণ কি আছে যেটাকে সমাজে নিরুৎসাহিত করা হয় অথবা যা সমাজে অগ্রহণযোগ্য অথবা যা অপছন্দ করা হয়? পর্নোগ্রাফি থেকে শুরু করে পায়ুকাম, গ্রুপ সেক্স থেকে স্যাডোমাসোকিজম—সব নিয়েই পত্রিকা আছে, ভিডিও আছে, স্বাদ গ্রহণের দোকানও আছে।

এই সবের প্রেক্ষাপটে কেউ যদি ভাবে মুসলিমরা সেক্সের ব্যাপারে খুব স্নায়ুপীড়ায় ভোগে, তাহলে তাকে মাফ করে দেওয়া যায়। কারণ মুসলিম নারীরা পর্দা করে, ছেলে মেয়ের একসাথে মেশার অনুমতি নেই, ছেলেদের আদেশ করা হয়েছে দৃষ্টি নিচু রাখতে আর আমাদেরকে নিজেদের যৌনজীবন নিয়ে জনসমক্ষে কথা বলতে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। সেক্সের ব্যাপারে ইসলাম আসলে কি শেখায়? এটা

কি এমন কিছু যা লজ্জাজনক, নোংরা, শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধির জন্যই করা হয় এবং তখনও চোখ বন্ধ করে, অন্ধকারে?

না, ইসলামে সেক্স একটা চমৎকার ব্যাপার, যেটা দুজন মানুষের মধ্যে ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ। এ ব্যাপারে মুসলিমরা কী করে সেখানে লক্ষ্য না করে বরং ইসলাম কী বলে সেদিকে লক্ষ্য করা উচিত। সুতরাং মুসলিমরা সেক্সের ব্যাপারে লজ্জা পেলেও সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ ব্যাপারে দ্বীন মুসলিমদেরকে কেমন আচরণ করতে উৎসাহিত করে।

হাদিস অনুসারে সেক্সও এক ধরনের ইবাদাত যদি তা সঠিক নিয়তের সাথে করা হয়। এটা স্বাস্থ্যকর এবং উপকারী, শারীরিক আনন্দ দেয় এবং মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটা মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা এবং এই চাহিদায় কোনো লজ্জা নেই। আল্লাহ আমাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তাই নিজেদের এসব চাহিদা আল্লাহর দেওয়া সীমারেখার মধ্যে থেকেই পূরণ করতে উৎসাহিত করা হয়। এর মানে হলো বিয়ের মাধ্যমে শারীরিক সম্পর্কে আনন্দ উপভোগ করতে হবে। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

> "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর..." (সূরাহ বাকারা, ২:২২৩)

বিয়ের পরে এ আনন্দের ব্যাপারে সীমারেখা খুব কম। যেসব নিয়ম আছে তা হলো, অ্যানাল সেক্স নিষিদ্ধ, পিরিয়ডের সময় মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ। যদিও পিরিয়ডের সময় অন্যভাবে দুজন কাছাকাছি থাকতে পারে, তবে গোপনাঙ্গ বাদে। এই শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ দুজনের অধিকার আছে। একটা ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করা হয়। প্রায়সময়ই 'আমার মাথা ব্যথা করছে' বলে এড়িয়ে না যেতে নারীকে কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে, স্বামী চাইলে তার চাহিদা পূরণে আনুগত্য প্রদর্শন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এই সমাজে 'সেক্সুয়ালি ফ্রাস্টেটেড' পুরুষের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে ভাবলে এই আদেশের যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে।

এদিকে স্বামীকে বলা হয়েছে স্ত্রীকে ধীরে ধীরে উত্তেজিত করতে, স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়েছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখতে, স্ত্রীর সম্মতিতে শেষ করতে, যাতে তার আনন্দ অপূর্ণ থেকে না যায়। সমাজের জন্য 'সেক্সুয়ালি ফ্রাস্টেটেড' নারী কম ক্ষতিকারক। ইবনু কুদামাহ (রহ.) বলেছিলেন, "একজন পুরুষের উচিত মিলনের আগে স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করা, চুমু খাওয়া, যাতে করে সে-ও মিলিত হতে আগ্রহী হয় এবং মিলন থেকে ছেলে মেয়ে উভয়েই সমপরিমাণ আনন্দ পায়।... স্ত্রীর আনন্দ পূর্ণ হওয়ার আগে স্বামী যেন বের না হয়ে আসে।... কারণ এতে স্ত্রীর ক্ষতি হতে পারে আর সে স্বামীর চাহিদা পূরণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।"

দুনিয়ার অন্য অনেক ধার্মিক মানুষের চেয়ে এই আলিমের চিন্তাভাবনা কতটা ভিন্ন! যেখানে অন্যরা নারীর চাহিদাকে লজ্জাজনক এবং নোংরা ভেবেছে!

বস্তুত রাসূল (সা.) এর সময়ে মুসলিমরা যৌনতা বিষয়ে আলোচনা করত—মিলিত হওয়ার ভঙ্গি থেকে স্বপ্নদোষও নিয়েও আলোচনা হতো—এ ব্যাপারে কখনো নিরুৎসাহিত করা হয়নি। রাসূল (সা.) অনেক ভুল ধারণা ভেঙে সহজ সরল উত্তর দিতেন।

সেক্সের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি সহজ—এটা একটা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা ঘটবার নির্দিষ্ট স্থান এবং সময় আছে। দুজন মানুষের মাঝে সেক্স একটা ঘনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক যা বিয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত গণ্ডিতে সংঘটিত হয়, খোলামেলাভাবে না।

দুই, তিন অথবা চার বিয়ে

বিয়ের দুই মাস পর আমি আমার স্বামীকে বললাম আর একটা বিয়ে করতে। আমি তাকে ভালোবাসতাম না ব্যাপারটা মোটেও এমন না, পুরোপুরি তার উল্টো। বিয়ের প্রথম কয়েক মাসে ফ্ল্যাটটা আমার হলো, তার সাথে আমার দেখা হতো একদিন পর পর। আমার নিজের সাথে একা থাকতে ভালো লাগতে শুরু করল। আমার বন্ধুদের সাথে কাটানো সময়ের কথা মনে পড়তে লাগল, ওরা প্রায়ই আসত। আলাদা থাকার পর আমার স্বামীর সাথে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা আমি খুব উপভোগ করতাম। কিন্তু এর মধ্যে একটা মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। ওর সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমার সত্যিই মনে হলো আমার স্বামীর সাথে বিয়ে হলে ও বেশ ভালো থাকবে। আমি সেটাই চাইছিলাম। আমার স্বামীকে তার সাথে ভাগাভাগি করার জন্য আমি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করি কারণ মেয়েটাকে আমি আল্লাহর জন্যই ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার স্বামী এতে আগ্রহী ছিল না, আর আবার যখন আমরা একসাথে থাকতে শুরু করি তখন ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে চলে যায়। কিন্তু সেই অনুভূতি এবং মেয়েটাকে বোনের মতো ভালোবাসা আমি কখনো ভুলিনি।

ইসলামের সবচেয়ে পীড়াদায়ক ব্যাপার হিসেবে যেটাকে দেখা হয় তা যে আসলে কিছু নারীর জন্য স্বাধীনতা, এটা কি হতে পারে? মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যেই বহুবিবাহ এমন একটি ব্যাপার যার সাথে অধিকার, ভুল বোঝাবুঝি এবং খুব তীব্র অনুভূতি জড়িত। যাই হোক, অনেক পশ্চিমা এটা জেনে অবাক হবে যে, বহুগামিতা শুধুমাত্র ইসলামি আইন থেকে আসেনি। শুধু যে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে পুরুষরা একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছে তা না, বরং ঐতিহাসিকভাবেই ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। অনেক নবি এবং তার অনুসারীরাও বহু বিবাহ করেছেন। এমনকি আজকের দিনেও অনেক সমাজে, যদি সত্যি করে বলা হয়, অননুমোদিত বহুগামিতা চলে। অন্যকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা, আহবান, একরাতের

সম্পর্ক, পতিতালয়ে গমন, ক্ষণস্থায়ী এবং বহুদিনের সম্পর্ক—সমাজের এসবই উদাহরণ। স্বাভাবিক বহুগামী স্বভাব বা সামাজিকীকরণের জন্য দেখা যায় যে অনেক নারীই খুব চেষ্টা করার পরও পুরুষেরা বিভিন্নরকম শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে বেশি আগ্রহী, তারা যে নারীকে ভালোবাসে, সে নারী ছাড়া অন্য নারীর সাথে।

ইসলামি আইন বা শরিয়া পুরুষচরিত্রের এই ব্যাপারটিকে না দেখার ভান না করে বরং চিহ্নিত করে এবং এমনভাবে একে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসে যাতে পুরুষ তার যৌনচাহিদার দায়িত্ব নেয়। আল্লাহ যখন কুরআনে পুরুষের বিবাহিত নারীর অধিকারের ব্যাপারে কথা বলেন, তখন শুধুমাত্র প্রথম স্ত্রীর ব্যাপারে বলেননি, বরং সব স্ত্রীর ব্যাপারেই বলেছেন। ইসলামি আইনে একজন পুরুষ একজন নারীকে অবৈধভাবে উপভোগ করতে পারে না। সে নারীকে প্রস্তাব দেবে, তার পরিবার বা অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করে নেবে, তাকে মোহরানা দেবে, তাকে বিয়ে করবে, তাদের সম্পর্কের সামাজিক ঘোষণা দেবে, তার দেখাশোনা করবে, তাদের সন্তানের দায়িত্ব নেবে এবং নারী পরবর্তীতে তার বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। সেই সাথে একজন পুরুষ সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, যাদের প্রত্যেককে সে সমান মর্যাদা দেবে, প্রত্যেকের সাথে একই রকম ব্যবহার করবে, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বাড়িতে রাখবে, প্রত্যেককে সমান সময় ও মনোযোগ দেবে এবং প্রত্যেকের সন্তানই তার সন্তান হিসেবে পরিচিত হবে, তার উত্তরাধিকারী হবে। আমাদের সমাজে রক্ষিতা এবং তার সন্তানের মর্যাদার দিকে তাকালেই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় বিয়ের মধ্যে বিদ্যমান বিশাল পার্থক্যটা বোঝা যায়। যেখানে দ্বিতীয় স্ত্রী সমস্ত দিক থেকে প্রথম স্ত্রীর সমান মর্যাদা পায়, সেখানে অধিকাংশ রক্ষিতা এবং তার সন্তানরা কখনই পরিচয় পায় না। এই সন্তানদেরকে দেখা হয় অবৈধ সন্তান হিসেবে। তারা কখনোই স্কুলের খেলাধুলায়, স্পোর্টস ডে তে বাবাকে পায়না। তাদের কোনো অধিকার নেই, বাবার তাদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই—তারা হচ্ছে গোপনীয়, অশ্লীল।

কিন্তু বহুবিবাহ যদি শুধুই পুরুষের যৌন চাহিদা পূরণের জন্য হয় নারী এখান থেকে কী পায়? খাদিজার মৃত্যুর পর রাসূল (সা.) বেশ কয়েকবার বিয়ে করেন। রাসূল (সা.) এর বেশিরভাগ স্ত্রীই ছিলেন যুদ্ধে স্বামী হারানো বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা, কারো কারো আগের স্বামীর সন্তানও ছিল। যেটা প্রাচ্যের নারীলোভী সুলতানদের চিত্রের একেবারে বিপরীত, যাদের চারপাশে থাকত আকর্ষণীয়া রক্ষিতা। সুন্নাহ বহুবিবাহের এমন একটি দিকে নজর দেয় যে ব্যাপারে খুব কম মানুষই সতর্ক। তা হচ্ছে—বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, বয়স্ক মহিলা প্রত্যেকেই যেন বিয়ের মাধ্যমে ভালোবাসা ও নিরাপত্তা খুঁজে পায় এবং নিজেদের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আমার প্রায়ই মনে হতো যে বহু বিবাহের নিয়মটা কিছু নির্দিষ্ট ধরনের নারীর জন্য খুব উপযুক্ত—পড়াশুনা বা ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত নারী, যে নারীর জীবনের বড় অংশজুড়ে

তার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার আছে, যার আগের সম্পর্ক থেকে সন্তান আছে, যে নারী সবসময় একজন পুরুষের সাথে থাকতে না চেয়ে কিছুটা সময় নিজের সাথে একাও কাটাতে চায়।

উম্মে মুহাম্মাদ খুব বুঝে বুঝে বলছিল, "বহুবিবাহ মেয়েদের জন্য খুব উপকারী, কারণ স্বামী যখন অন্য স্ত্রীকে সময় দেয়, তখন নিজের ও সন্তানদের জন্য আরো বেশি সময় পাওয়া যায়। অনেক নারীর জন্যই এই প্রশ্ন থাকে যে শেষ কবে সে তার পায়ের নখগুলোকে সাজিয়েছিল, যত্ন করেছিল, ম্যানিকিউর করেছিল? তখন স্রষ্টার জন্যও সময় পাওয়া যায়, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী বাইরে থাকলে একজন মেয়ে কুরআন পড়তে পারে, ইসলামি লেকচার শুনতে পারে, শান্তিমত তার নিজের পড়াশোনা করতে পারে।"

> *"আমি খুশি যে আমি আমার স্বামীর একমাত্র স্ত্রী না। আমি সবসময়ই খুব স্বাধীন ছিলাম। আমি আমার নিজের জন্য আলাদা সময় পছন্দ করি এবং এর মাধ্যমে সময় পেয়েছিও। আমার স্বামী ফিরে এসে আমাকে দেখে প্রশংসা করে, খুশি হয়।"*
>
> *—আজিজা*

বহুবিবাহের আরেকটা ইতিবাচক দিকের কথা মেয়েরা বলেছিল যে এতে অন্য স্ত্রীদের কাছ থেকে একটা অতিরিক্ত সহযোগিতা পাওয়া যায়, বিশেষ করে যে অঞ্চলগুলোয় বর্ধিত পরিবার নেই বললেই চলে।

> *"আমি আর আমার সতীনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। আমরা একজন আরেকজনকে খুব সাহায্য করি। সে বাইরে গেলে আমি ও আমার স্বামী বাচ্চাদের দেখি। আমরা একজন অন্যজনের জন্য সুবিচার পছন্দ করি।"*
>
> *—আজিজা*

স্ত্রীরা একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারে। যদি একজন পড়াশোনা বা চাকরির কাজে বাইরে থাকে তাহলে অন্য জন তার সন্তানকে দেখতে পারে, একজন অসুস্থ থাকলে বা মাত্রই সন্তান হলে অন্যজন তার জন্য রান্না করতে পারে, তারা একসাথে দ্বীন নিয়ে পড়াশুনা করতে পারে, শিখতে পারে। তাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্ব তৈরী হতে পারে, তারা একজন আরেকজনের দ্বীনি বোন হতে পারে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যজমের জন্যও তা চাইতে পারে—এসবের মাধ্যমে দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি হয়। এমন স্ত্রীরাও আছে স্বামীকে ছাড়াই যাদের নিজেদের মধ্যে এমনিতেই খুব ভালো সম্পর্ক। তারা একে অপরকে খুব পছন্দ করে, খুব মিল তাদের মধ্যে।

> *"সে আমার দ্বীনি বোন আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীন সবার আগে।"*
>
> *—আজিজা*

এসব বলার মানে এই না যে তোমার স্বামী একজন অন্য স্ত্রী গ্রহণ করছে আর তুমি খুব সহজে তা মেনে নিতে পারবে। এই অনুভূতি ভীষণভাবে তোমাকে আঘাত করে

কারণ সে তোমার আর তুমি তাকে কারো সাথে ভাগাভাগি করতে চাও না। বেশিরভাগ দম্পতির জন্যই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ না। যারা কোনো পারস্পরিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে না, তারা হয় এই চিন্তা বাদ দেয় অথবা তাদের নিজেদের রাস্তা আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে এবং সেটা তাদের ঈমানের কারণেই। তারা মনে করে এটা তাদের জন্য পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় উতরে যাওয়ার পর তারা নিজেদেরকে আরো বেশি শক্তিশালী এবং জ্ঞানী হিসেবে খুঁজে পায়। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

বহুবিবাহ বাধ্যতামূলক কিছু না, এটা শুধুই একটা বিকল্প, যার যার ইচ্ছা। কাউকেই বহু বিবাহ করার জন্য জোর করা যাবে না অথবা একজনের সাথেই থাকতে বাধ্য করা যাবে না। স্ত্রীর মর্যাদা এবং রক্ষিতার অপমানের মধ্যে বেছে নিতে বললে বেশিরভাগ নারীই স্ত্রীর মর্যাদা পেতে চাইবে, সহ-স্ত্রী হতে চাইবে।

বিবাহিত জীবনের সমস্যা

প্রথম যখন দ্বীন সম্পর্কে জানছিলাম, আমরা ভাবতাম কুরআন এবং সুন্নাহ ধরে রাখলে বিবাহিত জীবনের সব সমস্যাই দূরে থাকবে। যেহেতু দ্বীন সমস্ত ব্যাপারেই দিকনির্দেশনা দেয়, আমাদের উচিত এর সাথে লেগে থাকা, তাহলে আর ভুল হবে না। কিন্তু জীবন আসলে এতটা সহজ না। খুব ধর্মপ্রাণ মুসলিমের বৈবাহিক জীবনেও সমস্যা আছে, কারোটা অস্থায়ী, সমাধানযোগ্য, কারোটা স্থায়ী।

সমস্যার সমাধান

যদিও বিয়ে একটা চমৎকার ব্যাপার এবং পরিপূর্ণ ভিত্তি কিন্তু অন্যান্য সুন্দর ব্যাপারের মতো এরও কিছু পরীক্ষা এবং সমস্যা আছে। অন্যান্য বিয়ের মতো ইসলামি বিয়ের সমস্যাগুলোও কিছু ক্ষেত্রে একই—ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, একজন অন্যজনকে মূল্যায়ন করতে না পারা, দুশ্চিন্তা, আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামি বিয়ের কিছু নিজস্ব সমস্যাও আছে। যেমন- একজন আরেকজনের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়া, কারো ধার্মিকতা কমে যাওয়া বা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া। এই সমস্যাগুলো স্বামী এবং স্ত্রী দুজনের উপরেই বেশ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, তাদের সন্তানদের উপরও। সাথের মানুষটাকে আর ভালো লাগে না, ভালোবাসা হারিয়ে যেতে থাকে। তখন অন্যজনের অধিকার পূরণ করাটা দিনকে দিন কষ্টকর হয়ে যায়, ভালোবাসা এবং মায়া দেখানো তো দূরের কথা।

সুন্নাহ আমাদের বার বার করে শেখায় কেমন করে কষ্টকর পরিস্থিতির সাথে বোঝাপড়া করা যায়, কৌশল শেখায় কেমন করে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যায়। ধৈর্য কঠিনতম কিন্তু মহত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো মধ্যে একটি। এই বৈশিষ্ট্যটি সব নবির মধ্যে ছিল এবং কুরআনের অনেক জায়গায় এ বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করা হয়েছে। একটা মুসলিম দম্পতির উচিত নিজেদের এবং নিজেদের সমস্যাগুলোর ব্যাপার ধৈর্যধারণ

করা। ধৈর্যধারণ মানে হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সীমারেখার মধ্যে থাকা, হতাশ হয়ে সীমালঙ্ঘন না করা, রেগে গিয়ে বা প্রতিশোধ নিতে হারাম কিছু না করা।

মুসলিম পুরুষদের রাসূল (সা.) এভাবে উপদেশ দিয়েছেন-

> "কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) তার কোনো চরিত্র-অভ্যাসকে অপছন্দ করলে তার অন্য কোনো (চরিত্র-অভ্যাস) টি সে পছন্দ করবে।"

একইকথা মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আমাদের উচিত তাই অন্যের ভুল না দেখার ভান করা, অন্যের ভুল ঢেকে রাখা এবং অজুহাত না বানানো।

মুসলিম নারী ও পুরুষ হিসেবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আগে যেন আমরা নিজের দিকে তাকাই, খুঁজে দেখি এখানে আমার কোনো ভুল আছে কি না, আমরা অন্য মানুষটার সাথে কেমন আচরণ করেছি অথবা আমরা কি দ্বীন এবং আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলাম কি না। কারণ আল্লাহ বলেন,

> "আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (সূরাহ আর রাদ, ১৩:১১)

এটা জানা থাকলে আমাদের চিন্তাভাবনা সহজ হয়। আমরা অন্যের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজেকে বদলানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া যায়। এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে, বিবাহিত জীবনের সমস্যার জন্য শরিয়া সবচেয়ে ভালো সমাধান দেয়- স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। প্রায়সময়ই এসব সমস্যা এবং আমাদের আচরণের পেছনে কারণ থাকে আমাদের দুর্বল ঈমান। যিকির ও দুআ বাড়িয়ে দিয়ে, নেক কাজ বেশি করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে আমরা আল্লাহর কাছাকাছি যাই। যখন আমরা আল্লাহর চেয়ে ঐ মানুষটাকে বেশি প্রাধান্য দেই, তখন আল্লাহ হয়তো ঐ মানুষটাকে বদলে দেন, অথবা আমরাই বদলে যাই, অথবা গোটা পরিস্থিতিই মলিন হয়ে যায়।

সমস্যা সমাধানের আরো কিছু উপায় আছে—নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা, একে অপরকে পরামর্শ দেওয়া, এমনকি একে অপরকে সতর্কও করা, বিশেষ করে যদি সমস্যাটা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত হয়। তারা পরিবারের কারো মাধ্যমে বা ইসলামি জ্ঞানে জ্ঞানী কারো মাধ্যমে মধ্যস্থতাও করতে পারে। বিদ্যমান সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে সেটা জানা থাকলেও সহজ হয়। অবশ্য সেটা তখনই সহজ হয় যখন স্বামী স্ত্রী দুজনই আল্লাহর আদেশ মানতে আগ্রহী থাকে।

ভালোবাসা এখানে কী-ই বা করতে পারে?

আমার বাবা একবার আমাকে সম্পর্কের ব্যাপারে বোঝাতে একটা উপমা দিয়েছিলেন। সেটা এত সত্যি এবং জুতসই ছিল যে—এ ব্যাপারে কথা উঠলেই আমি তা সবাইকে বলি। কেউ এখন পর্যন্ত এখানে কোনো ভুল খুঁজে পায়নি।

সম্পর্ক হচ্ছে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো। সমস্ত সুন্দর স্মৃতি, উপহার, ভালো কথা, মজার সময় এখানে জমা হয়। ঝগড়া, দুঃখ, কষ্ট পাওয়া এখান থেকে খরচ হয়। ইসলামে প্রেক্ষাপটে এখানে একটা জিনিস জমা হয়। সেটা হচ্ছে একজন অন্যজনের অধিকার পূরণ করা। আর খরচ হলো অধিকার নষ্ট করা। যদি যথেষ্ট পরিমাণ জমা থাকে, তাহলে অ্যাকাউন্ট পূর্ণ। তখন সেখান থেকে ধৈর্য ধরে খরচ করা যায়। সুতরাং ভালো সময় দিয়ে খারাপ সময়কে সামলানো যায়। ভালো সময়ের জন্য খারাপগুলো ভুলে যাওয়া যায়, ক্ষমা করা যায়। আর যদি খরচের পরিমাণ কোনোভাবে জমার পরিমাণকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে অ্যাকাউন্টে লাল বাতি জ্বলে। একটা সময় শুধু খরচ হতে থাকে আর কোনো জমা থাকে না। অ্যাকাউন্ট তখন দেউলিয়া। একটা সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সেখান থেকে পেছনে ফিরে আসাটা খুব কঠিন। কষ্টগুলোর জন্য সমস্ত কোমল অনুভূতি আর সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। হতাশা এবং বিরক্তি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এরকম পর্যায়ে পৌঁছে গেলে ভালোবাসার আর কী-ই বা করার থাকে?

একবার আমার বাসায় এক দাওয়াতে একটা মেয়ে এই কথাটা বলেছিল। আমি তখন বুঝিনি যে সে আসলে কী বুঝিয়েছে। আমি তাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছিলাম। সে যা বলছিল তার সারাংশ হচ্ছে, "তুমি যখন তোমার অধিকারগুলো আর পাওনা, তোমাকে যখন আর সম্মান করা হয় না, তোমার স্বামী যখন শুধু নিজের সুবিধাগুলোই বোঝে, তখন ভালোবাসার আর কী-ই বা করার থাকে?"এরকম সময়ে তুমি তাকে ভালোবাসলেও তাতে কী-ই বা আসে যায়? তোমার কি তখনও তার সাথে লেগে থাকা উচিত? ভালোবাসা ধরে রাখা উচিত যখন আর কিছুই বাকি নেই?

> *"আমি বলব না যে তার প্রতি আমার ভালোবাসা কমে গিয়েছিল, এখানে ভালোবাসার কোনো ব্যাপার নয়। আমি এখনো তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি কারণ সে একজন মুসলিম। শুধু সে একজন দুর্বল মুসলিম হয়ে গিয়েছিল যাকে আমি নিজের জন্য চাইনি। কেউ যখন আল্লাহকে অমান্য করে তখন তার সাথে বসবাস করা খুব কঠিন। তুমি যা বিশ্বাস করো তারা সেটার পুরোপুরি বিরুদ্ধে চলে যায়।"*
>
> *— আলিয়াহ*

এই ব্যাপারে আমি যে মেয়েদের সাথে কথা বলেছি তারা সবাই একমত হয়েছে যে একজন আরেকজনের সাথে ভালোভাবে থাকার কারণ হিসেবে ভালোবাসা সবচেয়ে জরুরি না, সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দ্বীন—আল্লাহর আদেশ মেনে চলা। তাই,

ভালোবাসাপূর্ণ কিন্তু দ্বীন নেই এমন একটা বিয়ে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ তোমার প্রতি ছেলেটার ভালোবাসা কমে গেলে সে কী করবে অথবা সে যদি অন্য কাউকে ভালোবাসতে শুরু করে? স্ত্রীকে ভালো না বাসলে তার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, নিয়ম-কানুন নেই, কোনো ন্যূনতম প্রয়োজন নেই, কিছুই নেই যেটা তার পূরণ করা উচিত। একই কথা একটা মেয়ের জন্যও প্রযোজ্য। সে তার স্বামীকে ভালো না বাসলেও দ্বীনের কারণে সে তার সাথে ভালো আচরণ করবে।

"আমি বলি কী, ভালোবাসা না; বরং দ্বীনই সবকিছু জয় করে নেয়। হ্যাঁ প্রত্যেক নারী-পুরুষই ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসা চায় কিন্তু আমি ভালোবাসা নিয়ে দ্বীন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না। আবার দ্বীন নিয়ে ভালোবাসা ছাড়া বেঁচে থাকতেও খুব ভালো লাগবেনা কিন্তু সেটা হয়তো সহজতর হবে। একটা ছেলের যদি অন্ততপক্ষে দ্বীন থাকে তাহলে সে আল্লাহর জন্য তোমাকে ভালোবাসবে, তোমাকে সম্মান করবে আর তোমাকে তোমার অধিকারগুলো দেবে।"

—উম্মে মুহাম্মাদ

তবে কেউ কেউ ভিন্ন মতও দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, হাযার বলেছিল, "বিয়ের জন্য ভালোবাসা শর্তহীনভাবে জরুরি। আমার মনে হয়, যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে বিয়েও নেই। আমার স্বামীকে আমার ভালোবাসতেই হবে, নয়তো এটা একটা অসম্পূর্ণ বিয়েতে পরিণত হবে।" কিন্তু সে বিয়ের জন্য দ্বীনকেও অপরিহার্য বলেছিল।

"ভালোবাসা আর দ্বীন দুটোই দরকার। কারণ দ্বীন হচ্ছে মূল ভিত্তি। আমার মনে হয় আজকালকার দিনে অনেক বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ভিত্তির অভাব। স্বামী স্ত্রীর ভূমিকা পালন করতে চায় আর স্ত্রী চায় স্বামীর ভূমিকা পালন করতে, আর ফলাফলে কোনোটাই হয় না। কেউই ঠিকমত জানে না তাদের ভূমিকাগুলো আসলে কী। তোমার ভূমিকা কি আর তোমার স্বামীর ভূমিকা কী সেটা জানলে ব্যাপারগুলো খুব সহজ হয়। সময়ের সাথে ভিত্তি থেকে দূরে সরে আসলেও একটা সময় সেখানে ফিরে যেতেই হবে।"

শুনতে হাস্যকর লাগে যে, যা-ই হোক না কেন, ভালোবাসাই নাকি যথেষ্ট, এটা সবকিছু জয় করে নিতে পারে, পুরো পৃথিবীটা উল্টে দেয়। আমি এসবে বিশ্বাস করতে চাইতাম, যেমনটা আমরা সবাই চাই। আমি ভাবতে চাইনি যে এসব নিরর্থক কথা। আসলে আমার অনেক কিছুই থাকে যেগুলো আমরা বিশ্বাস করতে চাই। সেগুলো সত্য বলে যে বিশ্বাস করতে চাই তা না, এইজন্য বিশ্বাস করতে চাই যে সেগুলো বিশ্বাস করতে আমাদের ভালো লাগে, আমাদের জীবন সহজ হয়। সেগুলোর প্রভাব আফিমের মতো হলেও আমরা তা বিশ্বাস করতে চাই। তো আমি দেখতে থাকলাম, বলতে থাকলাম, শুনতে থাকলাম। এমন পুরুষদের গল্প শুনলাম যারা তাদের স্ত্রীদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, তাদের সাথে ভয়ংকর ব্যবহার করে, এমনকি মৌলিক অধিকারগুলোও পূরণ করে না। তারা স্ত্রীদের পাগলের মতো ভালোবাসে বলে দাবি

করে, ধরে রাখতে চায়, হারানোর ভয় করে। আমি দেখেছি মেয়েরা নিজেদেরকে খুব সস্তায় বিকিয়ে দিচ্ছে, নিজেদের প্রাপ্তির চেয়ে অনেক কম গ্রহণ করছে, নিজেদের ক্ষতি করছে—শুধুমাত্র স্বামীদের জন্য যারা তাদের ভালোবাসে বলে দাবি করে। বছরের পর বছর তারা আটকে থাকে শুধু এই আশায় যে কোনো একদিন এই ভালোবাসার কথাগুলো সত্যি সত্যি এই দুরবস্থার সমাপ্তি ঘটাবে। কিন্তু এমনটা হওয়া দুর্লভ। এসব গল্প শোনার পর ভালোবাসার শক্তিতে বিশ্বাস করা কঠিন।

কিন্তু যখন মুসলিম দম্পতিদের দিকে তাকালাম, আমি দেখলাম যে তাদের সামনে যখন কোনো সমস্যা আসে তখন তারা ভালোবাসার মুখোমুখি হয় না, বরং দ্বীনের মুখোমুখি হয়, তাদের বিশ্বাসের দিকে ফিরে যায়। তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে থাকে, দুআ করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আত্মশুদ্ধি করে, ভালো কাজ বাড়িয়ে দেয়। এসবের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ ও ক্ষমার দরজাগুলো খুলে। যেটা হয়তো ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে তাদেরকে সেই ভালোবাসার দিকে ফিরিয়ে নেয় যেটা এক সময় তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। ভালোবাসা ফিরে আসে গভীরভাবে সমৃদ্ধ হয়ে, আরো বিশ্বস্ত হয়ে। কারণ এই হৃদয় দুটিকে আবারো একসাথে মিলিয়ে যিনি দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ।

আমরা কখন বিদায় জানাই?

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে কারো কারো বিবাহিত জীবনের কিছু সমস্যার কখনো সমাধান হয় না এবং তখন তাদের নিজেদের রাস্তা আলাদা হয়ে যায়। আমার খুবই অবাক লাগে যে এখনো এমন মুসলিম ও অমুসলিম মানুষ আছে যারা মনে করে একজন মুসলিম নারী কখনো তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হবে না। তারা মনে করে একবার বিয়ে করেছে তো করেছেই, আর কোনো উপায় নেই, সে সারা জীবনের জন্য আটকে গেছে। বিশ্বাস করুন, বিয়ে করার আগেই আমি এইসব কিছুর সত্যতা যাচাই করে নিয়েছিলাম।

> “যদি কোনো নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোনো মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোনো গোনাহ নাই। মীমাংসা উত্তম।” (সূরাহ আন-নিসা, ৪:১২৮)

ইসলামে বিয়ে এমন কোনো বন্ধন না যেটা কখনও ভাঙ্গা যাবে না। শরিয়া নিজেই বলে যে এমন অনেক সময় আসে যখন সমস্ত সমাধানের সমস্ত চেষ্টা বিফলে যায়। তখন একটা দম্পতির আলাদা হয়ে যেতে হয়। যদিও দম্পতি, তাদের সন্তান এবং বৃহত্তর সমাজে তালাকের প্রভাব ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তাই একে নিরুৎসাহিত করা হয়। অনেক মুসলিম সমাজে তালাক খুবই দুর্লভ। চলমান সামাজিক আবহাওয়ায় বিয়ে দিনকে দিন ঠুনকো হচ্ছে, তালাকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এটা কি এই কারণে যে আমরা জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে এত বেশি আশা করি যেটা একজনের মধ্যে কখনো পাওয়া সম্ভব না? অথবা এই কারণে যে যেসব নারী বিয়ের বন্ধন থেকে বের হয়ে

আসে তারা এখনকার সমাজে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে না? অথবা আমরা বিয়েকে ভেঙে ফেলার মতই কিছু একটা ভাবি? অথচ আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানীরা সমস্ত ভালো-খারাপ সময় পার করে মৃত্যু পর্যন্ত একসাথে থেকেছেন। ইসলাম তালাকের চেয়ে একটা ভয়াবহ বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে থাকাকে অগ্রাধিকার দেয় না কিন্তু এটা ধৈর্যধারণ করাকে গুরুত্ব দেয় যা একটা সফল বিয়ের চাবিকাঠি।

ইসলামি আইনে দুইজন বিবাহিতের আলাদা হয়ে যাওয়ার তিনটি ধরণ আছে—প্রত্যাহারযোগ্য তালাক, প্রত্যাহার অযোগ্য তালাক এবং খুলা' (বিবাহচুক্তি বাতিল করা)। পুরুষের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ চাওয়া হলে সেটা তালাক এবং নারীর পক্ষ থেকে হলে সেটা খুলা'।

> "তালাকে-'রাজঈ' হ'ল দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালিম।" (সূরাহ বাকারাহ, ২:২২৯)

আদর্শ হলো, সব ধরনের চেষ্টা করার পরও কোনো মীমাংসা না হলে একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে এক তালাক দিতে পারে, যেটাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক বলা হয়। এরপরে স্ত্রী ইদ্দত পালন করে যার সময়কাল তিন রজঃচক্র পর্যন্ত। এটা তার অপেক্ষার সময়। এই সময়ে সে স্বামীর বাড়িতেই থাকে। স্বামীর উপর তখনো স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে। এই মেয়াদে তারা পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে আবারও নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধানের সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হলে তালাক বাতিল হয়ে যায়। তাই তাদের একই বাড়িতে আলাদা থাকতে হয়। ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তালাক চূড়ান্ত হয়। তারা যার যার রাস্তা খুঁজে নেয়। সন্তান থাকলে তারা মায়ের কাছেই থাকে। কুরআন অনুযায়ী, তালাকের পর তারা আবার বিয়ে করে একসাথে হতে পারে, এক্ষেত্রে আবার বিবাহচুক্তি এবং মোহরানা প্রয়োজন। তবে দুই তালাক পর্যন্ত তারা বিয়ে করতে পারে।

তৃতীয় তালাক হচ্ছে প্রত্যাহার অযোগ্য। এর মানে হলো তারা আর বিয়ে করতে পারবে না যদি না ঐ নারী অন্য কাউকে বিয়ে করে এবং তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। তিন তালাকের পর এই দম্পতি আলাদা হয়ে যাবে এবং এসময় ইদ্দত এক রজঃচক্র পর্যন্ত।

খুলা হচ্ছে নারীকর্তৃক বিবাহচুক্তি বাতিলের আবেদন। স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হয়, মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন করে, দীর্ঘসময় ধরে নিরুদ্দেশ থাকে অথবা স্বামী যদি শারীরিকভাবে অক্ষম হয় তাহলে খুলার আবেদন করা হয়। স্বামীকে প্রথমে আদেশ করা হয় স্ত্রীকে তালাক দিতে। যদি সে তালাক দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাদের তালাক ঘোষণা করে দেয়। যেহেতু বিবাহচুক্তি নাকচ হয়ে যায়, তাই এক্ষেত্রে স্ত্রী মোহরানা ফেরত দেয়। ফেরত দি না পারলে স্বামী তার মুক্তিপণ দাবি করে। ঋণ নিয়ে সে মুক্তিপণ আদায় করে। নারী তখন নিজের মুক্তির জন্য যাকাতের আবেদন করতে পারে। তার ইদ্দতের সময়কাল এক রজঃচক্র। পরবর্তীতে নতুন বিবাহচুক্তি এবং মোহরানার মাধ্যমে তারা পুনর্বিবাহ করতে পারে।

আধ্যাত্মিক, আর্থিক অথবা বিবাহিত জীবনের সমস্যা—যে কোনো সমস্যার জন্যই মুসলিমদের ধৈর্যধারণ করতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু কখনো কখনো চূড়ান্ত অবসানের জন্য ধৈর্যই যথেষ্ট না। আমি এমন মেয়ে দেখেছি যারা বিবাহিত সম্পর্ক রক্ষা করতে অন্য অনেকের চেয়ে বেশি অনিচ্ছুক থাকে। তারা দুআ করতেই থাকে, নিজেদেরকেই বারবার ধৈর্যধারণের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাদের দ্বীনের, তাদের সন্তানের উপর বিচ্ছেদের কেমন প্রভাব পড়বে সেটা নিয়ে ভাবে। এই বিচ্ছেদের জন্য তাদের অমুসলিম পরিবার দ্বীন নিয়ে কী ভাববে তা-ও চিন্তা করে।

কিন্তু বিয়েটা যখন তাদের দ্বীনের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে, বিচ্ছেদটা তখন অপরিহার্য হয়ে উঠে। আমি এমন অনেক মেয়েকে দেখেছি যারা বছরের পর বছর ধরে নিজের ব্যাপারে ভাবার আগে অন্যের শারীরিক, আর্থিক এবং অনুভূতির কল্যাণের কথা চিন্তা করে। কিন্তু এটা ততদিন পর্যন্ত যতদিন না তাদের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

> *"আমার নিজেকে সন্দেহ হচ্ছিল, আমি যা বিশ্বাস করি তা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। আমি দ্বীনকে প্রশ্ন করলাম, দ্বীনের ব্যাপারে যা জানতাম। আমি ভাবলাম, এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমার কতটুকু ব্রেইন ওয়াশ হয়েছে? এর কতটুকুই বা দ্বীনের? এটাই যদি দ্বীন হয় তাহলে আমি এই পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত না। কারণ আমি ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছিলাম। আমি এভাবে বাঁচতে পারি না।"*
>
> *—লায়লা*

নিজের সাথে এরকম অবিচার, অন্যায় আর নিরাশাকে চলতে দিতে থাকলে তুমি হয়তো একটা সময় আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতির উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। কখনো হয়তো নিজের দ্বীনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলবে। কোনো মুসলিমই সেই পর্যায়ে পৌঁছুতে চায় না।

লায়লা কেন খুলার আবেদন করে, এ ব্যাপারে আমাকে আরো বলেছিল,

> "আমি বুঝতে পারি এই পরিস্থিতিটা আমি আর চাইছি না। আমি মনে করি আমরা দুজনই মানুষ হিসেবে বেশ বদলে গিয়েছি। আমি ওখানে নিজেকে হারিয়ে নিজের

পরিচয় হারিয়ে ফেলতে পারতাম, আবার একজন মানুষ হিসেবে গড়েও উঠতে পারতাম। আমি নিজেকে অনেকটুকু হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং আমি জানতাম যতটুকু বাকি আছে, সেই আমিটাকে আমি আর হারাতে চাইনা। আমি জানতাম আমি অসুখী, আমি এমনটা আর চাইছিলাম না। তাই খুলার জন্য কাগজপত্র পাঠাই।"

উম্মে মুহাম্মাদের তালাক নিয়ে আমি আর সে বিস্তারিত আলোচনা করি। আমি তার কাছে জানতে চাই, যে মানুষটা তাকে দ্বীনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, তার কাছ থেকে তালাক চাওয়ার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত সে কেন নিয়েছিল?

সে উত্তর দিল, "তার মানসিক সমস্যার জন্য। এ কারণে সে বাসায় যে অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করত, তার জন্য। আমি চলে আসার সিদ্ধান্ত নেই।"

কিন্তু সে কি তার স্বামীকে ভালোবাসত না?

"আল্লাহ্ একজন পুরুষকে যা পূরণ করতে বলেছেন সে যখন তা পূরণ করে না, দ্বীনের দিকে এগিয়ে যায় না, আমার মনে হয় তখনই ভালোবাসা কমা শুরু করে। তো আমি খুলার আবেদন করার উদ্যোগ নিতে শুরু করি কিন্তু এটা একটা লম্বা প্রক্রিয়া হওয়ায় আমি তাকে বলি আমি তালাক চাই। সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করল এমনটা না করতে কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলাম। সে আমাকে এক তালাক দিল।"

তালাককেই কেন একমাত্র সমাধান মনে হলো?

"আমার মনে হয়েছিল আমার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি কীভাবে থাকতে চাই, কীভাবে দ্বীন মানতে চাই—তার মানসিক অসুস্থতার জন্য এসবে ব্যাঘাত ঘটছিল। আমি ইসলামের কিছু ব্যাপার নিজের মধ্যে আনতে চাইছিলাম যেটা এই সম্পর্কের জন্য সম্ভব হচ্ছিল না বলে আমার মনে হয়। মানসিক হাসপাতালে যাওয়া, প্রিজন-এসব করে তো আমি বাঁচতে চাইনি। একজন নারী হিসেবে নিরাপদ লাগছিল না। আর আমার বাচ্চাদের উপরও বাজে প্রভাব পড়ছিল।"

আমি একটা জিনিস বুঝতে চাইলাম। দ্বীনের জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে অথবা ঈমান বাড়লে বিবাহিত জীবনের সমস্যা সহ্য করার ক্ষমতা মেয়েদের ক্ষেত্রে কি বাড়ে না কমে। অথবা, একজন ধার্মিক নারী কি দুঃখ কষ্ট বেশি সহ্য করবে নাকি কম? তো তালাক হয়ে যাওয়া মেয়েদের সাথে কথা বলার সময় আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কী মনে হয়? ঈমান ও জ্ঞান বেশি থাকার জন্য তালাকটা হলো নাকি কম থাকার জন্য?"

উম্মে মুহাম্মাদ বেশ নিশ্চিত হয়ে নিজের উত্তর দিল, "আমার ঈমান বেশি থাকার জন্যই তালাক হয়েছে। কারণ আমি জানতাম জীবনে তাকে আর আমার প্রয়োজন নেই। আমার জানামতে ঐ জীবনটা ইসলামি কোনো জীবন ছিল না।"

কিন্তু আলিয়াহ তেমন নিশ্চিত ছিল না। নিজের উদ্দেশ্যগুলোকে বারবার বাজিয়ে দেখে, নিজেকে, নিজের অতীতকে বারবার প্রশ্ন করে সে আমাকে বলল, "আমার সময় কাটে পড়াশোনা করে, বাচ্চাদের সময় দিয়ে। আর এর মাঝে আমি প্রায়ই আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবি, তুমি এটা কেন করলে? অথবা সেটা কেন করলে? আমি এখনো নিজেকে অনেক প্রশ্ন করি, এটা অবিশ্বাস্য। যে মানুষটার সাথে আমার দেখা হয়েছিল সেই মানুষটা কি সে কখনো ছিল? এমন কোনো ইঙ্গিত কি ছিল?"

সম্পর্কটা শেষ করে দেওয়ার জন্য তার শক্তি ছিল দ্বীন।

> "মূলত, আমি ভেবেছিলাম, আমি অপেক্ষা করেছি যে তুমি নিজেকে গুছিয়ে নেবে আর তুমি কিছুই করনি। জানো, এখন আমি কী করব? আমি তোমাকে তালাক দেব। তুমি যা করছ তা ঠিক না। আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত তুমি সেভাবে তাঁকে ভয় করছ না। তুমি আমাকে এবং আমার বাচ্চাদেরকে দুর্বল করে দিচ্ছ। আমি সত্যিই দ্বীন সম্পর্কে আরো জানতে চাইছিলাম, উন্নতি করতে চাইছিলাম কিন্তু সে আমাকে ক্রমেই সেগুলো থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল।"

আলিয়ার বাড়ি থেকে ফিরে আমি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমাদের কথা থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে তার বিবাহিত জীবন বছরের পর বছর ধরে দুর্দশা এবং পরীক্ষা দিয়ে ভরা ছিল। তার দুরবস্থার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু যে স্নেহপূর্ণ মা, উদার মেজবান এবং ভালোবাসাপূর্ণ বোনটাকে আমি আমার সামনে দেখেছি, তার চিন্তা থেকে বের হতে পারছিলাম না। তিক্ততাটা কোথায় ছিল? অনুতাপ, রাগ, যন্ত্রণা কোথায় ছিল? তার গলার স্বরে, আচরণে এমনকি তার কথায়ও আমি এসব খুঁজে পাইনি। আমি জানি কেন খুঁজে পাইনি। কারণ সে আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে যে তিনি মানুষের সাধ্যের অতীত কিছু তার উপর চাপিয়ে দেন না, কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে, এই জীবনে অথবা তারপরের জীবনে সমস্ত ভালো কাজের জন্য পুরস্কার আছে। এসবের উপর ভিত্তি করেই সে ঐ চরম যন্ত্রণাদায়ক

অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে, একজন আরো শক্তিশালী, আরো ভালো মানুষ হয়ে, যে মানুষটা ভীষণ আশাবাদী।

বিয়ের ইতির সাথে বেশ কিছু ধরনের আবেগ জড়িয়ে থাকে। বেশিরভাগ মেয়েই মুক্তি পাওয়ার অনুভূতির কথা বলেছে, তারা জীবনের একটা নতুন পর্যায় শুরু করতে পারবে। তাদের নিজেদের আত্মবিশ্বাসী লাগত, ক্ষমতাবান লাগত যেগুলো আসলে তালাকের চেয়ে সম্পর্কটা যে শেষ হয়েছে তার প্রতিফলন। নিজের জীবনে তালাকের প্রভাবগুলো ভেবে আলিয়াহ আমাকে বলেছিল, "তালাকটা হওয়ায় আমার আরো শান্তি লাগছিল। আমার জীবনে সবসময় কিছু না কিছু হচ্ছিল, সবসময় কোনো না কোনো কিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। আমি তখন একজন একা মা। যদিও এটা কঠিন ছিল, কিন্তু আমি জানতাম কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। আমার এখন নিজের সাথেই স্বস্তি লাগে।"

"তালাকের পর আমি সব কিছুকে আরো গভীরভাবে দেখতে পারছিলাম। আমার নিজেকে আরও বেশি দৃঢ় লাগছিল। আমি জানতাম আমার নিজেকে কীভাবে আরো ভালো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কষ্টের সাথে স্বস্তি আসে আর তুমি যদি ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যাও তাহলে আমার মনে হয় তুমি আরো বেশি শান্তি পাবে। আমি জানি আমি ধৈর্যশীল হওয়ার প্রচন্ড চেষ্টা করেছি এবং সেজন্যই আল্লাহ এখন আমাকে এত শান্তি দিয়েছেন। যখন কাগজগুলো আসল, আমি ঠিক ছিলাম মাশাআল্লাহ।"

—লায়লা

কিন্তু এই তালাকের ব্যাপারটার সাথে সব মেয়েরা খুশি থাকে না। বিশেষ করে যদি তালাকের শুরুটা তার স্বামীর পক্ষ থেকে হয়। মুসলিম এবং অমুসলিম—কিছু মেয়ের কাছে তালাক নিঃসঙ্গ এবং অনিরাপদ একটা জীবন শুরুর ইঙ্গিত—নতুন বন্ধু বানাতে হবে, অবসর কাটানোর নতুন নতুন উপায় বের হয়, আবেগের মানিয়ে নেওয়ার নতুন নতুন উপায় বের হয়, কখনো কখনো আর্থিক হিসাবটাও। এগুলো আসলে সত্যি। তালাকের পরে মেয়েদের জীবন এমনটা ঘটে। বছরের পর বছর ধরে একজন স্ত্রী ও মা হিসেবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার পর এখন নিজেই নিজের হয়ে যাওয়া, নিজের মানুষটাকে ছাড়া বাঁচতে শেখা। বেশিরভাগ মেয়ের জন্যই এর সাথে বিরক্তি ও তিক্ততা মিশে থাকে—তার মনে হয় যে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়গুলো সে নষ্ট করেছে—জীবনে সে অলক্ষ্যের থেকে গেল, তাকে ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম লক্ষ্য করে যেসব প্র্যাকটিসিং মেয়েরা ব্যাপারগুলো ভিন্নভাবে দেখে। ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ হতে থাকলেও এই পরীক্ষায় সে ধৈর্য ধরে। সে আল্লাহর ফরমান মেনে নেয়, তাকদিরের বিরুদ্ধে যায় না। গ্রহণ করে নেয়। সে জানে, পরিবারের দেখাশোনা করে জীবনের যে সময়গুলো সে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়েছে, সেগুলো হারিয়ে যায়নি—সেগুলো আল্লাহর কাছে নিরাপদে সংরক্ষিত আছে—তার ভালো কাজের খাতায়। সে জানে যে দুঃখের পরই সুখ আসে। সে জানে যে সে সহ্য করতে পারবে না এমন কিছু তার উপর আসবে না। এটাই তাকে আশা জোগায়। চোখের পানি কিছুটা খরচ হলে, কষ্টটা একটু কমে এলে সে আবার সামনের দিকে তাকায়। জানে যে একজন মুসলিম হিসেবে তার পরিচয় স্বামী ও সন্তানের সাথে বাঁধা না। তার বোনরা তার পাশে থাকে, উপদেশ দেয়, সমর্থন দেয়, মাথা রেখে কাঁদবার জন্য কাঁধটা এগিয়ে দেয়। আর সে নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলে, নতুন করে আবিষ্কার করে, সামনের দিনগুলোর জন্য নতুন করে শুরু করে। আর আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানায় যে সে এখনো দ্বীনের উপর আছে, তার শরীর ও মন ভালো আছে। দেখতে অতটা মনে না হলেও সে যে নতুন একটা দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে, দিনটাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে এটাই তো যথেষ্ট। তার কাছে এটাই জীবনের শেষ না।

আর সৌভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে তালাকপ্রাপ্তার আবার বিয়ে হওয়া এবং সেই বিয়েতে ভালো থাকা আমাদের সমাজের স্বাভাবিক চিত্র।

একটি সুখী বিয়ের উপাদান

পুরোটা না হলেও এই তালিকাটি শরিয়া, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মেয়েদের সাথে আমার কথোপকথনের ভিত্তিতে লেখা।

দ্বীন

"রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো যে তার স্ত্রীদের কাছে ভালো আর তোমাদের মধ্যে আমিই আমার স্ত্রীদের কাছে সবচেয়ে ভালো।' এতেই বোঝা যায়, তোমার স্বামী যদি একজন ভালো মানুষ হয়, একজন ভালো মুসলিম হয়, যদি সে আল্লাহকে ভয় করে, তাহলে সে তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, রাসূল (সা.) এর কথা মেনে চলবে।"

—বেগম

একটা সুখী বিয়ের জন্য দ্বীন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মানে হলো সেই দম্পতি দ্বীন মেনে চলবে, দ্বীনকে সম্মান করবে। কুরআন এবং সুন্নাহ এ বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যা বলা আছে সেইমতো নিজেদের পরিচালনা করবে। স্বামী ঠিকঠাক আচরণ করবে, সহানুভূতিশীল থেকে পরিবারের প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পূরণ করবে। ভালো কাজে স্ত্রী তার স্বামীকে সাহায্য করবে এবং তাকে যত বেশি পারে মেনে চলবে। তাদের আচরণ হবে ইসলামিক। মিথ্যা থাকবে না, প্রতারণা থাকবে না, অপমান করা থাকবে না, গীবত (একজনের আড়লে অন্যজন কথা বলা) থাকবে না, রুক্ষ আচরণ থাকবে না, বিশ্বাসঘাতকতা থাকবে না, স্বৈরাচারী আচরণ থাকবে না, একগুঁয়েমি থাকবে না, স্বার্থপরতা থাকবে না, অকৃতজ্ঞতা থাকবে না। কারণ ইসলাম এই বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। তাদের কাজকর্মও হবে ইসলামিক—অ্যালকোহল নিয়ে অত্যাচার করা যাবে না, নেশা করা যাবে না, যিনা করা যাবে না, ফ্রি-মিক্সিং করা যাবে না, নাইট ক্লাবে যাওয়া যাবে না। কারণ এইসব এর বদলে ইসলাম অনেক উপকারী এবং সুন্দর জিনিস আমাদেরকে দিয়েছে। একটা দম্পতি একসাথে দ্বীন মানার চেষ্টা করবে, দ্বীন নিয়ে পড়াশোনা করবে, কুরআন মুখস্থ করবে, দুআ শিখবে, একজন আরেকজনকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, একজন আরেকজনকে সংশোধন করে দেবে, ভাল কাজ করতে একজন একজনকে উৎসাহ দেবে। এসবে আল্লাহর রহমত আছে এবং এসব মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে।

"তোমার ভালো কাজের আদেশ দাও এবং খারাপ কাজে নিষেধ করো। যেসব কাজ আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে একসাথে সেগুলো করার চেষ্টা করো।"

—লায়লা

তারা একজন আরেকজনের অধিকার পূর্ণ করবে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে এবং সবসময় সতর্ক থাকবে যে একজন আরেকজনের সাথে কেমন ব্যবহার করেছে সে ব্যাপারে আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করবেন।

> *"সবকিছুই দ্বীনের সাথে জড়িয়ে আছে। রাসূল (সা.) তার পরিবারের সাথে যেমন ছিলেন, তোমার স্বামী সেরকম হবেন অথবা সেরকম হওয়ার জন্য সবসময় চেষ্টা করে যাবেন।"*
>
> —*সাফওয়া*

আর দ্বীন হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা নিরাপত্তাব্যবস্থা। কারণ দম্পতিরা একজন আরেকজনের ব্যাপারে দায়বদ্ধ না থাকলেও দিনশেষে আল্লাহর কাছে তাদের উত্তর দিতেই হবে। এই সমস্ত ব্যাপার একটা দম্পতিকে কাছাকাছি রাখে এবং সেই বিয়েতে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। কারণ একটি বিয়েকে সুখী করার অথবা না করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই আছে।

একে অপরকে মূল্যায়ন করা

> *"একজন মুসলিম স্বামীর উচিত তার স্ত্রীকে সম্মান করা। স্ত্রী যে দায়িত্বগুলো পালন করে তার জন্য তাকে সম্মান দেখানো—সে যে খাবারটা রান্না করে তার প্রশংসা করুন, সে যেভাবে আপনার সন্তানের যত্ন করে তার প্রাপ্তিস্বীকার করুন, বাইরে বের হবার সময় সে যেভাবে পর্দা করে বের হয় তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলুন, সে যখন ঘরের দেখাশোনা করে তখন তার প্রশংসা করুন। আর স্বামী যে ঘরের বাইরে কাজ করে, পরিবারের জন্য উপার্জন করে স্ত্রী তা উপলব্ধি করুন। আপনি যে ভালো আছেন, নিজের ঘরে নিরাপদবোধ করছেন, সেটা জানিয়ে স্বামীর প্রশংসা করুন। সে আপনার জন্য যা করে তার জন্য তারিফ করুন।"*
>
> — *উম্মে মুহাম্মাদ*

মূলত রাসূল (সা.) বলেছেন যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ না সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ না। একজনকে ধন্যবাদ বলাটা হয়তো খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু জীবনের জোয়ার-ভাটায় এটাই আমরা প্রায়সময় ভুলে যাই।

পারস্পরিক যোগাযোগ

> *"একটা বিয়ে আসলে তখনই টিকে থাকে যখন দুজনই জানে কীভাবে একসাথে থেকে সমস্যার সমাধান করতে হয়। সমস্যা থাকবেই। কিন্তু তুমি যদি না জানো কিভাবে একসাথে মিলেমিশে সমস্যা সমাধান করা যায়, তখনই মতপার্থক্যের তৈরি হয়। অন্য একজনের মতের প্রতিও সম্মান থাকতে হবে। এরকম করলে সমস্যা আর সমস্যা থাকবে না, খুব তাড়াতাড়ি সুন্দরভাবে সেটা মিটে যাবে।"*
>
> —*হাযার*

একটা দম্পতি নিজেদের মধ্যে কথা বলবে, নিজেদের অনুভূতি ভাগাভাগি করবে, নিজেদের পার্থক্যগুলো খোলামেলা ও সৎ ভাবে সমাধান করবে। পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবে প্রায়ই ভুল বুঝাবুঝি হয়, একজনের প্রতি আরেকজনের অবজ্ঞা তৈরি হয় এবং বিরক্তি ও অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সমস্যাকে ফেলে রাখা যাবে না বা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। বেশিরভাগ সময় একটা সমস্যাকে সামলানো সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে প্রাথমিক ঝামেলা শেষ হয়ে গেলে এটা নিয়ে কথা বলা। এ উপায়ে একটা দম্পতি শান্ত হওয়ার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারে যখন তারা আর আত্মরক্ষামূলক আচরণ করে না।

ধৈর্য

"ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাজের মাধ্যমে।" (সূরাহ বাকারা, ২:৪৫)

কোনো কিছুর জন্য পুরস্কার থাকলে তার সাথে পরীক্ষাও থাকে। বিয়েতেও আছে। একটা দম্পতির সবসময় মতের মিল হবে না, সবসময় একজন আরেকজনের উপর খুশি থাকবে না, বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হবেই। এইসময়ে টিকে থাকতে, টিকিয়ে রাখতে এবং সমস্যার সমাধান করতে ধৈর্যের প্রয়োজন। ধৈর্যের মানে হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম না করা, ঝগড়া হয়েছে বলে একজন আরেকজনের অধিকার নষ্ট না করা। ধৈর্যের মানে হচ্ছে একজন আরেকজনের ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া, অন্যজনের ত্রুটি, দুর্বলতা, ভুলগুলোর সাথে মানিয়ে নেওয়া। বিয়ে একটা কঠোর পরিশ্রমের ব্যাপার। একজনের মধ্যে অস্থিরতা থাকলে, অধৈর্য হলে বা সহ্যক্ষমতা না থাকলে এতে সফল হওয়া যায় না।

বিনয়

একজন অহংকারী, একগুঁয়ে মানুষের সাথে বিয়ে হওয়া একটা দুঃস্বপ্নের মতো। তারা কোনো ধরনের পরামর্শ, সমালোচনা বা অভিযোগ গ্রহণ করে না। এতে করে অন্যজনের মনে বিরক্তি এবং হতাশার উদ্রেক হয়। দুজনকেই বুঝতে হবে যে তারা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে না আর বিনয়ী হওয়াও কোনো ধরনের দুর্বলতা না—বরং এটা একটা প্রশংসাযোগ্য গুণ। উদার মনের সমালোচনা গ্রহণ করলে নিজের উন্নতি হয় আর সম্পর্কটা ভালো থাকে।

নম্রতা

"আল্লাহ স্বয়ং নম্র, তাই তিনি নম্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি কঠোরতার জন্য যা দান করেন না; তা নম্রতার জন্য দান করেন।" (হাদিস, ইবনু মাজাহ)

একটা দম্পতি নিয়ম ভেবে একজন একজনের সাথে নম্র ব্যবহার করবে। একটা সফল বিয়েতে বাঁকা বাঁকা কথা, গালিগালাজ, চিৎকার করে কথা বলা বা হিংস্রতার কোনো জায়গা নেই। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে মায়ার সাথে সহানুভূতিশীল হয়ে আচরণ করবে। তাতে করে সম্পর্কে দু'জনই নিরাপদবোধ করবে ও আস্থা রাখতে

পারবে। এতে তাদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে, যেকোনো সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে। হ্যাঁ, এমন অনেক সময় আসে যখন নম্র থাকা যায় না, কিন্তু এটাকে মূলনীতি হিসেবে ধরতে হবে।

নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা

আল্লাহ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এগুলো পূরণ করা অত্যাবশকীয়।

> *"কখনো কখনো উৎসাহী এবং অনুপ্রাণিত হয়ে ভাবতে হবে যে আমার নিজেকে সুন্দর দেখানো উচিত, আমার স্বামীর জন্য ভালো খাবার রান্না করা উচিত। একবার যদি অলসতা তোমাকে গ্রাস করে ফেলে তাহলেই গেল। স্বামী যদি প্রতিদিন বাড়ি ফিরে একটা অগোছালো স্ত্রীকে দেখে, মজার খাবার না পায়, তাহলে এই বিয়েতে তুমি কিভাবে সুখ আশা করো? এটা পারস্পরিক ব্যাপার, তুমি তার জন্য সুন্দর সুন্দর কাজ করবে, সেও তোমার জন্য সুন্দর সুন্দর কাজ করবে। একপাক্ষিক হলে হবে না"*
>
> *—সারা*

পুরুষকে অবশ্যই তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। তার অলস হওয়া চলবে না। আবার পরিবারের দেখাশোনার জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করাও চলবে না কারণ এটা তার নিজের দায়িত্ব। এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে একজন আরেকজনের শারীরিক চাহিদা পূরণ করছে কি না। স্ত্রী তার ঘরের কাজ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ফেলে রাখবে না, জমাবে না। দায়িত্বে অবহেলা যে শুধু পাপ, তা না। বরং এটা অনেক বৈবাহিক সমস্যার জন্ম দেয়—বিরক্তি সৃষ্টি করে, একে অপরের প্রতি সম্মান হারায়, ঝগড়া হয়। বিচ্ছেদও হয়।

ঘরের ভেতরের শেখা চিরন্তন হোক

মুসলিম স্বামী ও স্ত্রীকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় যে তারা একজন আরেকজনের জন্য সাজবে, নিজেকে সুন্দর রাখবে। এটার প্রভাব খুব চমৎকার। সাধারণত অন্যরা যা করে, তা না করে একজন মুসলিম স্ত্রীর উচিত ঘরের ভেতর সুন্দর হয়ে থাকা, স্বামীর জন্য, নিজের জন্য। তার জানা উচিত যে এতে সম্পর্কে আনন্দোচ্ছলতা এবং আবেগ সৃষ্টি হয়। উপহার, চিরকুট আদান-প্রদান করে, শুধুই দুজনের রোমান্টিক পরিবেশে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে; হোক সেটা ক্যান্ডল লাইট অথবা বাচ্চারা ঘুমানোর পর বসার ঘরের মেঝেতে—সম্পর্কের আবেগকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। মূল চাবিকাঠি হচ্ছে একজন আরেকজনকে সময় দেওয়া, সুন্দর কথা বলা, একজন আরেকজনকে গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করা।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা

একটা বিয়ে ভালোভাবে টিকিয়ে রাখার উপায়গুলোর একটা হচ্ছে একজন আরেকজনের ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মতামতকে সম্মান করা। হাদিসে

একজন মুসলিম পুরুষকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে সে যাতে তাঁর স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্রকে বদলানোর চেষ্টা না করে-

নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙে যাবে। আর যদি তুমি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব, নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যহার করো, ভালো থাকবে।

অন্যের ব্যক্তিত্ব অভিমত এবং অভিজ্ঞতা কে সম্মান করা অপরিহার্য। কেউই কাউকে ছোট বা অপমান করবে না। এতে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি বা বিরক্তি সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটা সম্পর্কে দুজনই যার যার ভূমিকায় নিজেকে মূল্যবান ভাবতে পারে, আত্মবিশ্বাসী থাকে। ইসলামি বিয়েতে করুণা বা বিদ্রুপের কোনো প্রয়োজন নেই।

একসাথে আনন্দ করা

একসাথে আনন্দ করা, প্রতিদিনকার একঘেয়েমি কাটাতে ছোট ছোট ভিন্নতা আনার গুরুত্বকে কখনো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। রাসূল (সা.) এবং আইশা (রা.) এর সম্পর্কটা এরকম ছোট ছোট ব্যাপার এর উদাহরণ—একজন আরেকজনের সাথে মজা করতেন, খেলাধুলা করতেন, দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন, একজন আরেকজনকে গল্প শোনাতেন এবং খুব ভালো সময় কাটাতেন।

> *"খালি নিজেরটা ভাবলেই চলবে না। তুমি চাইবে সে তোমার জন্য তার রুটিনের বাইরে গিয়ে সুন্দর কিছু করুক, তাহলে তুমিও নিজের রুটিনের বাইরে গিয়ে তার জন্য সুন্দর কিছু করো। একজন আরেকজনের সাথে ভালো ব্যবহার করো, একজন আরেকজনকে সারপ্রাইজ দাও, এমনি এমনিই। প্রতিদিনকার একঘেয়েমিতা থেকে বের হয়ে আসো।"*
>
> *—উম্মে মুহাম্মাদ*

বিয়েকে একটা ইবাদাতে পরিণত করতে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়া, আল্লাহকে মেনে চলা, নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা এবং একে অপরকে সম্মান করা—এসবই হচ্ছে লাভ অ্যাকাউন্ট এর জমা। ভালোবাসা প্রতিদিন নতুন করে বেঁচে থাকে নিজেদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি ভাগাভাগি করায়, পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করায়, একসাথে মজার মজার কাজ করায়। এতে লাভ অ্যাকাউন্ট ধনী হয়, বিয়েটাও সুন্দর থাকে।

মা, মা, মা

আমার বিয়ের এক বছর পর আমার প্রথম সন্তান জন্ম নেয়। নয় মাস ধরে আমি আমার শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, দেখেছি একটা সন্তান একটু একটু করে বড় হচ্ছে, একটা জীবন আমার ভেতর গড়ে উঠছে। গর্ভাবস্থা এবং মাতৃত্বকে আমি প্রবল উদ্দীপনায় গ্রহণ করেছিলাম—পুষ্টিকর খাবার খেতাম, ব্যায়াম করতাম, এই বিষয়ক যা বই পেতাম সব পড়ে ফেলতাম। আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যে আমার সন্তান ঘরে জন্মগ্রহণ করবে, ক'জন ধাত্রীর সহায়তায়, তারা আমাকে সমর্থন দিচ্ছিল। আমার স্বামী ও ধাত্রীর উপস্থিতিতে আমার সন্তান আমাদের বাড়ির নিচ তলার একটা রুমে জন্মগ্রহণ করে। সাথে ছিল শুধু পানি, কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এবং অনেক মানুষের দুআ। আমার ছেলে খুব স্বাস্থ্যবান হয়ে জন্ম নেয়। আমার শাশুড়ি পাশের বাড়িতেই থাকত আর আমার বোন সেসময় উপরের তলায় মুরগি রান্না করছিল। এটা ছিল একটা চমৎকার স্মৃতি। এরকম করেই একদিন আমি মা হয়ে উঠলাম।

নতুন প্রাণের বৃদ্ধি

নিজের ভেতরে একটা নতুন প্রাণ বয়ে বেড়ানোকে আমি সবসময়ই একটা ইবাদাত হিসেবে নিয়েছি যা আমাকে আল্লাহর কাছাকাছি নেবে। কারণ আল্লাহ সন্তান জন্ম দেওয়াকে পছন্দ করেন, ইসলাম এতে উৎসাহিত করে, আর সন্তান হলো এই দুনিয়ার জীবনে কল্যাণের উৎস, হয়তো পরের জীবনেও। বিভিন্ন সমস্যায়, কষ্টে ধৈর্য ধরার পাশাপাশি সকালবেলার অসুস্থতা, হার্টবার্ন, পিঠে ব্যথা এবং আরো নানারকম ব্যথা সহ্য করাও এক ধরনের ইবাদাত। মা'কে উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করা হয় তার একটা কারণ হচ্ছে সন্তান ধারণের নানান কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়।

নিজের দেহের পরিবর্তন দেখা, ভেতরের জীবন্ত প্রাণের নড়াচড়া অনুভব করা, ছোট ছোট আঙুলের ছবি, পূর্ণাঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি, বাচ্চাটা কীভাবে বেড়ে উঠছে, কী করছে, কী শিখছে এই নিয়ে পড়াশুনা—এসবই বিনয় এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বিনয়ের সৃষ্টি করে কারণ তুমি জানো একদিন তুমিও এমন ছিলে, তখন মনে হয় তোমার ভিতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার ওপর তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, আল্লাহ; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি এসব নিয়ন্ত্রণ করছেন; একটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া

চলছে। উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় কারণ আল্লাহ্ একটা নতুন প্রাণের সৃষ্টির জন্য তোমার গর্ভকে বেছে নিয়েছেন। তুমি একটা মহৎ এবং প্রাচীন প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছ, তুমি বুঝতে পারো তোমার জরায়ু, অমরা, হৃদপিণ্ড মিলে এই প্রক্রিয়ায় কাজ করছে। হৃৎপিণ্ড সারা দেহে কিছু অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন করছে। সে এক তীব্র ভালোলাগার অভিজ্ঞতা।

সন্তান জন্মদানের সময়টাও এমন। তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা, ব্যথা অ্যাড্রেনালিন এবং অ্যান্ডোরফিন—সব মিলিয়ে এক তীব্র অভিজ্ঞতা, যদি তুমি সেভাবে দেখো আর কী! ঈসা (আ.) ও মা মারইয়াম এর ঘটনা থেকে আমরা এ ব্যাপারে উৎসাহ নিতে পারি। কুরআনে বলা আছে মারইয়ামের মা গর্ভের সন্তানকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন সন্তানটি একটি মেয়ে হলো, তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন যে তার প্রতিজ্ঞা কীভাবে রাখবেন। কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলা মারইয়ামকেই বেছে নিয়েছিলেন যার কাছে ফেরেশতা জিবরাইল আসেন। তাঁকে সংবাদ দেন যে তার একজন সন্তান হবে, একজন ন্যায়নিষ্ঠ সন্তান হবে, যে এই দুনিয়ায় এবং পরকালে সম্মানিত হবে, তিনি ঈসা (আ.)। মারইয়ামের সাথে কোনো পুরুষের ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তিনি খুব অবাক হলেন যে, তার একজন সন্তান কীভাবে হতে পারে যেখানে কোনো পুরুষই তাকে স্পর্শ করেনি। ফেরেশতা উত্তর দিলেন,

> "এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোনো কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। (সূরাহ আলে ইমরান ৩: ৪৭)

এরপর মারইয়াম সন্তানকে জন্ম দিতে মানুষের কাছ থেকে দূরে একটা নির্জন উপত্যকায় চলে গেলেন। সন্তান জন্মের তীব্র যন্ত্রণায় তিনি যখন কেঁদে উঠলেন তখন আল্লাহ্ তার পায়ের কাছে পানির সৃষ্টি করে দিলেন আর শক্তির জন্য তাজা খেজুরের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর এক জন পুত্রসন্তান হলো, ঈসা (আ.), তিনি একজন মহান নবি ছিলেন, যিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতেন এবং এভাবে তিনি বহু মানুষের কষ্ট লাঘব করেন।

মারইয়ামের অভিজ্ঞতার একটা অসাধারণ ব্যাপার রয়েছে। একটা নির্জন উপত্যকায় একজন কুমারী নারী একটা সন্তানের জন্ম দিচ্ছে—এই ঘটনা আমাদেরকে শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী হতে শেখায়, আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখায় যে তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে এই কাজের জন্য উপযুক্ত করে তৈরী করেছেন।

অন্যান্য মুসলিম সমাজের চেয়ে আমাদের সমাজটা একটু অন্যরকম। এখানে সন্তানের জন্মের সময় বাবারা প্রায়ই উপস্থিত থাকে। এর একটা কারণ হতে পারে যে আমাদের অধিকাংশই পশ্চিমা পরিবেশের। পশ্চিমে বাবারা এসব ব্যাপারে উপস্থিত থাকে। যাই

হোক ইতিহাস বলে এমনকি আজও অনেক পুরনো সমাজে এই জন্মদানের প্রক্রিয়া থেকে পুরুষকে দূরে রাখা হয়। এটা ঘটে অন্দরমহলে, নারীদের রাজ্যে।

হাসপাতালে, কেন্দ্রে, বাসায়—সবখানে আমাদের স্বামীরা জন্মপ্রক্রিয়ায় একজন সঙ্গী হিসেবে পাশে থাকে। হাসপাতালে তাদের সমর্থন অপরিহার্য। তারা মা'কে উৎসাহ দেয়, আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়, দুআ করে, মা'কে বলে সে যেন নিরাশ না হয়। ইসলামি নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারেও তারা লক্ষ্য রাখে। বিশেষ করে আমাদের পর্দা রক্ষা হচ্ছে কিনা এবং আমরা যা চাই, যেভাবে চাই, সবকিছু সেভাবে হচ্ছে কিনা। হাসপাতালে সন্তান জন্ম দেওয়ার এটা একটা বড় সমস্যা। সাধারণত আমরা মেয়েরা অপরিচিতদের সামনে পর্দা করে থাকি, সন্তান জন্মের সময় আমাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আমরা খুব বেশি উদগ্রীব থাকি। বাসায় এটা হয় না; এখানে একদম নিজের জায়গায় নিজের মত থাকা যায়। আশেপাশে মেডিকেলের ছাত্ররা থাকে না, অপরিচিত মানুষ থাকে না যারা তোমার দুপায়ে ধরে বারবার বলতে থাকবে, পুশ করো, পুশ করো। একজন ধাত্রীর উপস্থিতি নিজের ইচ্ছা মতো গুছিয়ে সন্তানকে পৃথিবীতে আনা যায়। কুরআন পড়া যায়, নিজের খাবার খাওয়া যায়, মাথার চুলের অবস্থা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চিন্তায় থাকতে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা নিজের বিছানা থাকে, স্বামী থাকে, আগের সন্তান থাকলে তারাও নিজেদের ঘরে শান্তি মত থাকতে পারে।

সন্তান পরিকল্পনা

অনেক মেয়েই জন্ম নিয়ন্ত্রণের নির্ভরযোগ্য উপায়গুলোও গ্রহণ করে না। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। একটা হলো মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে একজন নারী গর্ভবতী হবে কি হবে না এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মানুষ হিসেবে আমরা জানি যে আমরা উটের দড়ি বাঁধতে পারি অর্থাৎ যে ফলাফল আমরা চাই সে অনুযায়ী কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর হাতেই। কারো গর্ভবতী হওয়ার কথা থাকলে সে হবেই।

রাসূল (সা.) কে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ যে রূহ পয়দা করতে চান সে রূহ অবশ্যই পয়দা হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণকে কেন খুব বেশি ব্যবহার করা হয় না তার আরেকটা কারণ হচ্ছে মুসলিমদের বেশি বেশি সন্তান নেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এটা দ্বীনের একটা অংশ। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ কর। কেননা, আমি কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের চাইতে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে গর্ব করব।

এ কারণে সারা বিশ্বে মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার অনেক বেশি। আমাদের সমাজও এর বাইরে না। এখানে একটা দম্পতির চার জন সন্তান অথবা তার চেয়ে বেশি থাকা অস্বাভাবিক কিছু না।

আজকাল অনেক মানুষের কাছে বড় পরিবার হচ্ছে এক ধরনের পশ্চাৎপদতা, যখন মানুষ জানত না কীভাবে তাদের প্রজনন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মুসলিমরা এ ব্যাপারটা একটু ভিন্নভাবে দেখে। আল্লাহর দৃষ্টিতে সন্তান একটা রহমত; কোনো অভিশাপ বা ঝামেলা না। আমার মনে করি না যে আমাদের জীবনটা একটা নির্দিষ্ট মানদন্ডে বাঁধা—দুটো গাড়ি, বাড়ির সামনে পেছনে বাগান, প্রতিবছর বিদেশে ঘুরতে যাওয়া এবং ঐভাবে সন্তানের বেড়ে ওঠা। এই সমস্ত বস্তুগত ব্যাপারের চেয়ে সন্তান অনেক বেশি মূল্যবান এবং তাদেরকে সেভাবেই দেখা হয়। সব ধরনের আর্থিক অবস্থায়ই প্র্যাকটিসিং মুসলিমরা বড় পরিবার পছন্দ করে এবং নতুন সন্তান আসার খবরে খুশি হয়। তারা দুআ করে যাতে এই সন্তান একজন ভালো মুসলিম হিসেবে বড় হয়ে ওঠে, আল্লাহর একজন সত্যিকারের বান্দা হয়।

আলিমরা দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান কম নেওয়াকে অনুমোদন করেননি, কারণ আল্লাহ বলেছেন,

> "দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।" (সূরাহ বনি ইসরাইল, ১৭:৩১)

এ কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকটা সন্তান তার নিজের রিজিক নিয়ে দুনিয়াতে আসে, যেটা আল্লাহ তার জন্য লিখে রেখেছেন, মা বাবার উপরে তার রিজিক নির্ভরশীল না। তবে কিছু কিছু সময় আসে যখন জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। ইসলামি আইন অনুসারে যখন গর্ভবতী হওয়া বা সন্তান জন্ম দেওয়া মায়ের জন্য বিপদসঙ্কুল অথবা তার মৃত্যুর আশংকা করা হয় তখন এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এছাড়া যখন অন্য কোনো প্রয়োজনে গর্ভনিরোধ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

"এখনো কোনো বাচ্চা হয়নি?"

অতীতে বিশ্বের বেশিরভাগ সমাজে নারীর উপযোগিতা পরিমাপ হতো শুধুমাত্র একজন মা হিসেবে। কোনো সন্তান না হলে তাকে মূল্যহীন মনে করা হতো। তাকে একটা অপচয় হিসেবে দেখা হতো। তার স্বামীকে বারবার তাগাদা দেওয়া হতো সে যেন অন্য একজন নারীকে বিয়ে করে যে তাকে সন্তান দেবে। কিছু কিছু সংস্কৃতিতে চিত্রটা এখনো এমনই।

কিন্তু ইসলামে চিত্রটা এমন না।

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

> "নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (সূরাহ আশ-শুরা, ৪২:৪৯-৫০)

একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম নারী নিজেকে সন্তান জন্ম দেওয়াকে নিজের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করে না। সে মনে করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাত করতে। যদি সন্তান জন্ম দেয়ার মাধ্যমে সে ইবাদাত করতে পারে, তাহলে এটা একটা রহমত। যদি তা না হয়, তাহলে আরও অনেক উপায় আছে যার মাধ্যমে সে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে এবং একটা ইসলামি জীবন যাপন করতে পারে।

উম্মে মুহাম্মাদ আমাকে বলছিল, "মুসলিম সমাজের অনেকেই সত্যিকারের ইসলাম বোঝে না। আমরা জানি যে আমাদেরকে তাকদিরে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। একজন নারী ও পুরুষ চেষ্টা করতে পারে কিন্তু এটা আল্লাহর হাতে যে সে নারী গর্ভধারণ করবে কি না। সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল—সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তুমি ধনী হবে না গরিব হবে—সবই আল্লাহর আদেশ।"

এ প্রসঙ্গে সমাজে আরেকটা সমস্যা তৈরি হয়—মেয়ে সন্তান! কিন্তু ইসলামে মেয়ে সন্তানকে কীভাবে গ্রহণ করা হয়?

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজে মেয়ে শিশুকে হত্যা করা হতো, জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। অনেক সমাজে, যেখানে ইসলামকে মূল আদর্শ হিসেবে ধরা হয়, সেখানেও মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করাকে এক ধরনের কলঙ্ক ভাবা হয়। আল্লাহ কুরআনে কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছেন,

> "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।" (সূরাহ নাহল, ১৬:৫৮-৫৯)

মেয়ে সন্তানকে বড় করা এবং তাদের যত্ন নেওয়ার পুরস্কারের বর্ণনা দিয়ে অনেক হাদিস আছে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

যে ব্যক্তি দুজন কন্যা সন্তানকে লালন-পালন ও দেখাশোনা করল (বিয়ের সময় হলে ভালো পাত্রের কাছে বিয়ে দিল) সে এবং আমি জান্নাতে এরূপে এক সঙ্গে প্রবেশ করব, যেরূপ এই দুটি আঙুল। এ কথা বলার সময় তিনি নিজের দুই আঙুল মিলিয়ে দেখালেন।

"আমাদের সমাজের ছেলে হোক বা মেয়ে হোক—সবটাই সমান। কারো যদি অনেকগুলো ছেলে থাকে এবং তারপর একটা মেয়ে হয় সবাই খুব খুশি হয় আর যদি অনেকগুলি মেয়ে থাকে এবং তারপর একটা ছেলে হয় একই ব্যাপার ঘটে।"

— ইয়াসমিন

মা, মা, মা... তারপর বাবা

বিশ্বের অনেক সংস্কৃতিতে মায়ের ভূমিকা ও মর্যাদা অনেক উপরে। তিনি সন্তান ধারণ করেন, নতুন প্রজন্মকে জন্ম দান করেন, আগামীর সন্তানদেরকে পরিচর্যা করেন, রোগে সেবা করেন, সান্ত্বনা দেন, আদর করেন, ভালোবাসেন—তিনি সমাজের দৃঢ় কিন্তু কোমল মেরুদন্ড। ইসলামেও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

> "আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুবছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (সূরাহ্ লুকমান,৩১:১৪)

একদিন এক লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে?

তিনি বললেন, 'তোমার মা।'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর কে?

তিনি বললেন, 'তোমার মা।'

সে লোকটি আবারও প্রশ্ন করল, তারপর কে?

তিনি বললেন, 'তোমার মা।'

লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল, তারপর কে?

তিনি বললেন, 'তারপর তোমার বাবা।

এই ঘটনা এবং অন্যান্য হাদিসের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে একজন মুসলিমের জীবনে মায়ের মর্যাদা অনেক উঁচুতে। বলার প্রয়োজন নেই যে এই মর্যাদা অনেক কষ্টে অর্জিত—সন্তান লালন-পালন এবং তাদেরকে বড় করে তুলতে যেসব বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষার সম্মুখীন একজন মা'কে হয় হয়—সেসবে ধৈর্যধারণ করার পাশাপাশি ঘরকে শান্তিদায়ক, নিরাপদ করে রাখা ঐ কষ্টের অন্তর্ভুক্ত।

একটা মেয়ের কাজ

আগেও যেমনটা বলেছি যে একজন মুসলিম স্ত্রীর ভূমিকা হচ্ছে সে তার ঘরকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখবে। প্রথম প্রথম কাজটা আমার বেশ কঠিন মনে হয়। মূলত এর কারণ ছিল আমি কখনো এসব কাজ করিনি। জিম্বাবুয়েতে আমি যেখানে বড়

হয়েছি সেখানে সব সময় ঘরের কাজ করার জন্য লোক রাখা হতো। এসব কাজ আমার কাছে খুব একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর লাগত, সময়ের অপচয় মনে হতো। ঘরের কাজ করার মধ্যে আমাদের সমাজে কোনো মর্যাদা নেই, বিশেষ করে একজন তরুণী নারীর পক্ষে। নিজেকে ঘরের রাণী দাবি করা ছাড়া ঘরের কোণ পরিষ্কার করার জন্য ব্যস্ত হওয়াটা প্রগতিশীল না। রাণী হলে কিছুটা মাফ করা যায়। কিন্তু একবার বিদেশ থেকে আমার বড় বোন আমাকে দেখতে আসলো। সে এমন কিছু বলল যে তার কথা শুনে আমি আবার নতুন করে ভাবলাম। আমি কিছু কাপড় ইস্ত্রি করছিলাম আর অভিযোগ করছিলাম যে এসব করতে আমার কতটা বিরক্ত লাগে। তখন সে আমাকে বলল, নিজের ঘরের যত্ন নিতে কী এমন সমস্যা? তখন আমি ভাবলাম, এটাই তো সত্যি। নিজের ঘর পরিষ্কার করতে, যত্ন নিতে, একে সুন্দর রাখতে কী এমন সমস্যা? তারপর আবার মনে পড়ল যে এসব করার জন্য আল্লাহ্ আমাকে এই দুনিয়ায় এবং পরকালে কী কী পুরস্কার দেবেন, যদি আমি এগুলোকে ইবাদাত হিসেবে নেই। এর মানে হচ্ছে যতই ক্লান্ত লাগুক না কেন, ঘরের কাজ করার জন্য আমি যেসব পরিশ্রম করব সবকিছুরই একটা না একটা ফল থাকবে। ঘরের যত্নের প্রতি মনোযোগী হতে আমার পরিবার আমাকে খুব গোপনে কিন্তু ভদ্রভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছিল। এতে আমি খুব লজ্জা পাই আর আমি চাইনি সবাই আমাকে অগোছাল হিসেবে ধরে নিক। তাই আমি নিজেকে গোছানোর সিদ্ধান্ত নিই। এগুলোকে আর সময়ের অপচয় হিসেবে দেখতাম না বরং ইবাদাত হিসেবে দেখতাম। তাতে আমার নিজেকেও যুক্তি দেওয়া হতো আর আমি এগুলো নিয়ে এত না ভেবে আরো মজার মজার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে লাগলাম। তাতে ঝামেলা কম লাগল।

> *"আমি বলব না যে সব সময় ঘরের কাজ করতে আমার ভালো লাগে কিন্তু যেহেতু আমি এটাকে ইবাদাত হিসেবে নিই, তাই এসব করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। আমি শক্তি পাই।"*
>
> *—সারা*

একজন গৃহিণীর ভূমিকা পরিবারের পাশাপাশি সমাজেও প্রভাব ফেলে, সে-ই আঠার মতো পরিবার ও সমাজকে একসাথে আটকে রাখে। তাই আল্লাহর কাছে এর মর্যাদা ও সম্মান আছে। অনেক নারী-পুরুষ ভাবে ঘরের কাজ করা ও সন্তান দেখাশোনা করা নিচু মর্যাদার কাজ—ইসলাম এরকম ভাবে না। দ্বীন মনে করে যে ঘর হচ্ছে সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য প্রথম প্রশিক্ষণকেন্দ্র, তাই এর যত্ন ও পরিবেশকে গুরুত্ব দিতে হবে। একে তালিকার একদম শেষে ফেলে রাখা যাবে না। পারিবারিক জীবন যদি নিরাপদ এবং ভালোবাসাপূর্ণ হয়, তাহলে এর সন্তানেরাও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে। তাই যে নারী ঘর ও পরিবেশের দেখাশোনা করে তাকে কখনো অবমূল্যায়ন করা যাবে না।

পরীক্ষা ও আশীর্বাদ

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

> "আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। (সূরাহ আন নাহ্ল, ১৬:৭২)

এ কারণে মুসলিমরা সন্তানদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হিসেবে দেখে এবং এই অনুগ্রহের জন্যে তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। এর সাথে বিশ্বস্ততা জড়িত কারণ সন্তানরা আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের ঋণ। আর তাদের লালন পালন করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব এবং ইবাদাত।

> *"সন্তান থাকলে মানুষ পৃথিবীটাকে একটু ভিন্নভাবে দেখে। তখন তুমি চাও যে সন্তানের থাকবার জন্য পৃথিবীটা আরো একটু সুন্দর হোক। কারণ তারা আমাদের না, আল্লাহ তাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমাদের বিশ্বস্ততার জন্য।"*
>
> *—লায়লা*

হাযার ইসলামে আসার আগেই তার ছেলে ফারিস এর জন্ম হয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম একজন অমুসলিম এবং মুসলিম মা'য়ের মধ্যে সে কী ধরনের পার্থক্য অনুভব করেছে।

> "একজন মুসলিম মা হিসেবে আমার ভূমিকা একজন অমুসলিম মায়ের ভূমিকার চেয়ে পুরোপুরি আলাদা। কারণ আগে আমি ভাবতাম যে আমার সন্তান পুরোপুরি আমার অধিকারের। কিন্তু না, এখন আমি মনে করি যে সে আমার কাছে এক ধরনের আমানত এবং আমি এই আমানত দিয়ে কী করেছি এ সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হবে। এখন তার বেড়ে ওঠায় আমি পরকালকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিই এবং জীবন নিয়ে সে যা করবে সেটা সম্পূর্ণই তার ব্যাপার। ইনশাআল্লাহ এটাই সবচেয়ে ঠিক কাজ হবে।"

অন্য কারো মূল্যবান কিছু যদি আমাদের কাছে থাকে তাহলে সেগুলোকে আমরা যেভাবে রাখব ঠিক একইভাবে সন্তানকেও দেখে রাখতে হবে, কারণ তারা আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত। তাই একজন আত্মবিশ্বাসী ভালো মুসলিম হতে তাদের যা যা প্রয়োজন, যে ভালোবাসা, যত্ন এবং মনোযোগ প্রয়োজন, তাদেরকে তা দিতে হবে। তাদেরকে ঠিকভাবে দেখাশোনা করতে হবে, তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে হবে, তাদের সাথে ধৈর্যশীল হতে হবে, তাদেরকে ভালো এবং মন্দের পার্থক্য শেখাতে হবে।

সারার একটা ছোট এক বছরের বাচ্চা আছে। সে বলছিল,

> "ও আমার কাছ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আমানত, যেটা আমার কাছে আমার যত্নে আছে, ওর কোনো যত্ন করতে বা ন্যাপি বদলে দিতে যখন আমার আলসেমি লাগে, তখন আমি ব্যাপারগুলো এভাবে ভাবি, তোমাকে মনে রাখতে হবে সে

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য এক ধরনের রহমত এবং তোমার সেরাটাই তাকে দিতে হবে। তার বড় হয়ে ওঠা, শিক্ষা, তারবিয়্যাত সবকিছু ইসলামের ভিত্তিতে হচ্ছে কি না এই জন্য তোমাকে প্রশ্ন করা হবে।"

সবাই জানে যে অভিভাবকত্ব সহজ কিছু না। জীবনে যেসব ব্যাপারে অনেক পুরস্কার আছে সেগুলোর জন্য কঠোর পরিশ্রম, আত্মোৎসর্গ এবং ত্যাগ প্রয়োজন হয়। ছেলেমেয়েরাও তোমার জন্য পরীক্ষার কারণ হতে পারে, তারা তোমাকে সহ্যের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। আল্লাহ কুরআনে এভাবে বলেছেন,

"আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা সাওয়াব।" (সূরাহ আনফাল,৮:২৮)

সন্তানেরা অনেক উপায় বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা হতে পারে—দ্বীন, সময়, শারীরিক এবং মানসিক অবস্থায়। লোকসমাগমে ভর্তি একটা বাজারের মাঝখানে বাচ্চাদের ঘ্যানঘ্যানানি যার সহ্য করতে হয়েছে সে জানে এই খবর। কিন্তু যেহেতু বাচ্চাদেরকে বড় করা আমাদের একটা মূল ধর্মীয় দায়িত্ব, এ কারণে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এই ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে একজন মুসলিম মা হিসেবে এটাই আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পাবে।

ফুল টাইম মাদার

বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে, তার ন্যাপি বদলে দিতে দিতে আর বারবার ঘুম ভাঙ্গার মাঝখানের কোনো একটা সময়ে আমি অকপটে আমার বাচ্চাকে ভালোবেসে ফেললাম। জন্মের বিস্ময়ে আমি বিস্মিত ছিলাম। আর এখন আমি তার ছোট ছোট আঙ্গুলে, সুন্দর বড় বড় দুটি চোখে মুগ্ধ।

মুসলিমরা বিভিন্নভাবে বাচ্চার যত্ন নেয় কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একজন পূর্ণকালীন মায়ের দায়িত্ব পালন করা।

আমার কখনোই মনে হয়নি যে আমার বাচ্চার যত্ন নেওয়ার চেয়ে আমার বাইরে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। অথবা ওর সাথে বসে বসে গল্পের বই পড়ে শোনানোর চেয়ে অফিসে আমার সময়টা ভালো কাটবে। অথবা মা-বাচ্চার দলের চেয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আমাকে ভালো মানায়। ঘরে বাচ্চার যত্ন নেওয়ার কারণে আমার কখনো নিজেকে ছোট মনে হয়নি বরং এর মাধ্যমে আমি আরও বেশি সুবিধা পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ হয়েছি যে এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সামর্থ্য আমার আছে।

গত শতাব্দীতে প্রায় সমস্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতায় একজন মায়ের জায়গা ছিল ঘরে, তার সন্তানের যত্ন নেওয়ায়। ইসলামও এই একই মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়। যদিও আজকের দিনে বেশিরভাগ মায়েরাই পার্ট-টাইম বা ফুল টাইম কাজ করে আর বাচ্চাদেরকে ডে-কেয়ারে রেখে আসে দেখভাল করার জন্য। কিন্তু অনেক মা-ই ঘরে থেকে নিজের সন্তানকে নিজেই দেখাশোনা করার পথ বেছে নিচ্ছে। এখন তারা শিক্ষিত হোক বা না

হোক, গ্রাম্য হোক বা শহুরে হোক, তারা সন্তানদেরকে যতটা সম্ভব কাছে রেখে বড় করতে চায়। তারা বিশ্বাস করে যে একজন মা-ই সন্তানের সবচেয়ে ভালো যত্ন নিতে পারে। আর মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে সে নারী শিক্ষিত হোক বা না হোক, সে আগে চাকরি করুক বা না করুক, মা হয়ে গেলে তার সন্তানই তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। এর মানে এই না যে একজন মুসলিম মা চাকরি করতে পারবে না। অনেক মুসলিম সমাজ এবং কমিউনিটিতে বোন, খালা, ফুফু, চাচী বা দাদী-নানীরা বাচ্চাদের দেখে, যখন মা একজন চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী অথবা মুসলিম মেয়েরা করতে পারে এমন কোনো কাজে বাইরে যায়।

একজন মুসলিম মায়ের একটা দায়িত্ব হচ্ছে তার সন্তানের সামনে ভালো কাউকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা, যার মাঝে আল্লাহর বিশ্বাস, ন্যায়পরায়ণতার পাশাপাশি বিনয়, সততা, সাহস, মহত্ত্ব, সহানুভূতি, দৃঢ়তা আছে। এরকম আদর্শের মধ্যে সবচেয়ে মহান হচ্ছেন আমাদের নবি মুহাম্মাদ (সা.)। তার ব্যাপারে সন্তানদেরকে জানানো, তাকে ভালোবাসতে শেখা, তাকে অনুসরণ করতে সন্তানদের উৎসাহ দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। অন্যান্য আদর্শের মধ্যে আছেন আমাদের নবিগণ এবং অতীতের মুসলিম মনীষীগণ। এই যুগের কৃতী মুসলিমগণও আমাদের আদর্শ।

সন্তানের বেড়ে উঠার সময় তাকে আল্লাহকে চেনাতে হবে, আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা তৈরি করতে হবে এবং এই পৃথিবীতে সে কেন আছে এ উদ্দেশ্য তাকে জানাতে হবে। ইসলামের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য—কীভাবে ওজু করতে হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হয়, রমজানে রোজা রাখতে হয়, বিভিন্ন রকমের দুআ যেমন কাপড় পরার সময়, খাওয়ার সময়, অথবা ঘর থেকে বের হবার সময় ইত্যাদি তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। একজন মুসলিম সন্তানের বেড়ে উঠায় তার দ্বীন প্রাধান্য পাবে নাকি দুনিয়া, সেটা এখন স্পষ্ট।

তবে যা-ই হোক না কেন, ঘরে থাকা সব মায়েরাই এরকম থাকতে পছন্দ করে না। আমি সবসময় কোনো না কোনো কাজের সাথে জড়িত থাকতাম। এমনকি আমার নিজের মনেও কখনো নিজের ব্যাপারে এ ধারণার স্থান দিতে চাইনি যে আমি একজন পূর্ণকালীন গৃহিণী। মেই ব্যাপারটা স্বীকার করেছিল যে সবসময়ই একজন হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকাটা তার জন্য না।

> "আমি কখনোই একজন হাউস ওয়াইফ হতে চাইনি। এ শব্দটা আমি পছন্দ করিনা, এই পেশাটা আমি পছন্দ করি না। যদিও ইসলামে তাদেরকে অনেক বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে, তবুও এই ভূমিকায় আমি নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারি না। আমি বড় হয়েছি একজন 'ক্যারিয়ার ওমেন' হতে। কিন্তু যখন এসব মনে পড়ে তখন আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিই যে, আমার জীবনে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য উপহার। তখন আমি খুশি হয়ে যাই আর যখন আমি খুশি হই, তখন আমি দেখি নিজের জন্য আমার আরও কিছু সময় আছে।"

শিক্ষিকা

একটি আদর্শ ইসলামি পরিবারের একটা দৃঢ় ভিত্তি আছে—এক আল্লাহতে বিশ্বাস এবং তাঁর ইবাদাত করা। এটাই হচ্ছে পরিবারের ভিত্তি এবং বেঁচে থাকার কারণ। একে কেন্দ্র করে পরিবারের সবকিছু আবর্তিত হয়—পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের আচরণ, তাদের কাজকর্ম, তাদের জীবন। নতুন মুসলিম হিসেবে এটা ছিল আমাদের কাছে একদমই নতুন। আমরা জানতাম যে মা হিসেবে আমাদের ভূমিকা একজন শিক্ষিকার মতো। কিন্তু সে ভূমিকা পালন করতে হলে আমাদেরকে আগে আমাদের নিজেদের পরিবার নিয়ে ভাবতে হবে, শৈশব নিয়ে ভাবতে হবে, বড় হতে হতে আমরা কী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি তা নিয়ে ভাবতে হবে, আমরা কী করতে চাই আর কী ছাড়তে চাই তার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। নিজেদের পরিবারের মধ্যে থেকে, কোনো আদর্শ ছাড়া, আমাদেরকে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিচালিত করবে এমন কোনো বড়দের সাহায্য ছাড়া একটা সত্যিকারের ইসলামি পরিবার তৈরি করতে গিয়ে আমাদের নিজেদেরই প্রচুর শিখতে হচ্ছিল।

নতুন মুসলিম হিসেবে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত পরিষ্কার ছিল যে আমরা আমাদের পুরাতন বিশ্বাসের উপরে ইসলামকে প্রাধান্য দিয়েছি। একটা মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা সন্তান বা একজন মুসলিম বাবার সন্তান যদিও একজন মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয় কিন্তু এর মানে এই না যে তার বিশ্বাস, তার ঈমান—সব ঠিকঠাক। ঈমান উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়, যদিও অনেক প্রথাগত মুসলিম এমনটা ভাবে। যেহেতু ইসলাম শেখায় যে অভিভাবক হিসেবে আমাদের সন্তানদের কাছে ঠিকভাবে দ্বীনকে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে করে তারা সেটা বুঝে এবং গ্রহণ করে নেয়, জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের বিশ্বাসটা গড়ে ওঠে, কিছু কুসংস্কার বা প্রথা বা ভয়ের কারণে না। রাবি'আ নিজেই একজন স্কুল শিক্ষিকা। সে বলেছিল,

> "মেয়েদের মনে রাখা উচিত দ্বীনে নতুন আসলে কেমন হয়, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা কিভাবে দ্বীন শিখেছিলাম। আমাদের কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আমার পড়েছি, শিখেছি। আমাদের উচিত আমাদের সন্তানদেরকে সেভাবে শেখানো। আমাদের সেই সময়ে ফিরে যেতে হবে যখন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। আমাদের সন্তানদেরকেও সেভাবে শেখানো উচিত।"

পশ্চিমের দেশগুলোয় একটা সুবিধা হচ্ছে যে এখানকার মুসলিমরা পশ্চিমা মাধ্যমগুলোর ইসলামিকরণ করে ইসলামের কাজে ব্যবহার করছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাচ্চাদের মাধ্যম। বাচ্চাদের আনন্দের সাথে ইসলাম শেখানোর জন্য বই, রেকর্ড, গেমস, সিডি এখন সহজলভ্য। ইসলামি গান এবং গল্পের মাধ্যমে তারা নবিদের সম্পর্কে এবং তাদের ঘটনা জানতে পারে, রাসূল, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবিদের ঘটনা জানতে পারে। এতে করে তারা তাদের ঐতিহ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাথে পরিচিত হয়।

স্কুলে ইসলামি শিক্ষা

উপরে উল্লেখিত প্রায় সব মেয়েই তার সন্তানদের ইসলামি স্কুলে পাঠায় অথবা তাদেরকে ঘরে পড়ায়। অনেক হয়তো ইসলামি স্কুলের ব্যাপারটা বুঝবে না। কিন্তু দ্বীন মানে এমন অনেকেই বুঝতে পারে যে একটা অমুসলিম দেশে ওখানকার শিক্ষাব্যবস্থার স্কুলের চেয়ে একটা ইসলামি স্কুল তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো। কারণ অন্য স্কুলগুলোতে এমন অনেক কিছু শেখানো হয় যা মুসলিমদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

একটা ইসলামিক স্কুলের পরিবেশ এমন হয় যাতে বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমাদের জীবনের সবকিছুর কেন্দ্রে আল্লাহ আছেন। তারা তাদের রবকে চিনতে পারে, রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তাকে ভালোবাসতে পারে এবং রবের প্রতি তাদের নিজেদের কর্তব্যগুলো বুঝতে পারে। এই পরিবেশটা দ্বীনের প্রতি, ইসলামি আচরণ এবং মূল্যবোধের প্রতি, ইসলামি জীবন ব্যবস্থার প্রতি বাচ্চাদের একটা ভালোবাসা তৈরি করে। বাচ্চারা কীভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করবে, কথা বলবে, তার কথা, কাজ, আত্মবিশ্বাস, পরিচয় এবং ভবিষ্যতে সে কী ধরনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে—ইসলামি পরিবেশ এ ব্যাপারগুলোকে প্রভাবিত করে। বাচ্চারা যেন তার মুসলিম পরিচয়ে নিরাপদ এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে বেড়ে ওঠে, সেদিকেও সাহায্য করে। নামাজের সময় হলে বা রোজা রাখলে তারা লজ্জা পায় না এবং হিজাব পরা নিয়েও তারা সমস্যা অনুভব করে না। ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে তাদের নিজেদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে স্বাভাবিকভাবে দেখার সুযোগটা তারা পায়।

ঈদ এবং ক্রিসমাস

ইসলামি স্কুলের পরিবেশের সুবিধার আরেকটা বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে যে মুসলিম শিশুরা তখন আর ইস্টার অথবা ক্রিসমাসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার তাগাদা অনুভব করে না। সুন্নাহ বলে যে মুসলিমদের বছরে দুটি উৎসব আছে— ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর। রমজান একটা পবিত্র মাস আর প্রত্যেক শুক্রবার, ইয়াওমুল জুমুআ হচ্ছে একটি বিশেষ দিন। এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত উৎসব। তাহলে একটা বাচ্চা যখন বইয়ে, সিনেমায়, বিজ্ঞাপনে ক্রিসমাস ট্রির নিচে রঙিন উপহার, দিওয়ালির আলোক উৎসব, জন্মদিনের কেকের উপর মোমবাতি জ্বলতে দেখে তখন তার কেমন লাগে! এটা খুব স্বাভাবিক যে একটা বাচ্চা এসবই চাইবে কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে এসব উৎসবে যোগদানের অনুমতি আমাদের নেই। তাহলে পশ্চিমে বাস করা কোনো একজন অভিভাবক তার সন্তানদেরকে এসবের বদলে কী দেবে?

আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায় এমন সব সামাজিক প্রথার কাছে নতি স্বীকার করার বদলে আমরা নতুন করে এসবের বিকল্প তৈরি করি। যদিও অনেকেই আজকাল

বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করে ফেলে। আমার ছেলের জন্য কখনোই জন্মদিনের উৎসবের আয়োজন করা হয়নি কিন্তু কয়েক বছর আগে ঈদ-উল-আযহায় সে তার বন্ধুদের নিয়ে একটা বিশেষ পার্টি করেছিল। সেখানে বেলুন, বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা, উপহার ছিল। কেউ কেউ প্রতি শুক্রবারকেই একটি বিশেষ উৎসব হিসেবে ধরে আয়োজন করেন। আর ঈদ এবং রমজানের জন্য আলাদা আয়োজন—নতুন কাপড় কেনা, বিভিন্ন রকমের প্রজেক্ট তৈরি করা, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, বাচ্চাদের জন্য পার্টির আয়োজন, দেশে বিদেশে ঘুরতে যাওয়া।

"আমি খুব ক্লান্ত হয়ে গেলেও এসব কখনো বাদ দেব না। আমি তাদেরকে বাইরে নিয়ে যাব, তাদের সাথে খেলাধুলা করব। কারণ যত কিছুই হোক না কেন তাদের জীবনে ঈদের স্মৃতি থাকা উচিত। এতে তারা নিজেদের ধর্ম, আত্মপরিচয় নিয়ে গর্বিত হয়"

—মেই

পাঠ্যক্রম এবং ইসলাম

ইসলামিক স্কুলের আরেকটা সুবিধা হচ্ছে সেখানে ইসলামি জ্ঞান এবং শিক্ষাক্রমের অন্যান্য বিষয় যেমন- গণিত, ইংরেজির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয়। কারণ ইসলাম শেখার উপরে অনেক জোর দেয়। অনেক কিছু শেখার আছে। একটা মুসলিম বাচ্চার পড়াশোনায় ইসলামি শিক্ষাকে একপাশে রেখে দেওয়া যাবে না। বাচ্চাকে স্কুলের পর সন্ধ্যাবেলা মাদ্রাসায় পাঠালেই সব হয়ে যায় না। এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু করার আছে। সে যেন তার ধর্মকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারে এবং একে ভালোবাসতে পারে এর জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে, এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

"আমি মনে করি যে বাচ্চাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে দ্বীন। কারণ দ্বীনই তার অন্যান্য ব্যাপার শুধরে দেবে। জীবনের উদ্দেশ্য যে দ্বীন, সেটা শেখাবে।"

— সারা

এর মানে এই না যে মা'য়েরা পাঠক্রমের শিক্ষাকে অবহেলা করছে। শিক্ষায় দুনিয়াকে গুরুত্ব দেওয়াটা খুব সহজ, যেভাবে সারা বলছিল যে, "কিছু মা-বাবা ছেলেমেয়ের অ্যাক্যাডেমিক অর্জনের ব্যাপারে খুব উচ্চাভিলাষী। তারা চায় তুমি জীবনে খুব বড় হও। কিন্তু আমাদের জন্য এটাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এটা দরকারি। আর আমার মনে হয় এটা ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপার।"

ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই আমার বাচ্চারা সবই শিখুক। তাদের শিক্ষায় দ্বীন থাকুক, তারা বিভিন্ন ভাষায় বলতে এবং লিখতে শিখুক, আরবি শিখুক, কীভাবে দুনিয়াটা চলে তা জানতে গণিত, বিজ্ঞান শিখুক, কুরআন কীভাবে পড়তে হয় তা শিখুক, কুরআন মুখস্থ করুক, ইসলামি ঐতিহ্যের পাশাপাশি বিশ্বের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানুক, ছবি আঁকার মাধ্যমে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটুক, তারা খেলাধুলা করে

শৃঙ্খলা শিখুক, তাদের শারীরিক বিকাশ হোক, তারা ভালো আচরণ শিখুক, তাদের চরিত্র হোক সুন্দর। আমি চাই তারা শিখতে এবং পড়তে ভালোবাসুক, জীবন এবং মানুষ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হোক, একটা অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে তারা চেষ্টা করুক। এটাই হচ্ছে দ্বীন এবং দুনিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা—আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক উন্নতি—যেটা আমরা মুসলিম অভিভাবকেরা খুব করে চাই।

দ্বীন এবং দুনিয়ার ভারসাম্য রক্ষা

দিনকে দিন দুনিয়ার আকর্ষণে পথ বিচ্যুত হয়ে পড়াটা খুব সহজ। আমরা হয়তো কোনো একটা কাজে খুব ব্যস্ত, অথবা কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত, তখন দ্বীন আমাদের কাছে পেছনে পড়ে যায়। তখন দেখা যায় আমরা আর আগের মতো পড়াশোনা করছি না, নামাজ মনোযোগ দিচ্ছি না, কুরআন পড়ছি না। কাজ এবং অবসরের নামে সমাজ আমাদের সামনে পথ বিচ্যুত হওয়ার অনেক রকম উপকরণ উপস্থাপন করে, তাতে করে একজন মানুষের নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলা ও আল্লাহর ইবাদাতে অবহেলা করাটা সহজ। তার মানে এটা না যে আমরা সারাদিনই নামাজ ও কুরআনে মগ্ন থাকব। মুসলিমদেরকে ভারসাম্য রক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের রাসূল (সা.) এই উদাহরণ আমাদেরকে দেখিয়েছেন। সামনে খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আছে এমন কোনো শিক্ষার্থী যেমন বাইরে ঘুরতে যাওয়ার জন্য বইপত্র ফেলে রাখতে পারেনা, তেমনিভাবে একজন মুসলিমও দুনিয়াবি কাজের জন্য আল্লাহর ইবাদাতকে অবহেলা করতে পারে না। আমাদের নিজেদের এবং সন্তানদের ক্ষেত্রে তাই দ্বীন এবং দুনিয়ার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

সারার বাবার মতো কিছু মুসলিম অভিভাবক আছেন যারা সন্তানের জন্য দুনিয়াকে খুব বেশি করে চান, যেমন সন্তান খুব ভালো শিক্ষিত হবে, আরাম-আয়েশে থাকবে, উচ্চপদস্থ হবে, বিনোদন, অবসর সবকিছুই তাদের জীবনে থাকবে। এরকম চাইতে গিয়ে তারা দ্বীনকে অবহেলা করে ফেলেন। এটাই হচ্ছে দ্বীনের উপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে, 'জীবনে কী গুরুত্বপূর্ণ' এই ব্যাপারে সংকীর্ণ এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী।

আবার এমন মুসলিম অভিভাবকও আছেন যারা দুনিয়াকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেন। বলেন যে ওদের শুধু একটা জিনিসই দরকার, সেটা হচ্ছে দ্বীন। তখন বাচ্চাদেরকে ঠিকমতো পড়াশোনা করানো হয় না, তাদের অবসরের জন্য কোনো সময় দেওয়া হয় না, তারা এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য তেমন কোনো যোগ্যতা অর্জন করে বড় হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে ইসলামের ব্যাপারে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী।

ইসলাম এই দুইয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। আমরা কেউই চাই না যে আমাদের সন্তানদের দ্বীনের জ্ঞান না থাকুক। আবার তাদেরকে দুনিয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন

করেও রাখতে চাই না। সীমার মধ্যে থেকে তারা হালাল ব্যাপারগুলো উপভোগ করুক।

আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক, দুনিয়ার এমন অনেক কিছুই আমাদের কাছে আকর্ষণীয় এবং মিষ্টি লাগে। বাচ্চাদের কাছে তো আরো বেশি। আর এখন এই সবকিছুই খুব সুন্দরভাবে প্যাকেজ করে বাচ্চাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে—টিভিতে, কার্টুনে, দোকানে বাচ্চাদের চোখ যেখানে যায় সেখানে।

হাযার বলছিল, "বাচ্চাদের জন্য এখন এত এত সুযোগ যে তাদের ভুল করার সম্ভাবনা খুব বেশি। ওদের মেনে নিতে হবে যে আমরা যেহেতু ওদের অভিভাবক, তাই আমরা ভালো জানি।"

এগুলো শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ছিল বাচ্চাদের ঘ্যানঘ্যানানি, প্লেটে খাবার ফেলে যাওয়া, মিষ্টি, বাইরের খাবারের জন্য সবসময় জ্বালানো, সারাটা বিকেল চোখ গোলগোল করে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকা, ক্রিস্টিনা অ্যাগিলেরার মতো করে বাচ্চা মেয়েগুলোর জামা পরতে চাওয়া—আমি হাযারের সাথে একমত হলাম। বাচ্চাসহ আমরা অনেকেই যখন প্রথম প্রথম দ্বীনে আসি, তখন এই সব দরজা বন্ধ করে দিতে চাই।

রাবি'আর কথায় আমরা কয়েক বছর আগের স্মৃতিতে ফিরে গেলাম। ও বলছিল, "যখন আমাদের মধ্যে প্রথম প্রথম সন্তান হওয়া শুরু করল, তখন বাচ্চাদেরকে পুরো দুনিয়া থেকে আলাদা করে রাখার একটা প্রবণতা কাজ করত। খুবই কঠোর, এটা না, সেটা না।"

বাচ্চারা বড় হতে হতে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ল। কিছু ব্যাপার বদলাতে শুরু করল। বয়স যখন ছয়-সাত, তখন বাচ্চারা কথা বলা শিখল এবং প্রশ্ন করতে শুরু করল। দশ-এগারো বছর বয়সে তাদের নিজস্ব আচরণ প্রকাশ পেতে থাকল। তো মায়েরাও তাদের নিজেদের আচরণ বদলাতে থাকল। তাদেরকে দুনিয়া থেকে আলাদা করে একটা বাক্সে ঢুকিয়ে রাখা যাবে না। তারা বুঝতে পারল দুনিয়াটা শতভাগ আদর্শ স্থান না যে এখানে বাচ্চারা পুরোপুরি আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবে।

আমরা বুঝলাম যে দুনিয়ার দরজাকে পুরোপুরি বন্ধ করে রেখে চলা সম্ভব নয়। এটা সবখানে ছড়িয়ে আছে। আমরা না একে অবহেলা করতে পারি না আমাদের সন্তানদের। আমরা বরং মধ্যস্থতা করা শুরু করলাম—কখন অনুমতি দিতে হবে আর কখন কঠোর হতে হবে, কখন তাদের কাছে কিছু প্রকাশ করতে হবে এবং কী তাদের কাছ থেকে লুকাতে হবে, অন্তত কিছু সময়ের জন্য।

> *"তুমি তাদেরকে কুশন বানিয়ে রাখতে পারো না যে তাদের চারপাশে তুলোর বল ঘিরে থাকবে। আমার স্বামী এবং আমি খুবই বাস্তববাদী। সে বলে যে তাদের কাছে কিছু ব্যাপার প্রকাশ হোক—খুব বেশি না—কিন্তু একটা ব্যাখ্যা থাকুক। তুমি যদি খুব*

বেশি কঠোর হও এবং তারপর তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাহলে তারা পুরোপুরি বিপরীত দিকে চলে যায়।"

—মেই

হাযার এভাবে বলছিল যে,

"আমি বুঝি আমার ছেলেকে খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে পারব না। আমি যদি ইয়েমেনে থাকতাম আর জানতাম যে সবসময় ইয়েমেনেই থাকব তাহলে হয়তো তাকে সত্যিকারের ইসলামি পরিবেশে বড় করতে পারতাম। কিন্তু যেখানে থাকি সেখানে চারপাশটায় দুনিয়াবী জিনিসপত্র খুব শক্তভাবে আঁকড়ে আছে। এগুলো এড়িয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর। আমি যদি চাই আমার সন্তান এই সবকিছু থেকে দূরে থাকুক, তাহলে তার উপর অত্যাচার হয়ে যাবে। আমি তার জীবনে একজন অত্যাচারী মা হতে চাই না।"

পুরনো স্কুল, নতুন স্কুল

মা-বাবাকে মান্য করতে, সম্মান করতে এবং তাদের প্রতি দয়ালু হতে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সন্তানদের প্রতি অনেক জোর দিয়েছেন। শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করা—যেটা ইসলামে বিশ্বাসের ভিত্তি, এই আদেশের পরপরই আল্লাহ অনেক আয়াতে একজন মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে বলেছেন।

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বলো। (সূরাহ বনি ইসরাইল,১৭:২৩)

"এটা হচ্ছে ভালোবাসা এবং সম্মানে মিশ্রণ। আমি যখন আমার ছোটবেলা থেকে বড় হওয়ার কথা চিন্তা করি, তখন ভাবি, বাবার কথা আমি কেন শুনতাম? আমি তাকে ভয় পেতাম এজন্য না। আমি তাকে ভালোবাসতাম, তাই তার কথা শুনতাম। তার প্রতি এ বিশাল সম্মান আমার আছে।"

—সারা

আমি উম্মে মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে তার বাচ্চাদের সাথে কেমন। বলেছিল,

"হ্যাঁ আমার ধরণটা অনেকটা এরকম যে আমার কথা ওদের শুনতে হবে। কিন্তু দিনশেষে আমি তাদের সাথে এভাবেই আচরণ করব যাতে করে তারা বুঝতে পারে। আমি তাদের উপর ইসলাম মানার হুকুম চাপিয়ে দিতে পারি না। তাদেরকে এমনভাবে ইসলাম শেখাই যাতে তারা নিজে থেকে সেটা মানতে আগ্রহী হয়।"

মা-বাবার আনুগত্যের ব্যাপারে কুরআন এবং হাদিসে সন্তানের সাথে পিতা মাতার সুন্দর, ভালোবাসাপূর্ণ যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তা মাথায় রাখতে হবে। রাসূল (সা.) নিজে বাচ্চাদের সাথে খুব ভালো এবং মমতাময় ছিলেন। একবার এক লোক দেখল যে তিনি তার সন্তানকে চুমু দিচ্ছেন। সে বলল আমার দশটা বাচ্চা আছে এবং আমি কখনো তাদেরকে চুমু দেইনি। রাসূল (সা.) বললেন, যে অন্যের প্রতি দয়া দেখায় না তাকেও দয়া দেখানো হবে না। তিনি আরো বলেন যে, আল্লাহ কঠোরতার জন্য যা দেন না তা নম্রতার জন্য দেন।

> *“বাচ্চাদের সাথে যতক্ষণ ভালো যোগাযোগ, পারস্পরিক সম্মান এবং স্বচ্ছতা আছে, ততক্ষণ তাদের সাথে কঠোর হওয়া যায়। তাদেরকে ভালোবাসাও দেখাতে হবে যাতে তারা বুঝে যে তুমি তাদের ভালোবাসো।”*
>
> *—হাযার*

মুসলিম অভিভাবকরা যদিও সন্তানের আনুগত্যের উপর খুব জোর দেয়, তবে তাদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের উপরও অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। এরকম উপায়ে চললে তার ফলাফল দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম—বাচ্চারা মা-বাবার কথা মানছে, আবার নিজেদের কথাও তাদেরকে বলছে, হাসছে, মজা করছে। পার্থক্য হলো, তারা জানে কখন কোনটা করতে হবে।

আমার নিজের অভিভাবকত্বের ধরণ একেক সময় একেক রকম। একজন মুসলিম অভিভাবক হিসেবে আমি তাদেরকে নিজের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিতে পারি না। তারা আল্লাহ কী বলেছেন সেদিকে খেয়াল না রেখে যা খুশি তা-ই করবে, সেটা আমি মেনে পারি না। মা-বাবা হিসেবে সন্তানদেরকে ভালো-মন্দের শিক্ষা দেওয়া, ইসলামি আচরণ, মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ এ ব্যাপারে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন।

কিন্তু এই প্রজন্মের অন্যান্য অনেক অভিভাবকের মতো আমরাও বাচ্চাদের বড় করতে গিয়ে নানারকম মতামতের মুখোমুখি হই। দ্বন্দ্ব, আদিকালের মতো বাচ্চাদের শেখাব—বাবা-মায়ের কথা মানো, বড়দের সম্মান করো, তোমাদের যা করতে বলা হয় তা-ই করো, ফিরতি কোনো কথা বলা যাবে না—এরকম নাকি আধুনিক যুগের মতো—বাচ্চাদের মতামতকে সম্মান করা, তাকে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া, তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। আমার মনে হলো এ দুটোর কোনটাই কাজ করে না। আমি বিভিন্ন সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন যেরকম প্রয়োজন তা করেছি, মানে দুটোর সংমিশ্রণ। বাকী সময় দেখা গেল অন্যান্য মায়ের মতো আমিও ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছি, তর্ক করছি, মধ্যস্থতা করছি, কখনো মাথা চাপড়াচ্ছি। হতাশাটা ভয়ানক। মুসলিম এবং অমুসলিম অন্যান্য অভিভাবকের মতো আমরা এখনও এই দুই রকমের অভিভাবকত্বের মাধ্যমে বাচ্চাদের বড় করতে মধ্যস্থতা করে যাচ্ছি। যুদ্ধ জেতার এখনো অনেক বাকি।

টিনএইজ বয়স

টিনএইজ বয়সটা সবার জন্যই এক অদম্য সময়, বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য। অনেক দ্বন্দ্ব, অনেকরকম কঠিন সিদ্ধান্ত, অনেক প্রলোভন। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে টিনএইজ একটা স্বর্গীয় সময়, অনেক স্বাধীনতা কিন্তু দায়িত্ব কম, পিতামাতার দায়িত্বে থেকে নিজেকে গড়ে তোলা। সাথে কিছুটা বিরুদ্ধাচরণ, উচ্ছৃঙ্খলতা—যেগুলো মেনে নেওয়া হয়।

ইসলামে বয়ঃসন্ধি হবার পর থেকেই প্রত্যেকেই যার যার কাজের জন্য দায়িত্বশীল। এমন কোনো স্বর্গীয় সময় নেই যেখানে খারাপ আচরণ মেনে নেওয়া বা সহ্য করা হবে। টিনএইজে নেশা করা আর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নেশা করা—আল্লাহর চোখে উভয়ই সমান—উভয়ের পাপ এবং অপকর্মই সমান। যদি কারো ক্ষেত্রে এমন হয় যে সে জানে না, তবে সেটা আলাদা কথা।

কিন্তু পশ্চিমের অনেক মুসলিম টিনএইজার এ ব্যাপারটা বুঝতে চায় না। ফলাফলে অনেক মুসলিম পরিবারে ফ্যাশনে, স্টাইলে অনৈসলামিক আচরণ দেখা যায়। এটা যত না ধর্মীয় সংঘর্ষ, তার চেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক। অনেক মা-বাবা যারা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছেন তারা সন্তানদের উপর এসব চাপিয়ে দেন। তারা মনে করেন, যে দেশে সন্তানরা বেড়ে উঠছে সে দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়াই যায়। আবার একই সময়ে সন্তানরা পরিচিত না, এমন সংস্কৃতি ও পরিচয়ের সাথে তাদের মেশাতে চান। আমি যখন এসব ঘটনা সম্পর্কে পড়ি, তখন ঐসব হতাশ মা-বাবাদের জন্য খুব কষ্ট হয়। বেশি কষ্ট হয় দোটানায় পড়া হতাশ সন্তানদের জন্য। কিন্তু আমি এমন টিনএইজারও দেখেছি যারা দ্বীনকে মেনে বড় হচ্ছে, দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে রাখছে। আল্লাহর আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ করছে। তাদের বাবা-মা মুসলিম এ কারণে যে তারা এমনটা করছে তা না। তারা নিজেরাই ইসলামে বিশ্বাস করে তাই এরকম করছে। এটা হচ্ছে ঘরে জ্ঞানচর্চা, ইবাদাত এবং পড়াশোনার প্রভাব। এবং বাচ্চারা যেসব ব্যাপারে হতাশ থাকে, সেসব ব্যাপারে হালাল জিনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ফলাফল।

একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম টিনএইজার অন্যসব টিনএইজারের মতো পপসঙ্গীত ও এর তারকাদের অনুসরণ নিয়ে ব্যস্ত থাকে না।

ষোল বছর বয়সী রুমাইসা আমাকে বলছিল,

> "আমি মহিলা সাহাবিদের গুণগুলো দেখি। তারপর আমার মায়ের বান্ধবীদের দেখি। আমার মনে হয় তারা খুবই শক্ত মানুষ। জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন কিন্তু এখনো অনেক বেশি দৃঢ়চিত্ত।"

অথচ তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালোতে ঢাকা দেখে অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না যে তার এবং তার বান্ধবীদের সাথে অন্যান্য টিনএইজারদের অনেক

মিল আছে। “আমি মনে করি আমিও অন্যদের মতোই। পার্থক্য হচ্ছে আমরা মুসলিম এবং আমরা কিছু নির্দিষ্ট কাজ করি না যেগুলো তারা করে। আমরা অন্যদের মতো একইরকম পোশাক, ফ্যাশন পছন্দ করি।”

তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম জীবনে সে কী করতে চায়। উত্তর দিল “আমি অনেক কিছু করতে চাই। আমি দ্বীন নিয়ে পড়াশুনা করতে চাই। সাথে এমন কিছুও করতে চাই যাতে ভবিষ্যতে ভালো একটা চাকরি করতে পারি, আমার যেন একটা সুন্দর বাড়ি থাকে, সুন্দর গাড়ি থাকে। আমার দ্বীন ঠিক থাকবে সাথে আমি আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকব। আমি অনেক দেশে ঘুরতে যেতে চাই। আমি একজন বিউটিশিয়ান অথবা ডেন্টাল নার্সও হতে চাই।”

হাহ! আর বিয়ের ব্যাপারে কি তার কোনো তাড়া আছে?

“আমি বিয়ে করতে চাই, সন্তানও চাই। কিন্তু এগুলো আমার তালিকার উপরের দিকে নেই। আমি যা করছি, তা আগে শেষ করতে চাই।”

আমি তার মা'য়ের কাছে জানতে চাইলাম যে তার সন্তানরা দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়ে কি না বা দ্বীন থেকে দূরে সরে যায় কি না এই ব্যাপারে কি তিনি চিন্তিত কি না। তিনি তার চিরাচরিত সুরে বললেন, “এটা আমার জন্য ভয়ের কিছু না। এরকম হোক তা আমি চাই না কিন্তু এ নিয়ে আমি ভয়ও পাই না। কারণ দিনশেষে আল্লাহই তাকে পরিচালিত করবেন।”

অনেক মুসলিম সমাজে মুসলিম টিনএইজারদের চারিত্রিক নীতি নৈতিকতা নিয়ে যে দ্বি-মুখী আচরণ অর্থাৎ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দেখা যায়, তা নিয়ে আমি সবসময়ই বিরক্ত। দেখা যায় মেয়েদের সতীত্ব ও পারিবারিক সম্মান রক্ষায় তাদেরকে ঘরে আটকে রাখা হয় অথচ একই পরিবারের ছেলেরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নেশা করছে, ঘুমাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই ছেলেরা নিয়ম ভাঙলে সমস্যা নেই, কিন্তু মেয়েরা এক কদম পা বাড়ালেই সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। যাই হোক, ইসলামে এ ধরনের আচরণের কোনো স্থান নেই। ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে বলা হয়েছে।

উম্মে মুহাম্মাদ এবং আমি ছেলে-মেয়েদের বড় করা নিয়ে কথা বলছিলাম। তার চিন্তাভাবনা চিরাচরিত কর্তৃত্বপরায়ণ প্রথার চেয়ে একদমই ভিন্ন।

> “একটা ছেলে একটা মেয়েকে বড় করা আলাদা রকমের কঠিন কিছু না, যতদূর আমি বুঝি। ইসলাম বলে, তারা জীবনে যা অর্জন করবে দুজনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একইরকম পুরস্কার আছে। তাহলে আমি মনে করি, আমার ছেলে যেভাবে বড় হবে, আমার মেয়েও সেভাবেই বড় হবে। ব্যাপারটা এমন না যে আমার মেয়ে ধার্মিক হবে আর আমার ছেলে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে, মেয়েদের সাথে ঘুমাবে। যেরকমটা অনেক প্রথাগত মুসলিম পরিবারে হয়। আমি মনে করি আমার ছেলে-মেয়ে উভয়ের

জন্য একই নিয়ম, কারণ এটাই ইসলাম। ইসলাম এটা বলে না যে তোমার ছেলে একরকম নিয়ম মানবে আর মেয়ে আরেকরকম।”

আমি ইয়াসমিনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার টিনএইজার মেয়ে সুমাইয়ার ব্যাপারে তার কী কী আশা রয়েছে। সে বলল,

“প্রথমত আমি চাই সে একজন ভালো মুসলিম হয়ে উঠুক। সে তার দ্বীনকে জানুক, তার অধিকারগুলো সম্পর্কে জানুক। কারণ আমার মেয়ের জন্য এগুলো জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ।”

কাজ ও জীবনের ভারসাম্য রক্ষা

মুসলিম মা হিসেবে আমাদের জীবন আমাদের দ্বীন (পড়াশোনা, ইবাদাত, গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা), আমাদের পরিবার (ঘরের কাজকর্ম, স্বামী-সন্তানের দেখাশোনা) এবং আমাদের নিজেদের (আত্মোন্নয়ন, নিজের যত্ন নেওয়া, বিশ্রাম করা) নিয়েই। তবে বেশিরভাগ মায়ের মতো শেষের ব্যাপারটা অনেক সময় অবহেলায় পড়ে থাকে। দ্বীন নিয়ে পড়াশোনা করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আর প্রতিনিয়ত আল্লাহর ইবাদাত করে বান্দা হিসেবে নিজেদেরকে উন্নত করার চেষ্টাও। আমার উপর শুধু যে আমার পরিবারের অধিকার আছে তা না। বরং হাদিসে বলা হয়েছে আমাদের শরীরেরও অধিকার আছে যত্নে থাকার, সুস্বাস্থ্যের।

“আমার নিজের জন্য, নিজের শরীরের জন্য এবং দ্বীন নিয়ে পড়াশোনার জন্য বিশেষভাবে আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। যদি তা না করি, তাহলে আমার কোনো মূল্য নেই।”

—মেই

আমার পরিচিত অনেক মেয়ে ফুলটাইম মা হওয়া সত্ত্বেও তারা সবসময় ঘরের কাজ নিয়ে, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে না।

আমাদের কমিউনিটিতে এমন মেয়ে আছে যাদের ঘর-বাহির সামলে চলা দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। পরিবার এবং কাজ অথবা পড়াশোনার মধ্যে তারা অদ্ভূতভাবে মানিয়ে চলে। যদিও ইসলাম পুরোপুরি সমর্থন করে এবং পরিবারের সাথে মানিয়ে চলা যায় এমন কাজ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন।

তবে আমাদের অনেক বোনই এই বাধা অতিক্রম করে গেছে। তাদের হয়তো নিজের ব্যবসা আছে অথবা ফ্রীল্যান্সের কাজ করে অথবা তারা ঘরে থেকেই কাজ করে। এমন একজন হলো কারিমা। লন্ডনের বাইরে তার একটা সফল ক্যাটারিং ব্যবসা আছে। সেখানে সে পুরোপুরি নিকাব পরে কাজ করে এবং তার খাবারের প্রশংসা অনেক দূর ছড়িয়েছে। সে আমাকে সবসময় বলেছে, “তোমার কাজ যদি ভাল হয় তাহলে মানুষ তোমার কাছ থেকে কাজ নেবে। তুমি দেখতে কেমন এটা ব্যাপার না।” কিন্তু আর অন্যান্য চাকরিজীবী মায়েদের মতো এখানেও চ্যালেঞ্জ এবং উদ্বেগের ব্যাপার আছে।

আমার ছেলের বয়স যখন মাত্র তিন মাস তখন আমি কাজ শুরু করি। আমার ধারণা, শুরু না করে আমি পারতাম না। আমার আশপাশের কিছু মায়ের উৎসাহে আমি আমার এলাকায় ইসলামিক হোম স্কুল চালু করি। এক বছর পরে সেখানে নয়টা বাচ্চা ছিল। তারা পাঠ্যক্রমের সব বিষয়েই পড়াশোনা করত। এটা আমার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে গেল।

তবে আমার ছোট্ট ছেলেটা বড় হতে হতে আমার নিজের ভিতর অপরাধবোধ বাড়তে লাগল। সকালবেলা সে আর অন্য একজনের বাসায় থাকতে চাইছিল না। সে বাচ্চাদের সমস্ত কাজে ঢুকে পড়েছিল, ঢুকলে এলোমেলো করে দিত। এরপর আমি একবার ওয়েলসে আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। সেখানে দেখলাম তার ভাইয়ের মেয়ে, আমার ছেলেরই বয়সী, সেই বাচ্চা ছবি দেখে দেখে শব্দ বলছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি কখনো আমার বাচ্চার সাথে বসেই ছোট ছোট বইগুলো পড়ার কথা ভাবিওনি। আমার ভয়াবহ লাগছিল। আমি কী করেছি? অন্য বাচ্চাগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করবেন না কিন্তু আমার নিজের বাচ্চার ব্যাপারে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। আমি কেমন করে আমার প্রাথমিক দায়িত্বগুলোকে অবহেলা করলাম এমন এক কাজ করতে গিয়ে—যেখানে কাজটা করতে আমি আর্থিকভাবে বাধ্য ছিলাম না?

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার ছেলে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে এবং অন্যান্য অভিভাবককে বলে দিলাম আমরা এই কাজটা করছি না আর। আমি আমার ছেলের প্রতিভা বিকাশে এবং সেগুলো আবিষ্কার করতে নিজের সময়কে উৎসর্গ করলাম। তারপরও আমার খুব ক্লান্ত লাগত। আমি জানি আমি যা করতাম তা আল্লাহর চোখে ঠিক ছিল। কিন্তু সবকিছুর পর আমার সন্তান আমার দায়িত্ব এবং আমি একে অবহেলা করতে পারি না। আমার সৃজনশীলতা উথলে উঠছিল। আমি বাচ্চাদের জন্য গল্প কবিতা লিখতে শুরু করলাম, আমার ছবি আঁকার তুলি হাতে তুলে নিলাম। জানতাম যে এই কাজগুলো আমি আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করেও করতে পারব। আমি চাইছিলাম আমার কিছু সময় সৃজনশীলতায় কাটুক। আমি কাজ করতে চাইছিলাম কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আমি আমার প্রাথমিক ভূমিকাকে অবহেলা করতে চাইনি। এটা ছিল আমার মূল মানদন্ড।

যাই হোক, একজন লেখক এবং ডিজাইনার হিসেবে সৃজনশীল কাজগুলোকে আমি ভালোবাসতে শুরু করলাম। ওগুলোর সাথে আমি মানিয়ে চলতে পারছিলাম। প্রকাশনার কাজটাকে আমি উপভোগ করছিলাম। দ্বীনের ব্যাপারে বাচ্চাদের জন্য সুন্দর সুন্দর বই লেখা ইসলামকে আরো ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করবে আশা করি। অন্য যে নারীরা চাকরি করে তারা তাদের চাকরি সম্বন্ধে বলছিল যে এগুলো তাদের জন্য একটু নিষ্কৃতি, একঘেয়েমিতা থেকে মুক্তি, সামাজিক কাজ ও আয়ের মাধ্যম।

"কাজটা কঠিন কিন্তু আমি উপভোগ করি। আমি আমার চাকরিটাকে পছন্দ করি—নতুন নতুন মানুষের সাথে মানুষের সাথে মেশা এবং সামাজিকীকরণ। আমি ঐ মেয়েদের সাথে থাকতে পছন্দ করি। এতে আমার ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে কথা বলি, হাসি, আলোচনা করি। ছুটির দিনেও একটু ছুটি পাওয়ায় আমি খুশি হই কিন্তু ওই বোনদেরকে আমি খুব মিস করি, প্রতিদিনই।"

—উম্মে মুহাম্মাদ

কিন্তু আমার প্রাথমিক ভূমিকা একজন স্ত্রী এবং একজন মা হিসেবে—এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। এখন এবং সবসময় আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিই যে আমার পরিবারের প্রয়োজনে কাজকে পাশে রেখে দিতে হবে। আমি সবসময়ই খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি যে আমি যদি আমার নিজের দায়িত্বগুলো ঠিকভাবে পালন করি তাহলে আমি যা করি তার মধ্যে আল্লাহ সফলতা দিয়ে দেবেন। এবং আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার এই ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করেছেন।

তো, বাচ্চাদের সাথে খুব-ভালো সম্পর্ক তৈরি করে, তাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে শিখিয়ে, আমাদের জীবন ও জগৎ ব্যাখ্যা করে, তাদের সাথে ভালো সময় পার করে, একসাথে মজা করে এবং খুব সুন্দর বৈচিত্র্যময় পারিবারিক জীবন সৃষ্টি করে আমরা পশ্চিমা মুসলিমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে ইসলামি শৈশব উপহার দিতে চাই। আর যদি এই প্রচেষ্টা কাজ করে তাহলে বাচ্চারা ইসলামের মধ্যে থেকেও জীবনে আনন্দ এবং পূর্ণতা খুঁজে পাবে। তাদের জীবন কঠিন মনে হবে না।

"একজন মুসলিম হিসেবে আমি গর্বিত ছিলাম এবং আমি চাই আমার ছেলের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটুক। একজন মুসলিম হিসেবে সে যদি নিজেকে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত মনে করে তাহলে বাইরের প্রলোভনে তার পা পিছলে যাবে না। আমি চাইনা সে কোনো কিছুর অভাব বোধ করুক।"

—লায়লা

সত্যিকারে ইসলামে পরিবার প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজ কিছু নয়, কিন্তু এটা একটা মহৎ কাজ। আমাদের কমিউনিটি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভালোর জন্য এটা জরুরি। এর মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণ সন্তান তৈরি হয় যারা ভবিষ্যতে ন্যায়পরায়ণ মানুষে পরিণত হবে এবং আরও ন্যায়পরায়ণ মুসলিম তৈরি করবে। এভাবে রবের সাথে সম্পৃক্ত থেকে একটা সত্যিকারের ইসলামি পরিবার সমাজে একটা ইসলামি জীবনব্যবস্থা চালু করতে কাজ করে।

আমাদের শেকড়, আমাদের ভিত্তি

মুসলিম হওয়া, বিয়ে করা, সন্তান দেওয়া—এসব যদি কিছু অ্যাডভেঞ্চার হয়, যেগুলো আমার ইসলামে আসার সাথে শুরু হয়েছে, তবে এর মধ্যে সবচেয়ে অসাধারণ এবং ধৈর্যের কাজ ছিল ইসলাম সম্বন্ধে জানা—আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, ধৈর্য, জ্ঞান অর্জন। বছরের পর বছর ধরে চলা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখা ছিল সবচেয়ে কঠিন। ধৈর্যশীল হওয়া একটু সহজ ছিল, সাথে ছিল প্রশান্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। দ্বীনের জ্ঞাম অন্বেষণ শুরু হয়েছিল সেই যে কুরআনের কিছু আয়াৎ উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে—প্রথম প্রথম তো আটকে যাচ্ছিলাম বারবার। তারপর বছরের পর বছর ধরে আরবি শিখে, অবশেষে আত্মবিশ্বাসের সাথে পড়তে শিখেছি। জ্ঞানের সাথে উপহার হিসেবে পেয়েছি অনুপ্রেরণা, বুঝ আর আত্ম অনুসন্ধান। কারণ একজন মুসলিমের জীবন শুধুমাত্র প্রতিদিনকার কাজকর্মের হালাল-হারাম দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয় না। মুসলিম নারীর জীবন শুধু তার হিজাব, বিয়ে, সন্তান দিয়েই সংজ্ঞায়িত হয় না। একজন মুসলিম পুরুষের মতো একজন মুসলিম নারীও প্রতিনিয়ত নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করে নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, চেষ্টা করে অধৈর্য না হতে, হতাশায় ডুবে না যেতে, নিজের সেরাটা দিয়ে ইলম অন্বেষী হতে চায়। তারা দ্বীনের শিক্ষার্থী—সবসময়ই খুঁজছে, প্রশ্ন করছে, মুখস্থ করছে এবং যা শিখছে তা কাজে লাগাচ্ছে। এ ব্যাপারগুলোই আমাদের সাহস দেয়, দৃঢ় করে, হিম্মত জোগায়, আশা দেখায়; প্রতিদিনের জাগতিক কাজকর্মে এসব হয় না। এ ব্যাপারগুলোই বারবার মনে করিয়ে দেয় আমরা কে, গুছিয়ে দেয় জীবন।

মুসলিম নারীদের প্রতিদিনের জীবন থেকে যেসব বিষয় নিয়ে কথা উঠে, সেসবের মুখোমুখি আমি হয়েছি—আমাদের পোশাক, আমাদের বিয়ে, সন্তান। এইসবই হচ্ছে একটা গাছের বিভিন্ন শাখায় ফুল-ফলের মতো। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গাছে তার পত্ররাজির চেয়েও বেশি কিছু আছে—এর শেকড় গভীর, বিস্তৃত। এই শেকড় আমাদের মূল্যবোধকে দৃঢ় করে, ইসলামকে গভীরভাবে বুঝতে এদিকে নজর দিতে হবে, ভাবতে হবে।

আত্মসমর্পণের সংগ্রাম

আজকের দুনিয়ায় 'আনুগত্য' (Obedience) এবং 'আত্মসমর্পণ' (Submission) এর মতো অপ্রচলিত শব্দ খুব কমই আছে। এই কথাগুলো আমাদের আধুনিক যুগে

উদার গণতন্ত্রের স্বাধীনতার একেবারেই বিপরীত। আসলে, ইসলামের কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করতে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করাটা নির্ভরযোগ্য না। ইসলামের কথা বলতে গিয়ে আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার করি যেগুলোর সংজ্ঞা আধুনিক পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে নেতিবাচক ও মর্যাদাহানিকর- Submission, Obedience, Righteousness, piety. আসলে আজকালকার দিনে কোনোকিছুতে ধার্মিকতার আভাস থাকলেই সেটা নিয়ে উপহাস করা হয়।

মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে অবশ্য এমনটা নেই। আমরা সমাজের এসব অবজ্ঞাকে পাত্তা দিই না। সম্ভবত এটা একটা কারণ যার কারণে পশ্চিমাদের কাছে মুসলিমদের দুর্বোধ্য লাগে—আমাদের সমাজে এখনো সৃষ্টিকর্তা আছেন, আমরা তাকে বিশ্বাস করি এবং যারা দ্বীন চর্যা করেন তাঁদের জীবনের সবকিছুর কেন্দ্রে আল্লাহ আছেন।

> *"আমি নিজেকে যেসব প্রশ্ন করি তার মধ্যে একটা হলো, তুমি কি আসলেই আত্মসমর্পণ করেছ? এমনকি আজও আমি ভাবি, করেছি কি না। আমি বলব, আমি করেছি, কিন্তু আল্লাহ আসলে সবচেয়ে ভালো জানেন যে আমার হৃদয়ে কী আছে।"*
>
> *— আলিয়াহ*

বস্তুত আমাদের বিশ্বাস এবং জীবন যাপনের মূলে আছে আত্মসমর্পণ। প্রথমত এই আত্মসমর্পণ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর আদেশনিষেধের প্রতি। এর মানে হচ্ছে তিনি যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসা, তিনি যা অপছন্দ করেন তা থেকে দূরে থাকা, তার বাণী বিশ্বাস করা এবং তার দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী জীবন যাপন করা। এই সব মিলিয়েই হচ্ছে আত্মসমর্পণ যেমনটা সারা আমাকে বলছিল— "সত্য খুঁজে পেলে তার সবটুকুই যে তোমার পছন্দ হবে তা কিন্তু না।" জীবনে এমন সময় আসে যখন আমাদের যা করা উচিত এবং আমরা যা করতে চাই তার মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হয়—সপ্তাহান্তে ঘুরতে না গিয়ে বিল দেওয়া, টিভি না দেখে কুরআন পড়া—জীবন হচ্ছে চাহিদা এবং দায়িত্বের মাঝে এক ক্রমাগত সংগ্রাম। এক হাদিসে এমনটা আছে যে জাহান্নামকে ঘিরে আছে চাহিদা, আনন্দ আর জান্নাতকে ঘিরে আছে কষ্ট, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ। নিজের দায়িত্ব পালন শেষে তোমার মনে অবশ্যই সন্তুষ্টি আসবে, তুমি জানবে যে তুমি ঠিক কাজটাই করেছ। ইসলামি পরিভাষায় নিজের মনের ইচ্ছেমতো না চলে দায়িত্ব পালনের জন্য কষ্ট করাই হচ্ছে নফসের সাথে জিহাদ।

> *"আমার কাছে আত্মসমর্পণ মানে হচ্ছে আমি যা করতে চাই তা না করে আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করা।"*
>
> *—লায়লা।*

আমি মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাদের কাছে আত্মসমর্পণের মানে কী এবং প্রত্যেকের উত্তরের কেন্দ্রে ছিল নফসের সাথে জিহাদ করা।

সারার ভাষায়,

"আত্মসমর্পণ হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজের ভেতর শান্তি খুঁজে পাওয়া এবং আল্লাহর সাথে সৎ থাকা। এটা হচ্ছে নিজের মনের ইচ্ছেগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখা, কারণ আল্লাহ যা করতে বলেছেন তার সবকিছুই কোনো না কোনো উপায়ে আমাদের ভালোর জন্য। আমরা হয়তো মানতে চাইব না, আমরা হয়তো বুঝব না এর পেছনের কারণটা কী; কিন্তু আল্লাহ যা বলেন তার সবকিছু সত্যিই আমাদের ভালোর জন্য। এটাই হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের শান্তি। যখন তুমি আল্লাহর আনুগত্য করো না কিন্তু জানো যে তার কথা, তার আদেশ-নিষেধ সত্যি, তখন তোমার মনে অশান্তি সৃষ্টি হবে। ব্যক্তিগতভাবে, যখন আমি আল্লাহর কথা মানিনা তখন আমি আমার নিজের ভিতর শান্তি খুঁজে পাইনা।"

আমাদের সমাজ বিদ্রোহের ব্যাপারে মোহাচ্ছন্ন। যা চলে আসছে তার বিপক্ষে যাওয়া, কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করা, সীমারেখাকে ঠেলে দেওয়া—আমাদের কাছে এসব প্রশংসনীয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যখন সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক, তখন তা কীভাবে মানায়? যখন পুরো মানবজাতির জন্য সীমারেখাগুলো তিনিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন? স্পষ্টত, বিদ্রোহ এখানে তার নিজস্ব আবেদন হারায়।

ইসলামে আনুগত্য এবং বিদ্রোহ না করা ভালো বৈশিষ্ট্য, যা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। পৃথিবীতে হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সমাজে আনুগত্যকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ঐসব সমাজের নাগরিকদের কর্তৃপক্ষকে, বড়দের এবং বিভিন্ন রকমের প্রথা ও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হতো। গত দশকগুলোতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইসলামে আনুগত্যের প্রশংসা করা হয়েছে কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। শুধুমাত্র ভালো ব্যাপারগুলোতেই আনুগত্য করতে হবে। নিপীড়ন, অত্যাচার, পাপ, সীমালঙ্ঘন, ধোঁকা বা ভুল কাজের ব্যাপারে কোনো আনুগত্য নেই। আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্যের মানে এই না যে দ্বীনের ব্যাপারে কেউ দুটো কথা বললেই আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করব। তারা যা বলে তার ব্যাপারে প্রমাণ দিতে হবে আর যদি তা সত্য হয়, আমরা তখনই তাদের কথা শুনব এবং মানব।

ধৈর্য

কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করার গুণের কথা বলেছেন। তিনি নূহ (আ.), আইয়ুব (আ.), ইয়াকুব (আ.), মুহাম্মাদ (সা.), মারইয়াম (আ.), আসিয়াহ (আ.) এর প্রশংসা করেছেন। তারা তাদের সহ্য ক্ষমতা এবং সহিষ্ণুতার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। বিশেষ করে আল্লাহকে মানা এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে গিয়ে তারা যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রে তারা যে ধৈর্যধারণ করেছেন তার জন্য।

"আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন।

আল্লাহর বানী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।" (সূরাহ্ আল আনআম, ৬:৩৪)

আত্মসমর্পণের পরতে পরতে ধৈর্য জড়িয়ে আছে। আত্মসমর্পণ অবশ্যই সহজ কিছু না। নফসের সাথে জিহাদ অর্থাৎ মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ কখনো শেষ হবার নয়। এজন্য প্রয়োজন ক্রমাগত সতর্ক প্রহরা এবং ধৈর্য। আল্লাহকে মানতে ধৈর্য প্রয়োজন, মানতে গিয়ে জীবনের সব দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তার জন্য ধৈর্য প্রয়োজন, মানুষের সাথে মিশতে ধৈর্য প্রয়োজন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন। গ্রীষ্মের কড়া রোদে নিকাব পরে থাকতে ধৈর্য প্রয়োজন, বিবাহিত জীবনের সমস্যাগুলোয় হাল ছেড়ে না দিতে ধৈর্য প্রয়োজন, খুব করে খেতে ইচ্ছে করলেও রোজা ভেঙ্গে না ফেলার জন্য ধৈর্য প্রয়োজন, জীবনের কোনো কিছুই যখন মন মতো হয়না তখন ভাগ্যকে দোষারোপ না করার জন্য ধৈর্য প্রয়োজন।

একজন মুসলিমের জীবনে ধৈর্য্য অপরিহার্য। জীবনের কষ্টের সময়গুলোতে ধৈর্য আমাদের আশ্রয় দেয়—আমরা তখন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিই, জানি যে আল্লাহ আমাদের কষ্টগুলোকে সুখ-শান্তিতে পরিবর্তিত করে দিবেন। তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াবান। ধৈর্য আমাদেরকে হতাশা এবং সন্দেহ থেকে দূরে রাখে, মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

"বলবেঃ তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।" (সূরাহ্ আর রাদ, ১৩:২৪)

স্বাধীনতা

এইসব আত্মসমর্পণ, আনুগত্য, ধৈর্যের কথা শুনতে শুনতে একটা সময় মনে হয় আমরা যেন দীর্ঘসময় ধরে চলা যুদ্ধের শহীদ। একজন মুসলিমের জীবন কি আসলেই এমন? আশা করি, এই বইয়ের কথাগুলো এধরনের ভয়গুলোকে প্রশমিত করবে। তারপরো মনে হতে পারে একজনের মুসলিমের জীবন হয়তো কারারুদ্ধ জীবনের মতো, তার নিজের উপর এক ধরনের অত্যাচার। আমি মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা কি স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছে কি না। তাদের কাছে আমি বিস্তারিত উত্তর চেয়েছিলাম।

প্রথমত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, জীবনের অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্ন থেকে ইসলাম আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলাম এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে—আমি এখানে কেন আছি? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? জীবনের অর্থ কী? এক লোক একবার আমাকে বলেছিল যে সে নিজেকে কখনো এ ধরনের প্রশ্ন করেনি। সে খুব সুখী জীবন কাটিয়েছে। একদিনের পর আরেক দিন যেভাবে সামনে আসছে সেভাবে। হয়তো সে সত্যিই বলেছিল। কিন্তু প্রত্যেক সভ্যতায় মানুষ তার নিজ নিজ উপায়ে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছে, ধর্মের মাধ্যমে, দর্শনের মাধ্যমে, অতীন্দ্রিয়বাদ এর মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে মানুষ হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্তা, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, জীবনে বড় বড় আশা

আছে আর আমরা সবসময়ই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছি যে আমরা এখানে কেন? আমরা অন্য পশুদের মতো না যে জন্ম নিলাম, খেলাম, সঙ্গম করলাম, বংশবৃদ্ধি করলাম এবং মারা গেলাম; সহজাত প্রবৃত্তির কারবার। আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে। ইসলাম আমাদেরকে সেই সিদ্ধান্তটিই দেখিয়েছে যেটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, যেটি আমাদের এই জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও সুখী করবে।

একসময় পার্টি করে বেড়ানো উম্মে মুহাম্মাদ বলেছিল, "আমি অপরিচিতের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছি। একটা সময় ছিল, তখন আমি পার্টি থেকে বাড়ি ফিরে জানালার পাশে বসে থাকতাম আর ভাবতাম, এটা তো জীবন না। এসব করতে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করতাম যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি খুব কাছেই আছেন। আমি প্রায়ই বলতাম, দয়া করে আমাকে দেখাও আমি এখানে কেন আছি। পার্টিতে লাফালাফি করব, তারপর ঘরে ফিরে ঘুমাব, পরের দিন সকালে শপিং, আর সোমবার কাজ—এসব কারণে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা হতে পারে না। এটা আমার উদ্দেশ্য হতে পারে না। মারা যাব, তারপর আমি আমার উদ্দেশ্য খুঁজে পাব তা-ও হতে পারে না। কিন্তু এখন আমার নিজেকে পুরোপুরি স্বাধীন লাগে, আমি আমার দ্বীন নিয়ে সুখী। আল্লাহ্ আমার হৃদয় খুলে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আমি খুশি যে আমার রব চান যে আমি তার ইবাদাত করি। আর কেনইবা আমি তার ইবাদাত করতে চাইব না? আমার নিজেকে স্বাধীন লাগে কারণ আমি এই সমাজের দাস না, অন্যরা ইসলাম নিয়ে কী ভাবে আমি তার দাস না। আমি আমার রবের আদেশ নিষেধের দাস।"

এই দুনিয়ার অল্প সময়ের ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারস্যাপারে পূর্ণতা এবং সুখের সন্ধান থেকে ইসলাম আমাদের মুক্তি দিয়েছে। ক্লেয়ার যেমনটা বলছিল, "ইসলাম তোমাকে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার থেকে মুক্তি দেয়—সমাজে তোমার অবস্থান, সমাজে তোমার নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করা উচিত বলে মনে করো, মানুষ তোমার কাছ থেকে যেরকম অ্যাকাডেমিক অথবা ক্যারিয়ারের সফলতা আশা করে তা অর্জন করা। মুসলিম হওয়ার পরও তুমি এসব করতে চাও কিন্তু তখন তোমার কাজ করবার আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্র তৈরি হয়।"

> রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংযত করে দেবেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দেবে।
>
> আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির গরীবি ও অভাব-অনটন দুচোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো

এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি পাবে না। (তিরমিযি- ২৪৬৫)

অন্যদের মতো আমরা এটা বিশ্বাস করি না যে টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায়। আমাদের বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও আমরা সুখের জন্য এসবের দিকে তাকাই না। কারণ অর্থ-সম্পদ বা খ্যাতি থেকে সুখ আসে না, সুখ আসে আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হওয়া থেকে। আমরা বস্তুবাদী ব্রেনওয়াশিং এর শিকার না, যেটা পৃথিবীর অনেক মানুষকে গ্রাস করে নিয়েছে। আমাদের কাছে সম্পদ দরকারি জিনিস, কিন্তু এটাই শেষ না, সব না। আমরা জানি যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। সম্পদ আমাদের জন্য রহমত এর পাশাপাশি পরীক্ষাও। আমরা কীভাবে আমাদের সম্পদ খরচ করেছি, এ ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন করা হবে। অন্যকে সাহায্য করতে এবং আমাদের নিজেদেরকে পরকালে সাহায্য করতে আমাদের সম্পদ কীভাবে আরো ভালো উপায়ে খরচ করা যায় তা না ভেবে আমরা কি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উড়িয়েছি কি না। এভাবে আমরা মিডিয়ার প্রচারিত ভোগবাদী মানসিকতা থেকে স্বাধীন থাকি।

“ইসলামে আসার আগে আমার কখনোই যথেষ্ট ছিল না। আমি সবসময়ই দৌড়াচ্ছিলাম, দৌড়াচ্ছিলাম, দৌড়াচ্ছিলাম। ইসলামে স্বাধীনতা আছে। আমি দেখলাম যে আমার এখন যথেষ্ট আছে। আমি সুখী, আলহামদুলিল্লাহ।”

—ক্লেয়ার

মানুষ বস্তুগত আরাম আয়েশের একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেলে সে আরো চাইবে, তার চাহিদা আরো বাড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। আর যদি আরও সামনের পর্যায়ে যেতে না পারে তাহলে সে হতাশ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। সম্পর্ক তৈরি হয়, ভাঙে, বাচ্চারা বাড়ি ছাড়ে, চাকরি বদলায়, বসতবাড়ি বিক্রি হয়, স্বাস্থ্য খারাপ হয়—জীবনে ভালো থাকার জন্য যে উপকরণগুলোর উপরে আমরা নির্ভর করি সবই অস্থায়ী। মুসলিমদের জন্য শুধু আল্লাহই আছেন—যিনি সব ভালো এবং খারাপ সময়ে আমাদের সাথে থাকেন। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ও তাঁর জন্য ভালোবাসার বদৌলতেই আমরা সব ধরনের পরিস্থিতি উতরে যাই।

মুসলিম হিসেবে সর্বশেষ ধ্যান-ধারণা, ফ্যাশনেবল ধর্ম, ট্রেন্ডি আদর্শকে আমরা মাথায় নেই না। আমরা জানি আমরা কী বিশ্বাস করি, ভুলের মাঝের সঠিকটা আমরা জানি। তাই চলমান সময়ে কী ধরনের চিন্তাভাবনা চলে, অন্যেরা কী ভাবছে তার সাথে মানিয়ে নেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। এটা হচ্ছে উত্তাল সমুদ্রে ভাসমান শিলাখন্ডের মতো, আর সত্য একে ভাসিয়ে রাখে।

“দ্বীনে আসার আগে আমি ভাবতাম যে আমি সুখী। তারপরে বুঝতে পারলাম যে আমি আসলে কতটা অসুখী ছিলাম। কারণ আমি সবসময়ই কিছু না কিছু খুঁজতে থাকতাম, সমাজের সাথে মানিয়ে চলতে চাইতাম, মানুষের সাথে আপডেটেড থাকতে

চাইতাম, মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাইতাম—অনেক বাধ্যবাধকতা। কিন্তু দ্বীনে আসার পর তুমি বুঝতে পারবে অন্যদের পছন্দের জন্য তোমাকে এতকিছু করতে হবে না।"

—সাদিক্বা

এই বিষয়ে আরো চিন্তাভাবনা করে ক্লেয়ার বলল, "ইসলাম আমাকে যে ধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আশাবাদ শেখায়, তার সাথে তুলনা করে আমি নিজের চরিত্রের অধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব, হতাশাবাদকে সামলাতে শিখলাম। আমার মনে হয় তুমি ছেড়ে দাও এসব। ছেড়ে দিলেই দেখবে তুমি স্বাধীন।"

কারণ ইসলামের মানদণ্ড অনেক উঁচু- বিশ্বাসে, ইবাদাতে, চরিত্রে, আচরণে, মানুষের সাথে সম্পর্কে—ইসলাম আমাদের মহৎ ও বনিয়াদি কিছু শেখায়। নিজেদেরকে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা কখনো না করে অগভীর, নীরস জীবন যাপনে আমরা আর তুষ্ট নই। আমরা সবসময় চেষ্টা করছি, কখনোই থেমে নেই। এ কারণে আমরা মাঝামাঝি অবস্থা থেকে বেঁচে গেছি। আমাদের সব কাজেরই অর্থ আছে, যে অর্থ দুনিয়ার লৌকিকতার অনেক ঊর্ধ্বে।

"ইসলাম আমাকে দুঃখ বিলাসিতা এবং আত্ম মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলাম অনেক বেশি আশাবাদ তৈরি করে। ছোট ছোট ব্যাপারেও নিজের চেয়ে খারাপ অবস্থানে থাকা মানুষের দিকে তাকানো এবং তারপর নিজের যা আছে তার মূল্যায়ন করা। নিজের উপর আল্লাহর রহমতগুলোকে অনুধাবন করা।"

—ক্লেয়ার

আমরা আল্লাহর বাণীতে বিশ্বাস করি এবং তার ওপর আস্থা আছে বলেই হতাশা এবং নিরাশা থেকে মুক্ত থাকি। আমাদের কখনোই মনে হয় না যে আর কোনো আশা নেই, কিছু আর বদলাবে না, বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। মুসলিম হওয়া মানে হচ্ছে আত্মবিশ্বাসী হওয়া, কখনোই আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে নিরাশ না হওয়া।

ইসলামি লাইফস্টাইল মেনে চলা একজন মানুষ আজকের সমাজের অনেক ক্ষতিকর দিক থেকে রক্ষা পায়—নেশা, অ্যালকোহল, মাদক, যৌনতাবাহিত রোগ, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, গর্ভপাত, যৌন হয়রানি এবং আরো অনেক কিছু।

প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে আমাদের বোনদের মধ্যে নিজেদের কথাগুলোই বারবার শোনা গেল। তারা সবাই বলল—আমাদের ইসলাম, আমাদের আত্মসমর্পণ, আমাদের স্বাধীন করেছে।

'ইক্বরা!' (পড়ো)

পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (সূরাহ আলাক্ব, ৯৬:১-৩)

নিরক্ষর রাসূল (সা.) এর কাছে কুরআনের প্রথম আয়াত গুলো নাযিল হওয়ার সময় থেকেই ইসলাম হচ্ছে পড়াশুনা এবং জ্ঞানের ধর্ম। সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম ঈমান ও ইসলামের আদেশ নিষেধ স্বয়ং রাসূল (সা.) কাছ থেকে শিখেছেন। তারা আবার পরের প্রজন্মকে তা শিখিয়েছেন—তাবিয়িগণকে, যারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের এ জ্ঞান পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবে ইসলামের ইতিহাসজুড়ে স্কলারগণ ইসলামি জ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তারা বিদ্যার্জনের শহর ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, মদিনা থেকে বাগদাদ, আন্দালুসিয়া থেকে টিমবাকতু। নারী ও পুরুষ স্কলারগণ প্রাচীন লিপি নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছেন, আজকের দিনের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যার ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন।

কিন্তু পড়াশোনা শুধুমাত্র স্কলারদের জন্যই না। রাসূল (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। ইসলামের শুরু থেকেই আমরা নিজেরা শিখতে চেয়েছি। তাই আমরা পড়েছি প্রশ্ন করেছি এবং কি শিখলাম তা নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা কখনই কুরআন-সুন্নাহ অথবা অতীতের স্কলারদের বিবৃতি দিয়ে প্রমাণ ছাড়া কারো কথা মেনে নেইনি, সত্যতা যাচাই করে নিয়েছি।

ইলম এবং ঈমান

দ্বীনে আসার আগে ইসলাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কম ছিল। আমি সেগুলো সাথে নিয়ে আরো জ্ঞান অর্জনের দিকে আগাতে থাকলাম। প্রায়ই আমি বিভিন্ন ব্যাপারে ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কথা বলতাম। সেসব ব্যাপারে আল্লাহর বিধান আমার মতের বিপরীত, কুরআনের বা হাদিসের প্রমাণ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে নিজের মতের পক্ষেই তর্ক করে যেতাম। ওটা ছিল আমার আত্মসমর্পণের পরীক্ষা—দীর্ঘ সময় ধরে যেসব চিন্তা ভাবনা আমি লালন করে এসেছি, তা আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.) এর বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় ঐ ভাবনাগুলোকে ফেলে দেওয়া। আমার মতের সাথে কোনো কিছু না মিললে আমি পড়তে থাকতাম, প্রমাণ ও যুক্তিগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকতাম, তারপর মেনে নিতাম।

এটা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের সুবিধা—ব্যাপারগুলোকে ভিন্নভাবে দেখা, তখন নিজের অগ্রাধিকারের তালিকা বদলায়। এটা সবসময় হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তুমি হয়তো সবসময়ই মিলস অ্যান্ড বুনকে বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করে এসেছ, কিন্তু একবার শেক্সপিয়ার পড়ার পর যখন ভিন্ন কিছু জানবে, তখন মিলস অ্যান্ড বুন সম্বন্ধে তোমার ধারণা বদলে যেতে পারে- আমি আশা করি!

দ্বীনের ব্যাপারেও একই। তুমি যখন নামাজের গুরুত্ব বুঝবে এবং জানবে যে নামাজ মানুষের পাপকে এমন ভাবে ধুয়ে মুছে দেয়, যেভাবে স্রোতের তোড়ে ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়—তখন তুমি নামাজকে ভিন্নভাবে দেখবে, নামাজে আরও বেশি সময় দিবে, এ থেকে আরো বেশি কিছু আশা করবে।

যখন তুমি রোজা রাখার পেছনের জ্ঞান সম্বন্ধে জানবে এবং জানবে যে রোজা রাখার কারণে বিগত বছরের গুনাহ কীভাবে মুছে যায়, তখন তোমার অনুভূতি বদলে যাবে, আরো বেশি দৃঢ়চিত্তে রোজা রাখবে, নিজের চাহিদাকে আরো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

যখন তুমি কুরআন পড়ার অঢেল পুরস্কার সম্বন্ধে জানবে, তখন তুমি কুরআনের পেছনে আরও বেশি সময় দিবে। আরবি পড়তে গিয়ে আটকে গেলে, তোতলালে তুমি হাল ছেড়ে দিবে না, আরো বেশি চেষ্টা করবে।

> *"জানার জন্য অনেক অনেক জ্ঞান আছে। যখন তুমি কিছু জানবে, তখন অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে সে জ্ঞান কাজে লাগানোর। জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে এটাই ভয়ের, জানলে মানতে হবে। এ এক বিশাল দায়িত্ব। কোনো কিছু পড়লে, জানলে বা শুনলে, সে অনুযায়ী আমল করার দায়িত্বের চাপ তোমার উপর আছে।"*
>
> *—আলিয়াহ*

জ্ঞাম মানুষের ইমানও বৃদ্ধি করে, তুমি তোমার বিশ্বাসে দৃঢ়তর এবং বেছে নেওয়া জীবনের পথে অবিচল হতে পারো। কুরআন নাযিলের ঘটনা, নাযিলের কারণ, কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস, কুরআনের বিস্ময় সম্বন্ধে যখন তুমি জানবে, তখন তোমার মন এবং বিশ্বাস আরো শক্তিশালী হবে।

তুমি যখন আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী সম্বন্ধে জানবে—তিনি সবচেয়ে বেশি করুণাময়, বারবার ক্ষমাকারী, দয়ালু, গুণগ্রাহী—তখন তুমি কখনোই তার ক্ষমার ব্যাপারে হতাশ হবে না, ভালো কাজ করতে আরও বেশি আগ্রহী হবে।

এটাই হচ্ছে একজন মানুষের ঈমান, বিশ্বাসের উপর জ্ঞানের প্রভাব।

এইসবই তোমাকে আরো ভালো মুসলিম বানায়, আরো ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করে, সমাজে একজন উদাহরণ হিসেবে তোমাকে প্রস্তুত করে। বস্তুত প্রত্যেক মানুষ এবং সমাজের ওপর জ্ঞান অর্জনের প্রভাবকে কখনোই অবমূল্যায়ন করা যাবে না।

জ্ঞান তালাশ

সান্দ্রা এবং হানাহ'র সাথে লন্ডনের বিভিন্ন ইসলামি আলোচনায় যোগ দিতে দিতে আমার জ্ঞান অনুসন্ধান শুরু হয়। ইসলামি জ্ঞান এর বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত সবচেয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলো সম্বন্ধে আমি সেখান থেকেই জানতে শুরু করি- ফিক্বহ (ইসলামি আইনশাস্ত্র), আকিদা (বিশ্বাস), আখলাক (চরিত্র এবং আচরণ), এবং তাজবিদ (কুরআন তিলাওয়াত এর নিয়ম কানুন)। আলোচনাগুলোয় যোগ দেওয়া শুধুমাত্র আমাদের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির কাজ করত না, একটা সামাজিক দৃশ্যের সাথেও পরিচিত করত। আমার মনে পড়ে, আমি আমার দলের সাথে সেন্ট্রাল লন্ডনে একজন বিশিষ্ট আমেরিকানের আলোচনা শুনতে গিয়েছিলাম। আমরা খুবই আগ্রহী ছিলাম এ ব্যাপারে। ওখানে আমাদের পরিচিত অন্যান্য মানুষের সাথে দেখা হচ্ছিল, কাউকে

কাউকে প্রথমবারের মতো হিজাব পরা দেখছিলাম, নতুন বোনদের সাথে পরিচিত হচ্ছিলাম, আরো আরো নতুন মুসলিম—সবাই মিলে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াটা আমরা যে শুধু উপভোগ করেছি তা না, আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল সপ্তাহের শেষে এর চেয়ে ভালো, উপকারী কাজ যেন আর হয় না।

বিয়ের পরে আমি একটা মসজিদের পাশে বাসা নিলাম। সেখানে অনেক নতুন মুসলিম ছিল। আমি দেখলাম ওখানকার সবাই জ্ঞান অর্জনকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ওখানে তারা মাঝে মাঝে ইসলামি আলোচনায় যাওয়ার চেয়ে নিয়মিত ইসলামি ক্লাসে বেশি মনোযোগী। এতে দেখলাম যে আমার শেখা আরো বেশি বিষয়ভিত্তিক হচ্ছে। আমি প্রথমবারের মতো নিয়মিত ক্লাসে যোগ দিলাম, নোট করলাম এবং শিক্ষক যা শেখাচ্ছেন তা শিখলাম, মুখস্থ করলাম। আমার স্বামী এবং আমি দুজন মিলে ক্লাসগুলোতে যেতাম। তখন আমরা মাঝে মাঝে একজন আরেকজনের নোটের সাহায্য নিতাম, আলোচনা করতাম, পরীক্ষা নিতাম।

আমার মসজিদ কর্তৃপক্ষ আরও কিছু সেন্টারের সাথে মিলে সপ্তাহান্তে নর্থ ইংল্যান্ডের একটা শহরে একটা কনফারেন্সের আয়োজন করে। সেটি ছিল আমার সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে একটি। এরকম অভিজ্ঞতা আমার আর কখনো হয়নি।

তারা একটা ইউনিভার্সিটির গ্রাউন্ড ভাড়া করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের হলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। পুরো ইউকে থেকে অনেক মানুষ আসে, সবাই মুসলিম। সবার একত্রিত হওয়ার একটি মহৎ উদ্দেশ্য—জ্ঞান অর্জন করা। মেয়েদের মধ্যে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ বিরাজ করছিল—সবাই একজন আরেকজনকে বোনের মতো ভাবছে, হেসে এসে সালাম দিচ্ছে, নিজেদের যা আছে তা ভাগাভাগি করছে, অপরিচিতদের সাথে কথা বলছে। কয়েকজন টিনএইজার একসাথে বসে গল্প করছে, অথচ তাদেরকে আবায়া, হাফ-জিলবাব ও স্কার্ফে দেখে বড় বড় লাগছিল। কত গল্প জমেছে! সবুজ লনে বাচ্চারা খুব আনন্দ করে খেলছে, দৌড়াচ্ছে।

রবিবার সকালে আমার বাচ্চা এবং স্বামী ছোট ঘরটায় ঘুমোচ্ছিল। আমি বের হয়ে গ্রাউন্ডে গেলাম। ফজরের পরের সময়টায় কী শান্ত, স্নিগ্ধ, নিরাপদ একটা পরিবেশ। খাবার ঘরের ওদিকে গেলাম, ওখানে কজন বোন একসাথে জড়ো হয়েছিল। একজন পাকিস্তানি মহিলা কিছু ইসলামি আলোচনা করছিল। সেই গভীর আলোচনা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেল, চোখে পানি আনল, আর ঠোঁটে মুচকি হাসি। তারপর আমরা নিজেরা নিজেরা কিছুক্ষণ কথা বললাম। তারপর উঠে গেলাম সকালবেলার নফল সালাত পড়তে। এরপর যখন একসাথে নাস্তা করছিলাম, চারপাশের গভীর প্রশান্তি আমাদের ছুঁয়ে গেল।

একটা দলের সাথে মিশে জ্ঞান অর্জনের অনুভূতি যে কী অসাধারণ, তা বর্ণনা করা কঠিন। এটা আমি আরো বেশি করে অনুভব করেছিলাম একটা সেমিনারে, ইসলামি শিক্ষার অগ্রবর্তী কজন শিক্ষার্থী এর আয়োজন করেছিল। ঐ সপ্তাহে আমরা সবাই

মিলে একসাথে খুব মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। সেই সব ভোর সকালগুলোয় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে হেঁটে হেঁটে সেমিনার ঘরে যাওয়া, একসাথে মিলেমিশে পড়া, শোনা, আলোচনা করা; সন্ধ্যায় মসজিদে বা শহরের একেক জায়গায় যার যার বাড়িতে রিভিশন দেওয়া, আলোচনা করা, মুখস্থ করা। আমার মনে হচ্ছিল প্রত্যেকটা মেয়ের চেহারা জ্বলজ্বল করছে। এক হাদিসে আছে কিছু লোক যখন একসাথে বসে আল্লাহর কথা স্মরণ করে তখন ফেরেশতারা তাদের ঘিরে ধরে এবং সেই মজলিসের মানুষের জন্য দুআ করে। ওই বিশেষ সপ্তাহে আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি এবং আলো দেখতে পাচ্ছি।

আমরা খুব উৎফুল্ল ছিলাম, এখনো মনে পড়ে যায় সেই অনুভূতি। আমাদের সমস্ত দুনিয়াবী দায়িত্ব থেকে দূরে ছিলাম—কাজের জন্য বা বাচ্চাকে নিয়ে কেউ স্কুলে দৌড়াচ্ছে না, বাচ্চার কান্না থামাতে ব্যস্ত না। যেন শুধু সেই সপ্তাহের জন্য আমরা কেউ মা ছিলাম না, স্ত্রী ছিলাম না, কন্যা ছিলাম না। আমরা শুধুই দ্বীনের শিক্ষার্থী ছিলাম। বক্তার আরবি কথায়, অনুবাদকের অর্থ শুনে কাগজের লিখতে লিখতে বাইরের বাকী দুনিয়াটা আমাদের কাছে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। পুরোটা সময়জুড়ে ভাবছিলাম, দ্বীন কী অসাধারণ! দ্বীন কী চমৎকার! আমরা এমন অনেক কিছুই জানছিলাম যা আগে জানতাম না, অনেক অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট হচ্ছিল, এত জ্ঞানী বক্তার শ্রোতা হতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান লাগছিল।

একদিনের কথা আমি ভুলব না, বিকেলে ক্লাসের পর অন্য বোনদের সাথে বসে সেদিনের পড়া আবার দেখছিলাম। একজন আরেকজনকে বিভিন্ন প্রমাণ, হাদিসের মান জিজ্ঞেস করছিলাম, তাজবিদ, আকিদা বিষয়ে জানতে চাইছিলাম। এ সময়, মসজিদে নামাজ পড়তে আসা অল্পবয়সী দুজন মেয়ের চোখ আমার দিকে পড়ল হঠাৎ, বোঝা যাচ্ছিল ওরা দ্বীনে নতুন। তাদের চেহারার সেই শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, ঈর্ষা! এরকম পরিবেশে দ্বীন শেখার সুযোগ খুব কম মুসলিমই পায়। আমাদের ঈমান, বিশ্বাস তখন এতটাই মজবুত ছিল যে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ঐ ক্লাসরুমে বসে দ্বীন শেখার জন্য আমরা দুনিয়ার যেকোনো কিছু ছেড়ে দিতে পারি।

সেমিনারের শেষদিনে আমার লেখা একটা কবিতা সবাইকে পড়ে শোনানো হয়েছিল যেটা আমি ওখানে লিখেছিলাম। আমার ধারণা এই কবিতায় দ্বীন, ইলম ও আলিমগণের ব্যাপারে আমাদের সেই সময়কার পুরো অনুভূতি ফুটে উঠেছে—

তোমার দ্বীনের বোনেরা
প্রত্যেকেই ইয়াকীনে অভিভূত
যে জ্ঞান অর্জন আত্মার খাদ্য
প্রত্যেক মুসলিমিন ও মুসলিমাতের জন্য
আল্লাহর দানে

আমরা কতই না কৃতজ্ঞ
যে এই সম্মান ভাগাভাগি করেছি
দ্বীন আঁকড়ে ধরেছি
দৃঢ় হাতে
বিশ্বাসী হৃদয়ে
যে আলিমদের ভালোবেসেছি
তাদের থেকে আলাদা হতে
আমরা ঘৃণা করি।
অশ্রু শুকিয়ে যায়নি
হৃদয় এখনো ভারাক্রান্ত
যে আমাদের দলপতিরা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।
এই তীব্র সতেজতায়
আমাদের ভেতর আলোকিত হয়েছে।
এরপর আমরা আমাদের পুরনো দিনে ফিরে যেতে ঘৃণা করি
সেই নীরস, প্রাণহীন দুনিয়ায়।
আমাদের ক্ষুধা আরো ধারালো হয়েছে
তৃষ্ণা বেড়েছে,
এ তৃষ্ণা যেন আমাদের আরো জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত করে,
আল্লাহ কবুল করুক।
তাই এখন আমাদের সালাম জানাই
ইনশাআল্লাহ, এ-ই শেষ নয়,
সময় পেরিয়ে
আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে যেন আবারো একত্রিত করে।
আপনাদের দ্বীনী বোনদের পক্ষ থেকে
জাজাকুমুল্লাহু খাইরান,
আমরা যেন দ্বীন প্রতিষ্ঠায় একসাথে কাজ করি,
ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করি।

দ্বীন শেখা একজনকে মানুষ হিসেবেই বদলে দেয়। মানুষের আচরণ, বাহ্যিকতা এবং কাজকর্ম বদলে যায়। এটা অনেকটা রমজান মাসে রোজা রাখার মত—বিরামহীন ইবাদাতে মগ্ন থাকা, এ অনুভূতি অসাধারণ। যে কখনো এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে যায়নি তার কাছে শুনতে আজব লাগবে যে এই অনুভূতি হ্যালুসিনেশন এর চেয়েও বেশি। এটা হচ্ছে মন এবং আত্মার খাবার যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। আমার মনে পড়ে বিয়ের পর প্রথম প্রথম আমি এবং আমার স্বামী লন্ডনের বাইরে কোনো বাসায় ইসলামি আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য পাবলিক গাড়ি ধরতে কী কষ্টটাই না করতাম! তারপর গভীর রাতে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতাম, ট্রেনে তখন অল্প

কয়েকজন যাত্রী। এই সবই আমরা করতাম দ্বীন শেখার জন্য, সেই অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য, আর আল্লাহকে জানতে একসাথে হওয়া কিছু চমৎকার ভদ্র, দয়ালু মানুষের সঙ্গ পেতে।

ইলম তোমাকে স্বাধীন করে

বিশ্বের নির্দিষ্ট কিছু মুসলিম কমিউনিটির ব্যাপারে বিরূপ ধারণা হওয়ার পেছনে অনেক তত্ত্ব আছে। কেউ কেউ বলে যেটা ঐ সমাজের ব্যর্থতা যে তারা আধুনিক, গণতান্ত্রিক পশ্চিমের মত হতে পারেনি। আর কেউ বলে এটা হচ্ছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার প্রভাব। আর কেউ কেউ এখনও এ ব্যাপারে ইসলামকে দোষারোপ করে।

সারা পৃথিবীজুড়ে মুসলিম সমাজগুলো নানা সমস্যা ও পরীক্ষায় জর্জরিত—বেকারত্ব, তরুণদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, আর সাথে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশৃংখলা তো আছেই। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যাগুলোর পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে আরেকটা বই লিখতে হবে যেটা করার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার সব সব সমাজের জন্যই প্রযোজ্য যে তাদের ইসলামি জ্ঞানের অভাব আছে। মুসলিমরা তাদের ধর্মকে গুরুত্ব দিয়ে পড়াশোনা করত এবং তা কাজে লাগাত, সে দিন চলে গিয়েছে। কেউ যদি অবাক হয় যে দ্বীনি শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে কেন এত গুরুত্ব, তাহলে তাকে খেয়াল করতে হবে যে এই জ্ঞান ও বুঝের অভাবে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে—রাজনৈতিক বিপর্যয়, সন্ত্রাস, বস্তুবাদ, লোভ, দুর্নীতি, পারিবারিক হিংস্রতা।

ইসলামের বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞানের দিকে ফিরে যাওয়া এবং তা কাজে পরিণত করার অনেক সুবিধা যেগুলো পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে প্রভাব ফেলে। একজন মানুষ যখন ইসলামকে জানতে এবং মানতে শুরু করে তখন তার চরিত্র বদলে যায়—সে আল্লাহকে ভয় করে। সে জানে যে আল্লাহ্ সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন এবং শুনছেন, তার কাজকর্ম সমবন্ধে জানেন। সে যা করছে তা লেখা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হবে। তখন সে তার কাজ এবং কথার ব্যাপারে আরো যত্নবান হয়, তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করে। মিথ্যা এবং গীবত থেকে দূরে থাকে। সে মানুষের সাথে আচরণে আরো সতর্ক হয়, জানে যে তার উপর অন্যদের অধিকার আছে। সে তার ব্যবসায়িক চুক্তিতে সতর্ক হয়, অসততা, প্রতারণা থেকে দূরে থাকে, হারাম ব্যাপার এড়িয়ে চলে, যেমন সুদ। সে তখন সামাজিকভাবে আরো দায়িত্ববান হয়, অন্যের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়, দান করে, অন্যকে সাহায্য করে। আর যখন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সে কোনো ভুল করে ফেলে, তাহলে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করে। সে ইসলাম এর আরও গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করে—আল্লাহভীতি, বিনয়, মহত্ত্ব, সততা, দয়া, করুণা। এই ধরনের গুণাবলীর সমন্বয়ে তৈরী হওয়া যে সমাজ, সে সমাজ অবশ্যই একটা অসাধারণ সমাজ হবে।

আর যে সমাজ আল্লাহর ইবাদাতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সমাজে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। কারণ আল্লাহর পক্ষে সবই সম্ভব—পরিমিত বৃষ্টি, ভালো সরকারব্যবস্থা, শান্তিপূর্ণ পরিবার এবং মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

আমি মনে করি, মুসলিমদের কাছে তাদের নিজেদের গোছানোর জন্য সবই আছে কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন দ্বীনের সঠিক জ্ঞান এবং তার প্রয়োগ।

অনেকের হয়তো মনে হতে পারে যে সমস্যাগুলোকে আমি খুব সহজ করে বলছি কিন্তু মুসলিম হিসেবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে—

> "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকতৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (সূরাহ নূর, ২৪:৫৫)

সেক্যুলার নীতিতে চলা একটা সমাজের ধারণা সবাই লালন করে না—যেখানে সমাজটা ভোগবাদী, বস্তুবাদী মূল্যবোধ লালন করে, যেখানে নীতি-নৈতিকতার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যে সমাজে প্রতিবেশীরা অপরিচিত, সমাজের বিলবোর্ড ও ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে নারী শুধুই যৌনবস্তু, যেখানে আল্লাহর স্মরণ নেই। কেউ কেউ এটা বিশ্বাস করবে, কারো কারো কাছে এটাই মানব চরিত্র এবং সমাজের চরম পর্যায় না। বস্তুত মুসলিমরা এসব সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে দেখে কারণ তাদের শেকড় ও ভিত্তি পুরোপুরি আলাদা। আমি বিশ্বাস করি, মুসলিম ও অমুসলিম, পুরো মানবজাতির কাছে উজ্জ্বল উদাহরণ এর মতো একটা সমাজ তৈরি করতে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে প্রথম ধাপ; ইসলাম তা-ই শেখায়। কেউ হয়তো শুনে হাসবে, বলবে যে গ্রীক এবং রোমানদের সময়ের মতো ইসলামের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন হচ্ছে উদার গণতান্ত্রিক দ্বীনের সময়। সেই মানুষগুলোর প্রতি, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা মুসলিম আছে, তাদের আমি প্রশ্ন করতে চাই, আল্লাহ কি এরকম কিছু সৃষ্টি করেছেন? তিনি কি কুরআনে বলেননি যে সকল যুগের সব মানুষের জন্য কুরআনকে তিনি নির্দেশনা হিসেবে পাঠিয়েছেন? রাসূল (সা.) কি সত্য কথা বলেননি? যদি তাদের উত্তর 'না' হয় তাহলে তারা যা খুশি তা-ই বলতে পারে, ইসলামের তাদের উপর কোনো দায় নেই। যদি উত্তর হয় 'হ্যাঁ' তাহলে তাদের উচিত পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখা, যেভাবে আল্লাহ তাআলা দেখেন। কারণ তিনি তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন। আমাদের অর্থাৎ মুসলিমদের জন্য ওহী কাল্পনিক কোনো কিছু নয়, এটা সত্য, আমাদের জন্য নির্দেশনা।

> "এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।"
>
> (সূরাহ ত্বাহা, ২০: ১২৪-১২৬)

আমি বিশ্বাস করি যে এই সমাজে দ্বীনি জ্ঞানের অভাবের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী আমরা, অর্থাৎ মুসলিম নারীরা। আমরা যখন আমাদের অধিকার সম্বন্ধে জানিনা, যখন ছেলেরা আমাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে জানে না অথবা সেগুলো পালন করতে আল্লাহকে ভয় করে না তখন আমাদেরকেই ভুগতে হয়। সমাজের ধারণা এমন যেন আমাদের কোনো উত্তরাধিকার নেই, আমরা তালাক দিতে পারি না, আমাদের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ। পিতৃশাসিত পরিবেশ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্য আমরাই ভুগি। সমাজের পূর্বাপর প্রথার জন্য আমাদেরকেই নির্যাতন করা হয়, হত্যা করা হয়। ইসলাম কখনো নারীর উপর জুলুম করে না। এটা হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের অভাব অথবা জ্ঞানের ভুল প্রয়োগ যা জুলুমের সৃষ্টি করে।

প্রথমদিকে, ইসলাম পুরো সমাজকে বিশেষ করে নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলামের আগে বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতো আরবের নারীদের কোনো অধিকার ছিল না বললেই চলে—তাদের তারা তাদের বিয়েতে মত দিতে পারত না, সম্পত্তিতে বা উত্তরাধিকারী হিসেবে তাদের কোনো অধিকার ছিল না, তাদেরকে পণ্যের মতো ব্যবহার করা হতো। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার ছিল যে একজন কন্যাসন্তানের জন্ম তাদেরকে এতটাই লজ্জা দিত যে শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম নারীকে হত্যার পরিবর্তে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে, তাদের নিজস্ব এবং সামাজিক পরিচয় দিয়েছে, শিক্ষিত হওয়ার, বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছে, যৌন চাহিদা পূরণে নিজেদের সন্তুষ্টি প্রকাশের অধিকার দিয়েছে, বিয়েতে চুক্তিপত্র ও শর্ত আরোপের অধিকার দিয়েছে, যৌতুক দেওয়ার পরিবর্তে মোহরানা পাওয়ার অধিকার দিয়েছে এবং প্রয়োজনে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার দিয়েছে, মসজিদে যাওয়ার, দ্বীন শিক্ষার অধিকার দিয়েছে। ওই সময়ে নারী রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করত, তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত, তার সাথে যুদ্ধ করত এবং ইসলামের কারণে শাহাদাত বরণ করত। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি প্রথম ঈমান আনেন এবং রাসূল (সা.) কে সমর্থন দিয়েছিলেন। সুমাইয়াহ ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ, তার সময়ের অনেক পুরুষ ঈমান ত্যাগ করলেও তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। আসমা বিনতে আবু বকর, যিনি আত্মগোপন করে থাকা রাসূল (সা.) এবং তার বাবার কাছে একা, অন্ধকারে খাবার ও খবরাখবর নিয়ে যেতেন। ছিলেন বাসিবাহ বিনতে কা'ব, যিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উহুদের যুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এমন আরো অনেকেই ছিলেন। ওই সময় ইসলামের নারী স্কলারদের মধ্যে ছিলেন আইশা বিনতে

আবু বকর, যিনি শুধুমাত্র নারীদেরকেই শিক্ষা দেননি, পুরুষরাও তাঁর কাছে শিখত। নারী সাহাবিদের মধ্যে তার অবস্থান সবার উপরে। ইসলামের নারী স্কলারদের মধ্যে আরো অনেকেই ছিলেন যারা দ্বীন শিক্ষা চমৎকারিত্ব প্রকাশ করেছেন, হাদিস বর্ণনা করেছেন, মুখস্ত করেছেন, হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে পড়িয়েছেন, বইয়ের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ইসলামের ইতিহাসের স্কলারদের বিখ্যাত হাদিসবেত্তা ইমাম মালিক এবং বুখারির জন্ম দিয়েছেন। এই মহান নারীদেরও অন্যদের মতো আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল— কেউ জ্ঞানী, কেউ আবেগী, কেউ সাহসী, কেউ বেপরোয়া, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ অভিযোগকারিনী। কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা প্রত্যেকেই সম্মানিত, ইসলাম এবং মুসলিমের ইতিহাসে তাদের প্রত্যেকেরই মর্যাদা অনেক উঁচুতে। এইসব ঘটনা সেই সময়ের যখন পশ্চিমের নারীরা তখনও মানুষ হিসেবে নিজেদের অধিকার পেতে এবং তাদের স্বামীদের থেকে আলাদা পরিচয়ে পরিচিত হতে সংগ্রাম করে যাচ্ছিল।

তারপর কোনো একটা সময়ে এই মহান ঐতিহ্য আমরা হারাতে শুরু করলাম। আজকের দিনে নারী স্কলারদের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গুনে ফেলা যায়। জ্ঞান অর্জন কমে যাওয়ার সাথে সাথে নারীর এবং সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা কমে গেছে। দ্বীন না বুঝলে নারীরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে জানবেনা আর যখন তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে জানবেনা তখন অধিকারের জন্য লড়াই করতে পারবেনা। মেয়েরা মায়েদের জীবন যেভাবে দেখে বড় হয়েছে সেভাবেই নিজেদের জীবন গ্রহণ করে নিয়েছে আর ছেলেরা বাবাকে যেভাবে আচরণ করতে দেখেছে সেভাবেই গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের সমাজ শুধু নামেই মুসলিম সমাজে, যে সমাজের সাথে রাসূল (সা.) এর সময়ের সমাজের কোনো মিল নেই। এটাই হচ্ছে নিরক্ষরতার সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি মানুষের প্রাপ্য সৌন্দর্যকে রুদ্ধ করে রাখে।

আমার বিশ্বাস যখন মুসলিম সমাজ তাদের দ্বীনের জ্ঞানের দিকে আবার ফিরে যাবে তখনই তারা ইসলামের প্রতিশ্রুতিগুলোর সুফল পাবে, এই জীবনে এবং পরকালে।

এই মূল্যবান জ্ঞান,
আমাদের হৃদয়ে যতনে রাখা।
মধ্যরাতের তারা
অন্ধকারের মোমবাতির মতো জ্বলছে।
এটি আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হোক
অঙ্গে প্রত্যঙ্গে,
আমাদের কথা,
প্রতিফলিত হোক
আমাদের স্বামী
ছোটদের উপর।

আল্লাহ এ আলোয়
আমাদের পরিবারকে আলোকিত করুক
আমাদের হৃদয়কে, ঘরকে,
এবং আমাদের সমাজকেও।
যদি আমাদের সমাজ শক্তিশালী হয়,
আল্লাহকে জানতে সংগ্রাম করে,
ইনশাআল্লাহ,
মহৎ কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে।
আর দিনে দিনে
আমাদের সন্তানরাও
ইলম, সুন্নাহর দিকে আগাতে কাজ করবে,
যাতে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ হয়।
হে আল্লাহ, সে মিষ্টি আলো যেন দ্যুতি ছড়ায়,
আমাদের কাজ বদলে দেয়,
আমাদের আত্মাকে পরিবর্তন করে,
আমাদের পরিবারকেও।
আর এই উম্মতকেও যেন বদলে দেয়।

রত্নসম বোনেরা ও আমাদের সম্পর্ক

আমার বোনেরা ছড়িয়ে আছে
ক্যারিবিয়ান দাস থেকে
স্প্যানিশ মনিবে।
আফ্রিকান রাণী থেকে
ঔপনিবেশিক কর্তায়।
বার্বার যাযাবর থেকে
প্রুশিয়ান কৃষাণীতে।
গ্রাম থেকে
শহরের ভদ্রসম্প্রদায়ে।
ধনী থেকে
গরিবে।
কালো থেকে
সাদায়,
বাদামীতে।
মুসলিম থেকে
ইহুদিতে,
খ্রিস্টানে,
হিন্দুতে।
সবাই একসাথে হয়েছে ইসলামের ছায়ায়,
এই সময়ে, এই স্থানে।
তাদের জীবন আমার জীবনকে
গুছিয়েছে,
বদলেছে,
ঐশ্বর্যমণ্ডিত,
মহিমান্বিত করেছে।

হিজাব এবং জিলবাব, বিয়ের কথাবার্তা এবং বিয়ে, সন্তান এবং নতুন নতুন মূল্যবোধ এর মাঝখানে আমি আমার ইসলামি জীবনের নতুন এক রত্ন খুঁজে পেলাম—নতুন

নতুন বোন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক। মসজিদে সবাই যখন সালাম আদান প্রদান করত, তিলাওয়াতের গুনগুন শব্দে মসজিদ ভরে যেত, তখন আমি এই রত্ন অনুভব করতাম। নামাজের সময় যখন নারীরা পাশাপাশি দাড়াত, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে, নামাজ পড়ত, তখন আমি এই রত্ন অনুভব করতাম। কারো নতুন সন্তান হলে বা ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে আমি এই সম্পর্কের গভীরতা বুঝতে পারতাম। রমজান মাসে এই বোনের সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হতো—আমরা একসাথে রোজা রাখতাম, লম্বা তাহাজ্জুদের জন্য একসাথে দাঁড়াতাম। আমাদের ঘনিষ্ঠতা, ঐক্যে, নিরাপত্তায়, ভালবাসায় উষ্ণ এক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক ছিল ইসলামের জন্য,

ইসলামের ভিত্তিতে, তাই যখন আমরা এ ব্যাপারে কথা বলতাম তখন আমাদের চেহারা জ্বলজ্বল করত।

"ও মনে করে ও খুব ভালো"

আমার বড় হওয়ায় বোনের সম্পর্কের কোনো অনুভূতি ছিল না। বয়ঃসন্ধির টানটান উত্তেজনায়, সামাজিক রাজনীতিতে এইসব সম্পর্ক এবং আবেগের কোনো স্থানই নেই।

সত্যি বলতে, টিনএইজে আমার খুব অল্প কজন মেয়ে বন্ধু ছিল, আমাদের সবসময় একসাথে থাকার মতো কোনো দল ছিল না—দলে হলে নিজেদের মধ্যেই প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়। তো আমরা দুই তিনজন একসাথেই থাকলেই ভালো থাকতাম। আমাদের দেখে অন্য মেয়েরা হুমকি মনে করত, আমাদের সম্পর্কে বলত, "ওরা মনে করে ওরা খুব ভালো!" বোনের প্রতি ভালোবাসার কিছু ছিল না—ছিল হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একজন আরেকজনের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করত, প্রতিশ্রুতি ভাঙত, প্রেমিককে ভাগিয়ে নিত।

এবং অবশ্যই, এইসবের পরও, আমরা পৃথিবীর অন্যান্য মেয়েদের মতোই ছিলাম—গল্প করতাম, অন্য মেয়েদের নিয়ে গীবত করতাম, অনুষ্ঠানে অন্যদের দেখে মন্তব্য করতাম, "বের হওয়ার আগে আয়নায় একবার নিজেদের দেখা উচিত ছিল ওর" অথবা, "এহ, যা ফালতু দেখাচ্ছে না!" শুধু যে আমাদের সাথেই খারাপ হতো, তা না, প্রয়োজনে আমরাও হৃদয়হীন আচরণ করতাম, অন্যকে ছোট করতাম। নিজেদের মধ্যে কোনো বিশ্বস্ততা ছিল না, একতা ছিল না, একজনের প্রতি আরেকজনের কোনো যত্ন ছিল না। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

তরুণী এবং টিনএজারদের জন্য প্রকাশিত ম্যাগাজিনগুলোর দিকে একবার চোখ বুলালেই বোঝা যাবে যে তারা পাঠকের মধ্যে এ ধরনের মানসিকতাকে উৎসাহ দেয়। তাদের মূল বিষয় হচ্ছে ছেলে, সেক্স এবং ফ্যাশন। অথবা সেক্স, ছেলে এবং ফ্যাশন। অথবা ফ্যাশন, সেক্স এবং ছেলে। অন্য বিষয়ে একেবারেই টুকটাক। এই ম্যাগাজিনগুলো "স্বাধীন নারী"র প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করে, নিজেদেরকে "আজকের দিনের নারী"র পরিবেশক বলে দাবি করে। গতানুগতিক পরিচ্ছন্নতা ও অ্যাপল

পাইয়ের রেসিপির বদলে তারা এখন বস্তাপচা শ্রী, স্ট্যাটাস ও সেক্স, সেক্স নিয়ে ছাপে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমাদের বেশিরভাগেরই কখনো বলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না।

যদিও ঐ বয়সে আমি যে মেয়েদের সাথে মিশতাম তারা টিনএইজার হলেও আমরা নিজেদেরকে অন্য মেয়েদের চেয়ে বুদ্ধিগত দিক থেকে একটু আলাদা মনে করতাম কারণ অন্যরা বই পড়ত না বললেই চলে, পেপার পড়ত না, খবর দেখত না, প্রশ্ন করত না, নিজস্ব কোনো মতামত দিত না, নিজেদের ছোট ছোট কথার বাইরে তাদের বলার কিছু থাকত না। মেয়েরা কেন নিজেদেরকে কাজে লাগাতো না এর পেছনে সামাজিক কিছু কারণ থাকলেও আমরা তাতে পাত্তা দিতাম না। আমরা যা তা হলো যে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ দরকার, আর আনন্দ করে বেড়ালে তা পাওয়া সম্ভব নয়।

টিনএইজ শেষ হয়ে আসছিল, তখন আমরা একটু বড় ছেলেদের সাথে বেশি সময় কাটাতাম। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বন্ধুত্বের চেয়ে বড় বড় ছেলেদের সাথে সম্পর্ক একটু আলাদা ছিল। যেখানে এমন মেয়ে পাওয়া দুষ্কর ছিল যে ছেলে, প্রেম, কাপড়-চোপড় ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে তেমন কথা বলতে পারত না, সেখানে ছেলেরা ছিল সার্বজনীন। তারা চলমান পরিস্থিতি, রাজনীতি, দর্শন এবং জীবনের আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে পারত। তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের নিজস্ব মতামত ছিল এবং সেগুলো প্রকাশ করতে বানিয়ে নিজেদের পক্ষ নিয়ে তর্ক করতে তারা ভীত ছিল না। আর তারা সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুদের সাথে গল্প করে অন্যের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মন্তব্য করে সন্ধ্যা কাটিয়ে দিত না। আর কোনো ভালো মেয়ে বাকি নেই বলে তারা শোক করত না, নিজেদের গার্লফ্রেন্ড বা ভুঁড়ি নিয়ে অভিযোগ করত না। হ্যাঁ এটা সত্যি যে খেলাধুলা, বাগানের কথা আসলে তাদের আলোচনা এলোমেলো হয়ে যেত কিন্তু তারপরও তাদের সঙ্গে এক ধরনের মজা এবং চাঙ্গা করা ভাব ছিল।

কিন্তু যেটা আমি আগেও বলেছি যে ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব হবে সেখানে কোনো ধরনের যৌন আকর্ষণ তৈরি হবে না এমনটা প্রায় হয় না বললেই চলে। মেয়েটা কোনো আকর্ষণ অনুভব না করলেও ছেলেটার ব্যাপারে অনুভূতি থাকত, এমন অনুভূতি যেটা শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। সুতরাং ছেলেদের সাথে সময় কাটানো আনন্দদায়ক হলেও ওটা ছিল দুই প্রান্তে ধারালো অস্ত্রের মতো। সবসময় সতর্ক থাকতে হতো। খুব বেশি প্রাণবন্ত, ফ্রী হওয়া যেত না, তা না হলে ছেলেটা হয়তো ভুল ধারণা পাবে। ফলাফলে এই সম্পর্কে কখনোই বিশ্বাস এবং আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস থাকত না। রাতের বেলা ঘোরাফেরা, রাত করে বাড়ি ফেরা সবকিছু ছিল কিছু ছেলেদের জন্য সুযোগ, যাতে করে সে তার নিজের সত্যিকারের অনুভূতি বলতে পারে। প্রায়ই এ সম্পর্কে ভাঙন ধরে কারণ মেয়েটা যখন জেনে যায় ছেলেটা তাকে সেভাবে দেখেছে, তখন সে আর কিভাবে আগের মতো আচরণ করতে পারে।

বান্ধবীরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢোকার পর আমি আমার মত আরো কিছু মেয়ের সাথে পরিচিত হলাম, যারা যুক্তি আবেগের দিক দিয়ে অন্যদের চেয়ে আলাদা, একজন আরেকজনের পেছনে কথা বলে সারাদিন কাটিয়ে দেয় না। তারা এমন মেয়ে যারা প্রশ্ন কর, বিভিন্ন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে ও নিজেদের অবস্থানের পক্ষে বিতর্ক করত। আমরা সবসময়ই রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় নিয়ে কথা বলতাম, ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিজেদের অনুভূতি এবং চিন্তা-ভাবনা ভাগাভাগি করতাম। বড় হওয়ার পর অন্যান্য মেয়ের সাথে বন্ধুত্বের এই পরিবর্তনটা অনেক মেয়েই লক্ষ্য করে। যাই হোক, বেশীরভাগ মেয়ে ইসলামে আসার আগে তাদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে বলছিল যে তারা গীবত, গল্প এবং অন্যের ব্যাপারে মন্তব্য করা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো।

খবরাখবর বা পরামর্শ দেওয়ার নামে অন্যের ব্যাপারে কথা বলে, মিথ্যা বলে, গুজব ছড়িয়ে, অন্যের গোপন ব্যাপার প্রকাশ করে কত ঘণ্টা যে কেটে গেছে হিসেব করা সম্ভব না। সারা বলছিল যে, "শুরুটা হয় এভাবে, আমি ওর পেছনে কথা বলছি না কিন্তু...." অন্যকে নিয়ে মন্তব্য করে, বিদ্রুপ, ব্যঙ্গ করে মজা পেলেও নিজের বেলায় মন্তব্য শুনতে কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু তবুও কেউ কাউকে এসব থেকে বিরত থাকতে বলে না, স্বাভাবিকভাবে নেয় এবং মহা উৎসাহে নারীসমাজের এ বৈশিষ্ট্যকে চালু রাখে।

তবে আমার দেখামতে, নারী-পুরুষ একসাথে মিলে যায় এমন ঘটনা ঘটে শারীরিক আকর্ষণের ব্যাপারে। পুরুষ নিজের শক্তি—টেস্টোস্টেরন, পৌরুষ, আত্মবিশ্বাস নিয়ে নারীর কাছে আসে। এ শক্তি নারীর সক্রিয়তার সাথে বিক্রিয়া করে। নারী চোখ পিটপিট করতে থাকে, চুল ঠিক করে, তাদের কণ্ঠস্বর বদলে যায় এবং দেখা যায় হঠাৎ করেই নারীচরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন নিজেদের মধ্যে একতা, কর্তৃত্বপরায়ণতা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বাতাসে তখন নতুন উত্তেজনা, পুরুষ এর কেন্দ্রে।

ক্লেয়ার আমাকে একটা ঘটনার কথা বলল, যা পুরোপুরি এর সাথে মিলে যায়। তার মায়ের সাথে দেখা করতে একজন মহিলা আসে। সে অন্যঘর থেকে তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিল। হঠাৎ করে সে মহিলা কণ্ঠস্বর বদলে গেল, সে কেমন যেন নাটুকে ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল। সে বুঝতে পারছিল না কেন এমন হচ্ছে। পরে দেখল, ঐ রুমে একজন পুরুষ ঢুকেছে। "কিছু মেয়ে ছেলে দেখলে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তখন দেখবে সে আর আগের মানুষটা নেই। একেবারে ভিন্ন কেউ হয়ে গেছে।"

পুরুষের উপস্থিতিতে নারীরা একজন আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায়, নিজেকে অন্যের চেয়ে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে উঠে পড়ে লাগে। ছেলেরা এর কেন্দ্রে থাকে। এমনটা হলে মেয়েদের মধ্যে বোনসম সম্পর্ক তৈরি হয় না, "সিস্টারহুড" স্বপ্নের মতোই থেকে যায়, টি-শার্টে লেখা স্লোগানে।

তোমার বোনের জন্য ভালোবাসা...

ইসলামে মেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক কিছু নিয়মনীতি দ্বারা আবদ্ধ। "ইসলামিক সিস্টারহুড" এ বিশ্বাসী মুসলিমদের একজন আরেকজনকে ভাই/বোন হিসেবে দেখতে এবং এবং আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।" (সূরাহ হুজুরাত, ৪৯:১০)

এক হাদিসে এসেছে,

> "রাসূলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া প্রদান করব। আজ এমন দিন, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই।" (সহিহ মুসলিম)

বোনদের একজনের উপর অন্যজনের অধিকার আছে—সালাম দেবে, অসুস্থ হলে দেখতে যাবে, ভালো পরামর্শ দেবে। অন্যান্য সম্পর্কের মতো এই বোনের সম্পর্কেও আছে—একে অপরকে সম্মান করা, ভালো কথা বলা, সৎ, মহৎ, দয়ালু থাকা। একে অপরের সাথে কীরকম আচরণ করবে এ ব্যাপারে উপদেশ ও পরামর্শ এসেছে অনেক হাদিসে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

> "তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজিও না, একে অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না; বরং ভাই ভাই হয়ে যাও।"

নিজেদের মধ্যে একীভূত হয়ে থাকার আরো কিছু ব্যাপার আছে—ইসলামি জীবনব্যবস্থা, সামাজিক গঠন, নারী-পুরুষের আলাদা থাকা, হিজাব, পারিবারিক ভূমিকা—এসব নারীদের মধ্যে বিশ্বাস ও সমর্থনের জন্ম দিয়ে বন্ধন ঘনিষ্ঠ করে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ঘর হচ্ছে নারীর বিচরণক্ষেত্র। ঘর তার দায়িত্বে এবং সে ঘরের রাণী। এখানে সে নিজের মতো হিজাব ছাড়া থাকে, নিজের কাছের মানুষদের সাথে থাকে—সে তার নিজের মতো সেখানে। আতিথেয়তা ও মহত্ত্বের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে—বাড়িতে মেহমান আসলে তাদের আপ্যায়ন করতে বলা হয়েছে, একজনকে আরেকজনের বাসায় যেতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তো কোনো মেয়ের বাসায় গিয়ে আরো অনেক মেয়েকে দেখা; তারা একসাথে পড়ছে, আরাম করছে, রান্না করছে, কথা বলছে—এমনটায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওখানে আমরা "শুধুই মেয়েরা" থাকি, কোনো ছেলের অনুমতি নেই। ছেলেরা তখন সে ঘরে ঢুকতে পারে না, প্রয়োজন হলে বাইরে থেকে বাচ্চা বা স্ত্রীকে ডাকে। ছেলেরাও এতে আপত্তি করে না

যে তাদের স্ত্রী মেয়েদের সাথে আনন্দ করছে, কারণ ছেলেরা নিজেরাও তো ছেলেদের দলে ঢুকে আনন্দ করে।

আরেকটা কারণ আছে যা মেয়েদের মধ্যে বন্ধনকে আরও বেশি প্রভাবিত করে। সেটা হচ্ছে যে সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের ফ্রি মিক্সিং আমরা এড়িয়ে চলি, এ ব্যাপারে আগে বলেছি এবং কোনো সন্দেহ নেই যে এটাও একটা কারণ কেন আমরা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে এত বন্ধুত্বপূর্ণ।

আর যেহেতু আমরা একসাথে থাকলে সেখানে কোনো ছেলে থাকে না, তাই আমাদের অনেক বেশি আত্মসচেতন হয়ে থাকতে হয় না। কেউ আমাদের মাপছে না, তুলনা করছে না, বিচার করছে না। আমরা কেউ তখন একজন আরেকজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবি না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কিছুই তো নেই।

আর আমাদের স্বামীরা আমাদের বান্ধবীদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে এরকম কোনো দুশ্চিন্তা আমাদের নেই। কারণ স্বামীরা আমাদের গ্রুপে থাকে না এবং আমাদের বান্ধবীদের তারা বেপর্দায় দেখেও না।

মুসলিম নারীরা পুরুষের সামনে একটু সংরক্ষিত হয়ে থাকে। আমরা ছেলেদের সাথে খোলামেলা ব্যবহার করি না, হাসিঠাট্টা করি না, গল্প করি না, ফ্লার্ট করি না। আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বকে আড়াল করে রাখি। নাচ, গান করা, মজা করা—এগুলো শুধু আমাদের পরিবার এবং বান্ধবীদের সামনেই। তুমি একটা মেয়েকে তার পূর্ণরূপে দেখবে এমন জায়গায় যেখানে কোনো ধরনের ক্ষতি অথবা ভুল বোঝার সুযোগ নেই। আমরা মেয়েরা একসাথে পড়াশোনা করি, পার্টি করি, কাজ করি, মজা করি এমন একটা পরিবেশে যেখানে ফিতনার আশংকা নেই। আমরা সেখানে নিজেদের মত থাকি এবং একে অপরকে বিশ্বাস করি, সেখানে পুরুষের উপস্থিতি নেই।

মেয়েদের মধ্যে, বান্ধবীদের মধ্যে

দ্বীনে আসার পর আমাদের অনেক কিছুই বদলে গেছে—আমাদের বিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমাদের জীবন যাপন এবং অন্য মেয়েদের সাথে আমাদের সম্পর্ক। দ্বীন মানা শুরু করার পর থেকে যখন বুঝতে পারি ছেলেদের সাথে আমরা আর মিশব না, তখন আমাদের নারীদের সাথে মেশা শুরু করতে হলো। তাদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করতে হলো, কথা বলতে হলো, কেমন করে তাদের সাথে ইসলামমতে ব্যবহার করতে হবে তা শিখলাম।

কারো কারো জন্য এটা সহজ ছিল, তারা খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। আর কারো জন্য ছিল কঠিন, কোনো পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া পরিবেশটা আজব। সেখানে মেয়েরা জাহেলিয়ার বান্ধবীদের মত আচরণ করে না, একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেয়। হাসিখুশি থাকে, ভদ্র আচরণ করে। তাদের সাথে ক্যাম্পাসের করিডোরে বা নামাজ ঘরে যেখানেই দেখা হোক না কেন, তারা সব সময়

সালাম দেয় অথবা কোলাকুলি করে। একদমই আলাদা। একটা সময় দেখা গেল আমরাও অন্যদের দিকে তাকিয়ে হাসছি, সালাম দিচ্ছি। একটা ইতিবাচক, প্রসন্ন পরিবেশ। যদিও আমি, সান্দ্রা আর হানাহ একজন আরেকজনকে নির্মমভাবে খোঁচাতেই থাকতাম, কিন্তু অন্যদের সাথে এমনটা করতাম না। খুব ভালো আচরণ করতাম। এর একটা কারণ হতে পারে যে আমরা নতুন মুসলিম, আর তারা ছিল জন্মগত মুসলিম, এশিয়ান। দেখতাম বিভিন্ন গোত্রের মেয়েরা একে অপরের সাথে একটু আলাদা আচরণ করে। তবে কিছু ব্যাপার একই থাকত—যে যেই গোত্রেরই হোক না কেন, প্রত্যেকেই ভীষণ বন্ধুত্বপূর্ণ, সদাশয়, আতিথেয়তাপূর্ণ। এটা ছিল একেবারে নতুন অনুভূতি। এরকম আচরণ না করে আমরাও পারতাম না।

অল্প বয়সী যারা তখনও পুরোদমে পড়াশোনা করছে, তাদের সাথে দেখা হতো ক্লাস শেষে এবং সপ্তাহের শেষে। সে সময় আমরা একজন আরেকজনের সাথে দেখা করতাম, কথা বলতাম একসাথে বসে ইসলামি রেকর্ড শুনতাম অথবা গ্রীন স্ট্রিটের কোথাও শপিং করতে যেতাম। আমরা একজন আরেকজনের বাসায় যেতাম, গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম, ফজর পর্যন্ত সারারাত জেগে গল্প করতাম, খাওয়া দাওয়া করতাম। একদম সত্যি করে বলতে পারি আমাদের আশপাশে কোনো ছেলে নেই, এ ব্যাপারটা আমরা কখনো মিস করতাম না। নিজেদের নিয়ে নিজেরাই খুব খুশি ছিলাম, আনন্দিত ছিলাম।

অল্পবয়েসীদের মধ্যেও আমাদের মতোই খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। টিনএইজে আমরা যে ধরনের বন্ধুত্ব পেয়েছি, ওরা সেরকমটার সম্মুখীন হয়নি। তারা একসাথে সময় কাটায়, দ্বীন এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে। একজন অন্যজনের বাড়িতে বেড়াতে যায়, মসজিদে যায় একসাথে শপিং এ যায়। আর হ্যাঁ, তারাও ফ্যাশন ও অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে গল্প করে। কিন্তু অন্যান্য কমিউনিটির মতো এখানে টিনএজার এবং অবিবাহিতরা বড়দের থেকে, অর্থাৎ বিবাহিতদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখে না। তারা আমাদের সাথে একইসাথে ক্লাস করে, দাওয়াতে যায়। আর দাওয়াতে গিয়েও তারা নিজেরা নিজেরা আলাদা হয়ে গল্প, হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠে না। তারা আমাদের সাথে বসে, কথা শুনে, নিজেদের ভাবনাগুলো প্রকাশ করে, প্রশ্ন করে, তাদের নিজেদের মায়ের এবং মায়ের বান্ধবীদের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বলে। ঈদের দিনও তারা দূরে থাকে না। কারণ তারা জানে তাদের মায়েরা সত্যিই জানেন কীভাবে ভালো সময় কাটাতে হয়।

এর আগে আমি যে বিয়ের পার্টির কথা বলেছি তা হচ্ছে সামাজিক উৎসবের একটা চমৎকার উদাহরণ। সেখানে ছেলেরা অন্য রুমে থাকে, আরো ভালো হয় যদি তারা অন্য একটা বাসায় থাকে, তখন মেয়েরা তাদের বান্ধবীর বিয়ে গানে, হাসিতে, কান্নায় উদযাপন করে। এই বিয়ের উৎসবগুলো আমাদেরকে একসাথে আনে এবং আমাদের সম্পর্কে নতুন মাত্রা দেয়। সাধারণত যেটা হয় যে বিয়ের পর একটা দম্পতি নিজেরা

নিজেরা একটু আলাদা হয়ে যায়, তারা নিজেদের মধ্যে বেশি সময় কাটাতে চায়। কেউ কেউ এরকমই থেকে যায়, সামাজিকতায় তেমন একটা আসে না। তবে বেশিরভাগই স্রোতে ফিরে আসে খুব তাড়াতাড়ি—মসজিদে, ডিনারে, দাওয়াতে, সাঁতার কাটায়, জিমে, পার্কে। যাই হোক, একটা ভালোবাসাপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্ক অবশ্যই চমৎকার, কিন্তু মেয়েরা মেয়েরা একসাথে সময় কাটানোর মতো ভালো আর কিছু নেই—ঈমান মজবুত করতে, মনকে সতেজ করতে আর কিছুটা হাসিঠাট্টার জন্য।

বোনদের মধ্যে কারো যদি বাচ্চা থাকে তাহলে সেটা সম্পর্কে ভিন্নমাত্রা আনে। অন্যান্য প্রথম মায়ের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটা গ্রুপে যদি শুধু সে একাই মা হয় তাহলে, সে নিঃসঙ্গ বোধ করে। আমাদের সাথে সেটা প্রায় হয়ই না। আমার ধাত্রী খুব অবাক হয়েছিল যে সন্তান জন্মের আগে আমাকে কোনো ক্লাসে যেতে হয়নি। আমার আশপাশে অনেক মা ছিল, যারা আগেই গর্ভাবস্থা, বাচ্চার জন্ম এবং যত্নের ব্যাপারে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। আমাদের অনেকের বাচ্চারা একসাথে বড় হয়েছে, একজন আরেকজনের বাসায়, আন্টি ডেকে ডেকে। আমরা প্রায়ই পার্টির আয়োজন করতাম, দাওয়াত দিতাম, বাচ্চাদেরকে নিয়ে বের হতাম; কয়েকজন মিলে অথবা পুরো কমিউনিটিটাই। আমার মনে পড়ে আমার ছেলের নার্সারির শিক্ষকরা মিলে একটা স্পোর্টস ডে এর আয়োজন করেছিল, ওই এলাকার একটা সুন্দর পার্কে। ওটা একটা পাবলিক পার্ক কিন্তু বিভিন্ন ফুল ও গাছের সারি দিয়ে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা ছিল। সে এক চমৎকার দিন। সবাই অনেক অনেক খাবার নিয়ে এসেছিল—চিকেন ফ্রাই, নান রুটি, তরমুজ, স্ট্রবেরি এবং কোমল পানীয়। সবাই তাদের সন্তানের জীবনের প্রথম স্পোর্টস ডে উপভোগ করতে খুব আগ্রহী। আবহাওয়া খুব ভাল ছিল। বাচ্চাদের প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরপরই অভিভাবকদের প্রতিযোগিতা শুরু হলো, কেউই থামল না। তারা একক দৌড়ে অংশ নিল, রিলে দৌড় দিল, দড়িলাফের দৌড় দিল। বাচ্চারা আনন্দে উল্লসিত। আমি জানি না আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছিল তারা এই পর্দা করা নারীদেরকে এত মজা করতে দেখে কি ভেবেছিল!

সহযোগিতার আরেকটা ক্ষেত্র হচ্ছে কাজের জায়গা। আমাদের মেয়েরা যখন বাইরে কাজ করে, তখন এমন পরিবেশে কাজ করে যেখানে প্রচুর নারী আছে, সেটা স্কুল হোক বা তাদের নিজেদের ব্যবসা হোক। স্কুলে যারা কাজ করে তারা বোনসুলভ সম্পর্কের সৌহার্দ্য প্রতিদিনই উপভোগ করে। আর যারা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করে তারা বিভিন্ন ইভেন্টে একসাথে থাকে—পেম্পার ডে, বাজার এবং ফ্যামিলি ডে আউট। এর আগে আয়োজন করেছি এমন পেম্পার ডে'র অনেক প্রিয় স্মৃতি আমার আছ—সেখানে বিউটি থেরাপিস্ট উপরতলায়, স্পা বিশেষজ্ঞরা পেছনের রুমে, হেয়ার ড্রেসাররা একটা বেডরুমে, ব্রেইডার এবং মেহেদী শিল্পীরা লাউঞ্জে আর খাবার বিশেষজ্ঞরা রান্নাঘরে। মেয়েরা পেম্পার ডে'তে আসে একজন আরেকজনের কাজকে সমর্থন দিতে, যত্ন নিতে এবং নিজেরাও একটু বিশ্রাম করতে। বাড়িটা গমগম করছিল। একটু পরিশ্রম হলেও অনুষ্ঠানের পরে সবারই খুব ভালো অনুভূতি হয়। বিশেষ করে

যদি কোনো উপকার হয় অথবা আলোচনাগুলো বেশ ভালো হয়। আর মেয়েরা সবসময় জানতে চাইত এর পরের আয়োজনটা কবে হবে।

আমাদের বাড়িতে অথবা মসজিদে, কোনো অনুষ্ঠানে বা কাজে আমরা খুব আত্মবিশ্বাসী থাকি। আমাদের মধ্যে ভয় কাজ করে না যে ভুল কিছু বলে ফেললাম কি না, আমাদের উপর নজর রাখছে কি না, কোনো ভুল করে ফেললাম কি না। এসব আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক দাওয়াতে মেয়েরা খোলা মনে মিশে, নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করে, বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ব্যাপারে কথা বলে। আমরা একসাথে হাসি, কাঁদি এবং নিজেদের অনুভূতি ভাগাভাগি করি; আপন বোনের মতো।

"আমি একবার মসজিদে গিয়েছিলাম সেখানে বেশ কিছু মেয়ে একসাথে ছিল। আমার শুধু মনে পড়ে যে তাদের প্রত্যেকের হাসি মুখ মনে পড়ে। সব মেয়ে, সব মহিলা- প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে খুব সুন্দর। নিকাব খোলার পর সবাইকে এত বিশুদ্ধ লাগছিল! যেন বিস্ময়কর কিছু উন্মোচিত হলো। মেয়েদের এমন কোনো সার্কেলে আমি আগে কখনো যাইনি।"

—সারা

আমার মা বিদেশ থেকে বেড়াতে এসে আমাদের এ অসাধারণ সামাজিক বন্ধন দেখেছিল। তাকে প্রায় জায়গায়ই দাওয়াত করা হতো। তিনি সবাইকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন, বলতেন, 'দ্য সিস্টার্স'। একজন নারী হিসেবে তিনি আমাদের সম্পর্কের উষ্ণতা, হাসি ও আস্থার প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন এটা খুব সুন্দর এবং অসাধারণ। আমার বাবাকে যখন অন্য লোকেরা দুঃখপ্রকাশ করে বলত যে, তার মেধাবী চঞ্চল মেয়েটা কেমন করে মুসলিম হয়ে গেল, নিজেকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ফেলল, তখন তিনি তাদের বলতেন যে আমার জন্য দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমি খুব সুন্দর জীবন কাটাচ্ছি, তারা আমার জীবনকে যেমন নীরস ভাবছে, আদতে তেমন কিছুই না।

শুধুই ভালোবাসা

"আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (সূরাহ আনফাল, ৮:৬৩)

মুসলিম নারীদের মধ্যে বন্ধন আরো সম্প্রসারিত হয় নারীত্বের ছায়ায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের লক্ষ্য এবং বিশ্বাস তাদেরকে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ করে, যে বন্ধন কোনো দুনিয়াবী কথাবার্তা দিয়ে তৈরি করা সম্ভব নয়। দ্বীনী বোন হিসেবে আমরা একজন আরেকজনকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। এর মানে হচ্ছে কাউকে ভালোবাসার জন্য আমাদের উপরি কিছু বা বস্তুগত কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয় না। আমরা আমাদের বোনদের ভালবাসি কারণ সে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ

করেছে। ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক কারণে সৃষ্টি হওয়া এই ভালোবাসা সব বর্ণ, বয়স, সম্পদ এবং গোত্রকে অতিক্রম করে।

সারা আমাকে বলছিল,

> "জাহিলিয়্যার সময়ে আমরা স্বার্থের জন্য বিভিন্ন জনের সাথে মিশতাম। ইসলামে ব্যাপারটা তা না। এখানে এমন কোনো বোন থাকতেই পারে যার ফ্যাশন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রুচিহীন, জাহিলিয়্যার সময়ে যেসব ব্যাপার যা তুমি তুচ্ছতার সাথে দেখতে, তার সবই তার মধ্যে থাকতে পারে। কিন্তু সে হয়তো খুব বেশি ধার্মিক, তোমার কথার খুব ভালো শ্রোতা, এমন কেউ, যার কাছে তুমি তোমার সমস্ত সমস্যার কথা খুলে বলতে পারো, সে তোমাকে সবচেয়ে ভালো উপদেশ দিতে পারে। আর তোমার বান্ধবী সম্পর্কে অন্যরা কি বলল তা আর তুমি মাথায় নাও না, তুমি জানো যে একজন মানুষকে ভালোবাসার জন্য সবচেয়ে ভালো কারণটা কী। সেটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।"

আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসার মানে হচ্ছে তাদের চরিত্রের ইসলামি ব্যাপার গুলোর জন্য তাদেরকে ভালোবাসা—আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা, ইবাদাত, তাদের আচরণ, তাদের ইতিবাচক প্রভাব, তাদের একনিষ্ঠতা, তাদের বিশ্বস্ততা এবং দ্বীনের বুঝ। যাই হোক এর বাইরে কিছু ছোটখাটো ব্যাপার থাকতে পারে যার কারণে কিছু বোন নিজেদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। এর কারণ—তাদের অভিজ্ঞতা, পুরনো ঘটনা, সংস্কৃতি, হাস্যরস অথবা পছন্দ, আগ্রহের ক্ষেত্র মিলে যায়।

এটা তো নিশ্চিত যে একজন সবার সাথে মিশতে পারবে না। তাহলে যখন ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ হয় বা কারো সাথে কারো বন্ধুত্বটা ঠিক জমে ওঠে না তখন কী হয়?

সারা ব্যাখ্যা করছিল,

> "তুমি যখন স্বাভাবিকভাবে কারো সাথে একজন ব্যক্তি হিসেবে মিশতে পারবে না তখনও তাদেরকে ভালোবেসে যাবে। কারণ তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সে তোমার দ্বীনি বোন। আমি এই আন্তরিকতা ভালোবাসি। আমার মনে হয় আল্লাহর জন্য কাজ করলে সেখানে আন্তরিকতা আসবেই। এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ নিয়ত এবং বিশুদ্ধ আন্তরিকতা। তুমি বোনদের মধ্যে হৃদ্যতা অনুভব করবে যদি সেখানে আন্তরিকতা থাকে।"

বস্তুত, বোনদের মাঝে ভালোবাসা অনেক, ভালোবাসা অনেক উদার। তুমি এটা তাদের হাসিতে দেখতে পাবে, তাদের হাসির শব্দে তা শুনতে পাবে, অনুভব করতে পারবে। বাস্তবিকই, বাতাসে আবহাওয়ায়। আলিয়া তার বোনদের সম্পর্কে নিজের অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেছিল, "আমি আমার বোনদের যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসি, এমনকি আমার পরিবারের চেয়েও।"

"আমি যখন ওদের সাথে মিশি, তখন খুব খুশি থাকি। একসাথে নামাজ পড়ি। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি যে আমার সামনে বা আড়ালে যদি কেউ আমার বিপক্ষে

থাকে তাহলে আল্লাহ যেন আমাদেরকে আবার একত্রিত করে দেন। আমরা যেন জান্নাতে একসাথে থাকতে পারি ইনশাআল্লাহ।"

অদ্ভুত লাগলেও সত্যি, এ ভালোবাসা আমি সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছি যখন আমরা একসাথে জ্ঞান অর্জন করতাম, অথবা কুরআন তিলাওয়াত করতাম, নামাজ পড়তাম, দ্বীনের কোনো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতাম। ওই সময়গুলোতে আমাদের চোখ উজ্জল থাকত, মন আল্লাহর স্মরণে নরম থাকত। তখন তুমি অনুভব করবে চারপাশের ভালোবাসায় তোমার হৃদয় সিক্ত হচ্ছে; তোমার বোনদের ভালোবাসায়, জীবনের এ যাত্রায় যারা তোমার সঙ্গী।

বিশ্বাস

"সিস্টারহুড" এর এই ব্যাপারে আমি উম্মে মুহাম্মদের অনুভূতি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে দ্বীনের বন্ধুত্বগুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করল।

সে বলছিল, "জাহিলিয়্যার সময়ে আমার কিছু ভালো বন্ধু ছিল। তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ইসলামে আমি বুঝতে পারি যে আমি এই বোনদেরকে আগের ওদের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস করতে পারি। আমি মনে করি সবার আগে তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তারা কোনোভাবেই আমার ক্ষতি করবে না। জাহিলিয়্যার সময়েও আমার বন্ধু ছিল। ওদের সাথে আমার বছরের পর বছর ধরে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি এই বোনদেরকে আমি এমন অনেক কিছু বলতে পারে যা আমি আগের ওদেরকে বলতে পারতাম আমি এই বোনদের সাথে অনেক খোলামেলা কথা বলতে পারি। যাদের সাথে দেখা হয়েছে তারা সবাই আমার বোন। আমি খুব খুশি। তার মানে এই না যে জাহিলিয়্যার সময়ে আমি একাকিত্বে ভুগতাম। কিন্তু এই বোনদের মধ্যে আমি একধরনের ভালোবাসা অনুভব করি, বুঝি যে তারাও আমাকে ভালোবাসে।"

> *"আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামে আসার পর আমি সত্যিকারের বন্ধুত্ব খুঁজে পেয়েছি। কোনো কারণ ছাড়াই আমি কোনো বোনের সাথে কথা বলতে পারি, যে কোনো কিছু চাইতে পারি, জিজ্ঞেস করতে পারি। এবং তারা খুব সুন্দর করে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়। সেসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে হতে পারে, আর্থিক ব্যাপারে হতে পারে। জাহিলিয়্যার সময় আমি কখনোই আমার বন্ধুদের কাছে টাকা চাইতে পারতাম না। বরং টাকা ছাড়াই দিন চালিয়ে দিতাম।"*
>
> *—আজিজা*

আমাদের আচরণ যেহেতু ইসলামি নির্দেশনা দিয়ে পরিচালিত হতো তাই আমাদের প্রত্যেকেরই একই স্ট্যান্ডার্ড ছিল এবং আমরা জানতাম অন্যের কাছ থেকে কী ধরনের ব্যবহার আশা করতে হয়। জাহিলিয়্যার সময়ে কাউকে কোনো গোপন কথা বলা মানে ছিল সেটা গোপনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। এই বোনদের সাথে এ রকম কোনো ভয় নেই। আমরা একজন আরেকজনের উপর আস্থা রাখতে পারি, আমরা মিথ্যা বলি না।

আমরা একজন আরেকজনকে ধোঁকা না দেওয়ার চেষ্টা করি, গীবত না করার চেষ্টা করি। এবং আমার দ্বারা যেন অন্যের ক্ষতি না হয় সেজন্য আমরা সবাই ইসলামের নীতিগুলো মেনে চলতে চেষ্টা করি। তাই বোনদের সাহচর্যে আমরা থাকি নিশ্চিন্ত, সন্দেহমুক্ত এবং নিরাপদ।

সমতা

"জাহিলিয়্যার সময়ে তুমি মানুষের বাড়ির দিকে তাকাতে, স্ট্যাটাসের দিকে তাকাতে। তাকে দেখতে কেমন দেখাচ্ছে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে এবং কারো অবস্থান যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হতো তাহলে সে তোমার সাথে কোনো পার্টিতে যেতে পারত না। কিন্তু ইসলামে তুমি লম্বা না খাটো, সুন্দর না অসুন্দর এসব গুরুত্বপূর্ণ না"

—উম্মে মুহাম্মাদ

আমাদের কমিউনিটিতে মেয়েরা কখনো একজন আরেকজনের সাথে বৈষম্য করে না অথবা বস্তুগত ব্যাপার নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মেতে ওঠে না। বোনদের মধ্যে এবং ভাইদের মধ্যেও অল্পবয়সীরা বয়স্কদের সাথে কথা বলে, ধনীরা গরিবদের সাথে একসাথে বসে, নতুন মুসলিমরা জন্মগত মুসলিমদের সাথে একসাথে পড়াশোনা করে। একজন দেখতে কেমন, তার স্ট্যাটাস কেমন বা সে কতটা ধনী এসব দেখে আমরা বন্ধু নির্বাচন করি না, কারণ আমরা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।

"আমার এখনকার বন্ধুরা শুধুই নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত না। এর আগে আমার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকমের প্রচুর বন্ধু ছিল। কিন্তু আমি বলব যে এমন মানুষও ছিল যাদের জন্য জাহিলিয়্যার সময়ে আমার কোনো সময় ছিল না। আমার জন্যও তাদের কোনো সময় ছিল না। হয়তো তারা আমাকে তুচ্ছতার চোখে দেখত অথবা আমি তাদেরকে। কিন্তু আমরা এখন বন্ধু, আমরা এখন বোন। আমরা একইরকম করে কথা বলি। আমরা সমান সমান।"

—সারা

ইসলাম খুব চমৎকারভাবে সমতা বিধান করে। যার দ্বীনের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি, সে-ই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। আমরা বয়স্ক আন্টিদেরকেও সম্মান করি, তারা আমাদেরকে সম্মান করে। যাই হোক এই সম্মান কোনো ধরনের অহংকারের জন্ম দেয় না।

আচরণ

আমাদের মধ্যকার বন্ধন কেন এত বেশি মজবুত তার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আমরা একে অপরের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করি, ভালো আচরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। মেয়েরা একজন আরেকজনের সাথে খারাপভাবে কথা বলছে বা অভদ্র আচরণ করছে বা বিদ্রুপ করছে এমনটা দেখাই যায় না। তারা চিৎকার করছে অথবা ঝগড়া করছে এমন চিত্র তো একেবারেই দুর্লভ। মতামতের

ভিন্নতা হতেই পারে। এমন হলে একজন আরেকজনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়, আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেয়।

রাসূল (সা.) এক হাদিসে বলেন-

> কোনো মুসলমান ব্যক্তির জন্য তিনদিনের বেশি সময় ধরে তার ভাইয়ের সাথে কথা-বার্তা ও মেলামেশা ত্যাগ করা জায়িয নয়। তাদের দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, অথচ একজন এদিকে এবং অন্যজন আরেক দিকে মুখ সরিয়ে নেয়। তাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয় সে-ই উত্তম।

যেহেতু তিন দিনের বেশি কথা না বলে থাকা নিষিদ্ধ তাই প্রত্যেকেই মনোমালিন্য হলে সেটা মিটিয়ে ফেলার জন্য উদ্যোগী থাকে। মেয়েরা মনের মধ্যে খারাপ ভাবনাগুলো না রেখে অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে কথা বলে।

আমাদের আচরণের নির্দেশনা আমাদেরকে গীবত এবং অন্যের উপর অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত রাখে। দাঁড়িয়ে সে সব শোনা থেকেও বিরত রাখে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উৎসাহ দিয়েছেন যেভাবে, আমরা সেভাবে কথার মাধ্যমে আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি, উপহার আদান-প্রদান করি, একজন আরেকজনকে সাহায্য করি, উপদেশ দেই, খাওয়াই, অসুস্থ হলে বেড়াতে যাই, তাদের জন্য দোয়া করি এবং একজনের প্রয়োজনে আরেকজন পাশে থাকার চেষ্টা করি। এই সবকিছুই ইসলামিক সিস্টারহুড এর অন্তর্ভুক্ত।

> *"দ্বীনে আসার পরে সিস্টারহুড নিয়ে আমার অনেক ভালো অভিজ্ঞতা আছে। বোনেরা তাদের ব্যাগের শেষ টাকাটা আমাকে দিয়ে যেত। বলতও না। আমার বালিশের নিচে রেখে যেত। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে, অনেক ভালো অভিজ্ঞতা আছে। ওই বোনেরা তখনো খুব মজবুত ছিলেন এবং মাশাআল্লাহ, এখনো আছেন। তারা আমার অক্সিজেনের মতো ছিলেন।"*
>
> *—ঘানিয়াহ*

এরকম হয় যে কয়েক জনের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়। কিন্তু এর সৌন্দর্য হচ্ছে আমরা সেই ঘনিষ্ঠদের সাথে যে আচরণ করি অন্যদের সাথেও সেই একই আচরণ করি। ইসলামে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে এবং এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে কারো সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হলেও তুমি তাকে সম্মান দেবে এবং তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করবে।

> *"অবশ্যই জীবনে তোমার এমন মানুষের সাথে দেখা হবে যাদের সাথে তোমার মিলবে না। তারা তোমার খুব ভালো বন্ধু হবে না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে এবং তাদেরকে সে অধিকার তোমার দিতেই হবে।"*
>
> *—উম্মে মুহাম্মাদ*

ভালোবাসার চূড়ান্ত রূপ

“আমরা সবাই একই জিনিসের জন্য সংগ্রাম করছি, আমরা সবাই একই জিনিস চাই, ইনশাআল্লাহ।”

—*আলিয়াহ*

এই বইটি আমার চমৎকার বোনদের সাথে সম্পর্কের এক উদযাপন। ওরা আমাকে এই ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে এবং বইয়ের কাজে অংশ নিয়েছে। তাদের প্রাণবন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় আমি এমন এক জীবন যাপন করেছি যা কখনো সম্ভব বলে আমি মনে করিনি। আমার বোনদের সাথে এমন এক জীবন, যে জীবন আমি ভালোবেসেছি, যে জীবনে আমি আস্থা রেখেছি। এটা একটা সুন্দর জীবন, একটা মহৎ জীবন। একটা জীবন যা আমি ভালোবাসি। “ইসলামি সিস্টারহুড” বিশেষ এক বন্ধন যা বর্ণকে অতিক্রম করে যায়, শ্রেণীমর্যাদাকে অতিক্রম করে যায় এবং সমস্ত দুনিয়াবী ব্যাপারকে অতিক্রম করে রচিত হয়। এ এক উষ্ণ, ঘনিষ্ঠ, আবেগী এবং মজবুত সম্পর্ক, যা অন্য সব সম্পর্কের চেয়ে আলাদা। এ সম্পর্ক সবচাইতে মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।

"মুসলিম নারীদের ব্যাপারে পশ্চিমের সমস্ত ভুল ধারণা বদলে দেবার মতো একটি বই, যা পাঠকের চিন্তা ভাবনায় তৈরী করবে প্রবল আলোড়ন।"

— Daily Telegraph

নাইমা বি. রবার্ট

জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ সাল। বেড়ে উঠেছেন জিম্বাবুয়ের হারারেতে। পড়াশুনা করেছেন লন্ডনে। ১৯৯৮ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামে আসার আগে এবং পরে তিনি নিয়মিত লেখালেখি করে আসছেন। তিনি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ম্যাগাজিন *SISTERS Magazine* এর প্রতিষ্ঠাতা এবং এডিটর। ইসলামে আসার পর তাঁর লিখিত প্রথম বই *From My Sisters' Lips* পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বর্তমানে তিনি তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে লন্ডনে বসবাস করছেন।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা, শুধু দুটো চোখ দেখা যাচ্ছে—পশ্চিমের কোনো দেশের রাস্তায় এই বেশে একজন মুসলিম নারী হেঁটে যাবে আর কিছু মানুষ তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাবে না—এ অস্বাভাবিক। কখনো আতঙ্ক, কখনো ভয়, কখনো বা ভূত দেখে চমকে উঠার মতো পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কখনো কি ভাবা হয়েছে পর্দার আড়ালে আসলে সে কে? তার অন্তরালের জীবনটা কেমন? তার চিন্তাভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা কি আমার আপনারই মতো, নাকি ভিন্ন কিছু?

ফ্রম মাই সিস্টার্স লিপস্ বইয়ে নাইমা রবার্ট সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন তার ইসলামে আসার গল্প, যেখানে আসাটাই ছিল তার কাছে সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক। আর আছে বিগত বছরগুলোয় তার সাথে পরিচয় হওয়া কজন বিস্ময় নারীর গল্প—যারা তার মতোই ইসলামকে স্বেচ্ছাবরণ করে নিয়েছেন। সব মিলিয়ে এ এক হাত ধরাধরি করে পথচলার কাহিনী। বিয়ে থেকে শুরু করে মাতৃত্ব, জীবন, আত্মসমর্পণ, আত্মছবি—সবকিছুর মিশেলে এ হচ্ছে কিছু দৃঢ় আওয়াজ, গর্বিত কণ্ঠস্বর—যা সচরাচর শোনা যায় না।